শির্কের বেড়াজাল উম্মত বেসামাল

নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)

২৫

ইসলামিক অনলাইন মিডিয়া
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার প্রত্যয়ে

www.i-onlinemedia.net
www.facebook.com/IslamicOnlineMedia

বি:দ্রঃ অনুগ্রহপূর্বক বইটি প্রকাশনী থেকে ক্রয় করুন।

শির্কের বেড়াজাল উম্মত বেসামাল

নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)

www.i-onlinemedia.net

শির্কের বেড়াজাল উম্মত বেসামাল

নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)
সম্পাদনায়ঃ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ হাছান

তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

www.i-onlinemedia.net

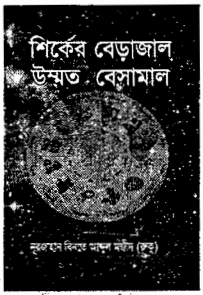

শির্কের বেড়াজাল উম্মত বেসামাল

নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)
সম্পাদনায় : ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ হাছান

প্রকাশক :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : 7112762, 01190368272, 01711646396
ইমেইল: tawheedpp@gmail.com

প্রথম প্রকাশ :
মুহার্‌রাম, ১৪৩১ হিজরী/জানুয়ারী, ২০১০ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব © :
নুরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)

প্রচ্ছদ :
ওয়ালিউল্লাহ আল-মাসরূর

ISBN :
978-984-8766-11-9

SHIRKER BERAJAL UMMAT BESHAMAL
Written by: Nurjahan bint Abdul Majeed (Ruqu),
Edited by: Engr. Muhammad Hassan
Published by: **Tawheed Publications**, 90, Hazi Abdullah Sharkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100. Phone : 7112762, 01711646396
E-mail: tawheedpp@gmail.com

বিনিময়:
১৮০ (একশ' আশি) টাকা মাত্র

www.i-onlinemedia.net

লেখিকার কথা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রতিপালক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যিনি ব্যতীত প্রকৃত সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি তাঁর সত্তায় যেমন এক ও অভিন্ন, তেমনি গুণাবলীতেও অনন্য ও অতুলনীয়। আমরা কেবল তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটেই সাহায্য চাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের কুমন্ত্রণা, অনিষ্টতা ও মন্দ 'আমল হতে তাঁরই আশ্রয়ে বাঁচার দৃঢ় আশা পোষণ করি। অজস্র সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের ওপর।

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে এ পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের সমস্যা-সংকট বাড়ছে হু হু করে। হতাশা বাড়ছে মানুষের প্রতিনিয়ত। হতাশ মানুষেরা আর কোন পথ না পেয়ে হয় ভাগ্যের ওপর সঁপে দিচ্ছেন নিজেকে; নয়ত পীর, ফকীর, দরবেশ ও জ্যোতিষীর পরামর্শ গ্রহণ করছেন। সহজে হাতে পাওয়া তথা অতি আকাঙ্ক্ষা বুকে পোষা মানুষও এ-সব মতলবী মানুষদের নিকট ধর্ণা দিয়ে মহা-মূল্যবান ঈমান, আক্বীদা, অর্থ-সম্পদ এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে আবারও হতাশায় তলিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান না রাখা সমাজের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অসহায় ও গরীব তথা সর্বস্তরের মানুষই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশে বন্দী। এ শ্রেণীর মানুষ তাদের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ, অভাব ও দারিদ্রের জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল-প্রমাণহীন ঈমান ও আক্বীদা বিধ্বংসী তথাকথিত অলৌকিক বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাস রেখে চলেছেন। মূলত আমাদের গ্রামীণ সাধারণ মানুষ ও শহুরে আধুনিক সমাজে শির্ক-বিদআতযুক্ত কুসংস্কার, আচার, প্রথা ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর রয়েছে ব্যাপক প্রভাব।

দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করা, রাশিফল গণনা, পীরবাবা, ও খানকা শরীফের মুরীদ-ভক্ত, হস্তরেখা, জ্যোতিষশাস্ত্র, রত্ন-পাথর ধারণ, তাবিজ-কবজ, যাদু-তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি আরও কত রকমের শির্ক ও কুফরী যে আমাদের চারদিক ছেঁয়ে রেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। খোদ ইসলাম ধর্মের তথাকথিত পণ্ডিতরাই অধর্মের অন্ধধারণা প্রচার করে থাকেন। এমন নজির আমাদের সমাজে বহু মেলে। ধর্মশাস্ত্রে যথেষ্ট ভাল জ্ঞান রাখেন এ ধরনের ব্যক্তিদের জীবন-যাপন বা চিন্তাধারা অধর্মে চালিত- এ রকম তো অহরহই দেখা যায়। এমনও প্রায়ই শোনা যায়, শ্রেণীতে শিক্ষা দেয়ার সময় তাবিজ-কবজ, মৃত মানুষের অসীলা গ্রহণ, মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে ফয়েজ-বরকত লাভ, পীর-মুরীদী, কোন ব্যক্তির অন্ধ-অনুসরণের মতো ইত্যাকার বিষয়াদির স্বপক্ষে নানা ভিত্তিহীন যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করে শিক্ষার্থীদেরকে লেলিয়ে দেন এ সবের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে! এমনই যদি প্রকৃত ব্যাপার হয়, তবে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা কুরআন ও সহীহ হাদীস তথা ওহীর সত্য শিখবে কেমন করে! এ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম যেভাবে সাজানো তাতে বিশুদ্ধ আক্বীদামনস্ক হবার আয়োজন খুবই কম। আর ব্যবহারিক সহীহ আক্বীদার চর্চা নেই বললেই চলে।

সুতরাং কুরআন ও হাদীসের চর্চা করে শিক্ষার্থীরা কুরআন-সহীহ হাদীসমুখী হবে, সে ভরসা করার জো নেই। কুরআন-হাদীসমুখী হওয়াটা বর্তমানে একটা বিশেষ জরুরি বিষয় বলে ধরে নেয়া যায়। কারণ আমাদের মুসলিম সমাজ জীবনে যে শির্ক, বিদ'আত, ধর্মীয় গোঁড়ামী, দলীল-প্রমাণ-যুক্তিহীন অন্ধধারণা ও কুসংস্কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা দূর করে ওহীর সত্যের দিকে যাত্রার একমাত্র পথই হল কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান। দীর্ঘকাল

www.i-onlinemedia.net

ধরে চলে আসা অন্ধ-বিশ্বাস ও অন্ধ-অনুসরণের ঐতিহ্য উপড়ে ফেলতে জোরালো সহায়তা করতে পারে কুরআন ও সহীহ হাদীসমুখী চিন্তা বা চেতনা। তাই কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক শিক্ষার হার বাড়ানো এবং সে সাথে আরো বেশি প্রয়োজন এগুলো চর্চার প্রসার ঘটানো।

এ বইটিতে আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত নানা চেহারার, নানা চরিত্রের ধর্মীয় শির্ক ও কুসংস্কারজনিত শির্কগুলো নিয়ে বাস্তবসম্মত আলোচনা স্থান পেয়েছে। গল্পের অবয়ব বানিয়েও বলা হয়েছে। অসংখ্য অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখিত হয়েছে। কিছুটা হলেও এ বইটি আমাদের গ্রাম ও শহুরে জীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত শির্কগুলো বাতিল করে মানব সমাজকে ওহীর সত্যের দিকে ধাবিত করতে সহায়ক হতে পারে। এ বইটি ইসলামের প্রকৃত সত্য গ্রহণে চোখ খুলে দেবার কাজ করবে বলে আশারাখি।

পরিশেষে, একটি কথা না বললেই নয়; তা হচ্ছে, কখনো ভাবিনি যে, এ বিষয়গুলোর সমষ্টি একদিন বই আকারে রূপ নেবে। কারণ, বই লিখতে গেলে যা প্রয়োজন, যেমন- পর্যাপ্ত জ্ঞান, তথ্য ও উপাত্ত, মেধা ও প্রজ্ঞা; এগুলোর কোনটাই আমার নেই। তবে, আমাদের সমাজে প্রচলিত শির্ক ও কুসংস্কারগুলোর একটা দীর্ঘ তালিকা তৈরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এক সময় অবশ্য একটা ছোট তালিকা তৈরিও হয়ে গেল। তারপর মনে ইচ্ছা জাগল যে, এ ছোট্ট তালিকার সাথে বিষয়সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কথা যোগ করে প্রবন্ধ আকারে রূপ দেয়া যেতে পারে। অবশেষে, তা-ই হল। কিন্তু এখানেই ঘুরে গেল আমার মূল কাজের মোড়। তাওহীদ পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী ওয়ালিউল্লাহ ভাই আমার লেখা প্রবন্ধটি দেখে সেটির সাথে আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় যুক্ত করে বই আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি তাঁর এ কথায় উৎসাহিত হয়ে বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাছাড়া, একটা কথা তো সবারই জানা যে, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ আর বইয়ের উপস্থাপনা ভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সেই ছোট প্রবন্ধটি এখন বই রূপে আলোর মুখ দেখতে সক্ষম হল, ফালিল্লাহিল হ্‌মদ।

এ বইটি প্রণয়নে লেখার বিষয় ও ধরন নির্বাচন, বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের (Reference Book) সন্ধান প্রদান, তথ্যাবলী ও ভাষা সম্পাদনাসহ বইয়ের অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহের যথাযথ সন্নিবেশ সাধনে ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান ভাই আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

এ বইটি রচনাকালে অনেক গ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছি এবং সেগুলো থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি; যে সকল বিদ্বানের লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করেছি, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের সকলকে অফুরন্ত রহমত দান করুন। মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা এ বইটির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে জাযায়ে খায়র দান করুন। এটাকে লেখিকা, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠক-পাঠিকাদের পিতামাতা ও তাঁদের পরিবারের জন্য নাযাতের অসীলা রূপে গ্রহণ করুন। আমীন।

বিনীত,

নূরজাহান বিনতু আবদুল মজীদ (রুকু)
প্রযত্নে: মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ
গ্রাম+ডাকঘর: গোবিন্দা, থানা+জেলা: পাবনা।
ইমেইল: nurjahan.ruqu@gmail.com

তারিখ:
২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ ঈসায়ী
৫ মুহাররাম, ১৪৩১ হিজরী

www.i-onlinemedia.net

সম্পাদকীয়

মুসলিম উম্মাহ্‌র ধর্মীয় রোগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোগটি হল *'তাওহীদের ধারণা'* সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং এ বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দুঃখজনক অপর্যাপ্ততা। মুসলিম জীবনে আল্লাহ্‌র একত্বের ব্যাপ্তি এবং গুরত্ব কতখানি তা মুসলিমরাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বই হচ্ছে ইসলামের মূল ও কেন্দ্রীয় শক্তি। মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া, আমৃত্যু সঠিকভাবে মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকা নির্ভর করে তাওহীদ সম্পর্কীয় সঠিক ধারণার ওপর। মুসলিমদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম তাওহীদের ধারণাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শির্‌ক। শির্‌ক হচ্ছে কঠিন ও জঘন্যতম পাপের কাজ, যার সাথে নগণ্যতম সম্পর্কও কোন প্রকৃত তাওহীদপন্থী মুসলিম মেনে নিতে পারে না। অধিকাংশ মুসলিম তাওহীদের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। তাওহীদের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণে তারা মূল সত্য থেকে দূরে সরে পড়েছে। তাওহীদপন্থী মুসলিমরাই যেহেতু এ জগত থেকে শির্‌ক নির্মূল করার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী। সে ক্ষেত্রে এ ধরনের বাতিলের মধ্যে নিজেদের নিপতিত হওয়া কিরূপে সম্ভব?

মূলত, শির্‌কের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং তাওহীদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি একটি জ্ঞানগত গৌরবের বিষয়। তাওহীদ বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন মানুষের মন থেকে শির্‌ক সম্বন্ধীয় সমূদয় অন্ধ ধারণাকে বিলীন করে দিতে সক্ষম। এর ফলে শির্‌কের জঞ্জালে জড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে না। আসলে, শির্‌ক বিষয়টি কী? এর রূপরেখা ও প্রকরণ কী? আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চরিত্র, নৈতিকতা ও সামাজিক-পারিবারিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তথা আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এটা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক।

তাওহীদের সঠিক জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশী মুসলিমদের সংস্কৃতি আজও প্রকৃত ইসলামীরূপ নেয়নি, বরং তা ইসলামী ভাবধারা হতে বিচ্যুত হয়ে একটা অস্পৃশ্য বিজাতীয় সংস্কৃতির ঘোলাটে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। আজ অহর্নিশি মুসলিমদের কণ্ঠে শোনা যায়, হরে-কৃষ্ণ সংকীর্তন এবং বড়দিনের নর্তন-কুর্দন। এ দেশীয় মুসলিমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বিদআতী-শির্‌কী-কুফরী আচরণ করছে, ভিন্ন ধর্মের জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির চর্চার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে; আর এর ফলে সর্বক্ষণ তারা কুসংস্কারের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। হিন্দুদের তীর্থ-মন্দিরের বিকল্প হিসেবে মুসলিমরা মাযার গড়ে তুলছে, চর্চা করছে মাযার পূজা বা প্রতিমা সংস্কৃতির। বর্তমান মুসলিম জীবনের এ বিচিত্র দিকগুলো তুলে ধরার জন্য এ বইটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

www.i-onlinemedia.net

আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জীবনে রয়েছে হাজারো রকমের কুসংস্কার। স্বল্পশিক্ষিত ও ইসলামী জ্ঞানহীন লোকেরা ধর্মীয় ও প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ আচার, প্রথা ও ইবাদতপন্থা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভট বিষয় আবিস্কারে মনোযোগী হয়ে পড়ে। সে সবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও নতুন মাত্রা সংযোজনের জন্য আরও নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা ও পন্থার প্রচলনের উদ্ভব ঘটায়। কুসংস্কারগুলোকে করে তোলে আরও গতিশীল ও জনপ্রিয়। তাদের এ উদ্ভাবনী শক্তি সত্যিই বিস্মিত হওয়ার মতো একটি বিষয়। তাদের এ সকল শির্কী কর্মকাণ্ড তথা কুসংস্কারের মূল এত গভীরে প্রোথিত যে, এত সহজে এর মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। সহজ-সরল, ধর্মপ্রাণ কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানহীন জনগোষ্ঠীই মূলত এ ধারার অনুসারী। এদেরকে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান দেয়ার জন্য ও সমাজ থেকে শির্ক, বিদআত ও কুসংস্কার দূরীকরণের নিমিত্তে চাই একটা সমন্বিত প্রয়াস। আর সে প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ বইটি।

এক প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত জাহেলিয়াতে কুহেলিকায় পরিপূর্ণ বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করে তাওহীদী আলোর দিকে পরিচালিত করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত শির্ক-কুফরীযুক্ত যাবতীয় কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে প্রতিষ্ঠা করেন এক শির্কমুক্ত পরিচ্ছন্ন তাওহীদী ইসলামী সমাজ। বর্তমানে আমরা মুসলিম সমাজের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, মুসলিম সমাজ শির্ক-বিদআত ও নানা কুসংস্কারের দুশ্ছেদ্য মায়াজালে বন্দী, বিশেষ করে, পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণ যেন এর শিকার হয়েছে অনেক বেশি।

গ্রামবাংলা ও শহরকেন্দ্রীক শত সহস্র কুসংস্কারের সংযোজন করে লেখিকা এ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হননি। কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকটি কুসংস্কার ও শির্কী কর্মকাণ্ডের কথা বলে একটা গ্রহণযোগ্য চিত্র পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এখানে। সমাজ সংস্কার একটা মহতী বিষয় হলেও তা খুবই দূরূহ ব্যাপার। সে জন্য চাই প্রতিভা আর পাণ্ডিত্য এবং যে বিষয়টি বেশি প্রয়োজন তা হল, জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন রচনাশৈলী তথা প্রভাব বিস্তারকারী সাহিত্য সৃষ্টির উন্নত কলা-কৌশল। মুসলিমদের লক্ষ্যহীন অসহায় জীবনধারাই লেখিকাকে এ জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর রচনায় যেমন রয়েছে উদ্দীপনা তেমনি রয়েছে চলার পথের সঠিক পাথেয় ও প্রেরণা। এ ধরনের হৃদয়স্পর্শী আরো রচনা এ সমাজকে উপহার দেয়ার মতো যোগ্যতা লেখিকাকে আল্লাহ তা'আলা প্রদান করুন- এটাই আমরা আন্তরিকভাবে দু'আ করছি।

বিনীত,
ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান

তারিখ:
৫ জানুয়ারী, ২০১০ ঈসায়ী
১৭ মুহাররাম, ১৪৩১ হিজরী

প্রযত্নে : মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন
গ্রাম + ডাক : কুড়ালিয়া (পশ্চিম পাড়া),
থানা + জেলা : সিরাজগঞ্জ, পোস্ট কোড : ৬৭০০।
দূরালাপনী : 01912196789, 01717208080
ইমেইল: muhammad_hassan@live.com

www.i-onlinemedia.net

সূচীক্রম

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
✖	লেখিকার কথা	৫
✖	সম্পাদকীয়	৭
১.	উপক্রমণিকা	১১
২.	শির্‌ক	১৩
	শির্‌ক: পরিচয় ও প্রকারভেদ	১৩
	শির্‌কের তাৎপর্য	১৪
৩.	শির্‌কের ইতিহাস	১৮
	শির্‌কের উৎপত্তি (পৃথিবীর সর্বপ্রথম শির্‌কের ঘটনা)	১৯
	নূহ (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২০
	যুগ পরম্পরায় শির্‌কের ক্রমবিকাশ	২২
	১. হুদ (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২২
	২. ইব্‌রাহীম (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২৩
	৩. শু'আয়ব (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২৩
	৪. ইউনূস (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২৩
	৫. মূসা (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২৩
	৬. সুলায়মান (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২৬
	৭. ইলিয়াস (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২৬
	৮. ঈসা (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্‌ক	২৭
	৯. আরব জাহানে শির্‌ক	২৮
	১০. উম্মাতে মুহাম্মাদীর মাঝে শির্‌ক	৩১
৪.	বাংলার মুসলিম সমাজে শির্‌কের অনুপ্রবেশ	৩৩
	মানুষের শির্‌ক দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার পর্যায়ক্রম	৩৩
	আল্লাহর আইন না মানা সংক্রান্ত শির্‌ক	৩৪
	আল্লাহকে রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে না মানা সংক্রান্ত শির্‌ক	৩৬
	ওলী-আওলিয়া, দরবেশ ও বুযুর্গদের প্রতি ধারণাপোষণ সংক্রান্ত শির্‌ক	৩৭
৫.	অদৃশ্য জগতে রয়েছে জ্বিন, মুহূর্তেই তারা হয়ে যায় বিলীন	৩৯
৬.	ভূতের ভয় লোকে কয়, এক হিসেবে কিছুই নয়!	৪৯
৭.	মানুষের ওপর জ্বিন-ভূতের আছর, হয় কুসংস্কার-কুফর ও শির্‌কের সাথে বাসর	৫১
৮.	ভাগ্যগণনা-যাদুমন্ত্র ও অলৌকিকত্বের প্রভাব, সবই জ্বিন-শয়তানের স্বভাব	৬২

www.i-onlinemedia.net

৯.	যত আছে গণক-জ্যোতিষ ও সাধু, করে তারা চর্চা জ্যোতিষশাস্ত্র ও যাদু	৭৪
১০.	রাশিচক্র-ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদুমন্ত্রের ইসলামী বিধান, বিনষ্ট হবে না ঈমান থাকলে সাবধান	৮০
১১.	করলে শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস; বিধ্বংস হবে ঈমান, হবে সর্বনাশ	৮৭
১২.	প্যাঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়, এ বিশ্বাসেও ক্ষতি অতিশয়	১০৫
১৩.	সাত-তেইশ-তেরো, লাগায় শুধু গেরো	১০৬
১৪.	হাঁচি-চুলকানি-কাঁপা, কিচ্ছু নয় ফাঁপা	১০৯
১৫.	হাতের রেখায় ভাগ্য, দেখতে চায় অজ্ঞ	১১১
১৬.	রাশি চক্র, হাসি বক্র	১১৩
১৭.	শনির দশা, ধোঁকা খাসা	১২১
১৮.	ভয়-ভীতি ও জণ্ডিসের মালা, দূর করে না রোগ-বালা	১২৪
১৯.	চিকিৎসায় তামার বালা, যারা করে তারা শয়তানের চেলা	১২৮
২০.	অষ্ট ধাতুর আংটি-চুড়ি, ভাঁওতাবাজীর জারিজুরি	১২৯
২১.	অবুঝ হতে বলে কবজ, নয় জীবনের রক্ষাকবচ	১৩০
২২.	কবচ-মাদুলি-তাবিজ, হতাশ হয় মফিজ!	১৩২
২৩.	হাত চালা, বাড়ায় জ্বালা	১৩৮
২৪.	বাটি চালা, নাটক হয় মেলা	১৪০
২৫.	মানুষের নখদর্পণ, মিছেই হয় চোর কর্তন	১৪২
২৬.	যাদু-টোনার বাণ, কেড়ে নেয় প্রাণ	১৪৫
২৭.	পীরের নৃশংস কাণ্ডে রেফাজ এখন অন্ধ, পীরের কথা মেনে নিতে ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব	১৪৮
২৮.	বুড়িগঙ্গার ঘূর্ণিপাক, ভণ্ড পীর নিপাত যাক	১৫১
২৯.	আশেপাশে যত পীর, ঈমান ধ্বংসের শয়তানী তীর	১৫৩
৩০.	বিশিষ্ট সব ব্যক্তিত্বের মাযার, শুনুন কিছু মজার সমাচার	১৬৬
৩১.	মানুষ যায় করতে কবর পূজা, সেখান থেকে জাহান্নাম খুব সোজা	১৮০
৩২.	প্রতিমা পূজার ভিত্তি মূর্তি ও ভাস্কর্য, তা দেখে হতে হয় আশ্চর্য	১৯৪
৩৩.	শিখা চিরন্তন-অনির্বাণ, মশাল আর মঙ্গলপ্রদীপ এ সকল নিচ্ছে কেড়ে মুসলিমের ঈমান প্রদীপ	২০৫
৩৪.	কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঠিক শিক্ষা, সালাফীদের থেকেই নিতে হবে দীক্ষা	২১১
৩৫.	লটারি-জুয়া-হাউজি, সবই হল হারাম পুঁজি	২১৫
৩৬.	যারা বলে দাঁতের পোকা, আসলে তারা বানায় বোকা	২১৭
৩৭.	এক নজরে আমাদের সমাজে প্রচলিত শির্‌ক	২২০
৩৮.	শির্‌কের ক্ষতিকর প্রভাব	২৩৩
	ব্যক্তিজীবনে শির্‌কের ক্ষতিকর প্রভাব	২৩৪
	ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে শির্‌কের ক্ষতিকর প্রভাব	২৩৬
	অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শির্‌কের ক্ষতিকর প্রভাব	২৩৯
৩৯.	শির্‌ক থেকে পরিত্রাণের উপায়	২৪২
✠	উপসংহার	২৫০
✠	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	২৫৩

www.i-onlinemedia.net

উপক্রমণিকা

মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাতের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন।

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْـجِنَّ وَالْإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورة الذاريات: ٥٦)

'আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।' [সূরা যারিয়াত (৫১): ৫৬]

যুগে যুগে তিনি অসংখ্য নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ অবতরণ করেছেন যাতে মানবজাতি তাঁর স্পষ্ট পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়, তাঁর 'ইবাদাত করে এবং তাঁর একত্বের স্বীকৃতি দিতে থাকে। ফলে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র তাঁরই বিধান যেন বাস্তবায়িত হয়ে যায়। সকল আনুগত্য শুধুমাত্র তাঁর জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে হয়। আর এ সবের বিপরীতমুখী কোন কর্মকাণ্ড যেন সম্পন্ন না করা হয়। কারণ এগুলোর বিপরীত বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডই শির্ক তথা তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

ইসলাম আমাদের মুসলিমদের ধর্ম। আর এ ইসলাম ধর্মের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি। এ ইসলামী সংস্কৃতি আজ বাংলাদেশে প্রচণ্ডভাবে বিকৃত হচ্ছে। মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করেছে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ সংস্কৃতি, আবার এ মুসলিমরাই করছে হরে কৃষ্ণ সংকীর্তন অর্থাৎ তারা একদিকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও অন্যদিকে হিন্দু সংস্কৃতি- এভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতির পূজারী হয়ে উঠেছে। পরানুকরণ করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তারা হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজেরাও হারিয়ে গেছে পর-সংস্কৃতিতে বা বিজাতীয় সংস্কৃতিতে। যে জাতি তার নিজের স্বরূপ হারিয়ে ফেলে সে জাতি অবশ্যই বিজাতীয় বেশে আবির্ভূত হয়। পরানুকরণের কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শির্ক-কুফরীযুক্ত কুসংস্কার জাতীয় নানা পাপাচার ও অনাচার মহা দাপটে বিরাজ করছে। অজ্ঞতার কারণে যেমন আমরা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণ করছি তেমনি অজ্ঞতার কারণেই আমরা নানা বিষয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। এ কুসংস্কার আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সমভাবেই ক্রিয়াশীল।

কলুষতাপূর্ণ আক্বীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণার বিস্তৃতি ঘটছে অনেক পথে, নানা মাধ্যম ধরে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে নিত্য নতুন পথ ধরে এ হামলার প্রচণ্ডতা কেবল বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততরই হচ্ছে। শয়তানের এ চোরাগুপ্তা হামলার অসংখ্য পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানবতা ও সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করার জন্য এমন কোন মাধ্যম নেই যা শয়তানেরা ব্যবহার করছে না। রেডিও, টিভি, ভিসিআর, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, সিনেমা, নাটক, নানা ধরনের পত্রিকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল বিনিময়, সাহিত্য, ট্যুরিজম, ভিউকার্ড, ওয়াল পোষ্টার, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালা, গৃহসজ্জা সামগ্রী, সামাজিক অনুষ্ঠানমালা, বিলাস সামগ্রী, উৎসব, মেলা, সকল প্রকার প্রচার-যোগাযোগ ও গণমাধ্যম সর্বত্র শয়তান তার ভয়ানক থাবা বিস্তার করে আছে।

www.i-onlinemedia.net

ফলে অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতিগুলোর মতো প্রকাশ্যভাবে না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবেই) মুসলিমরা আজ সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সাফল্য, ব্যর্থতা, লাভ, লোকসান ইত্যাদির জন্য অসংখ্য স্রষ্টাসূলভ সত্তার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। এ মতাদর্শ অবলম্বনকারীগণ আন্দাজ অনুমানের সাহায্যে স্রষ্টাসূলভ শক্তিসমূহের উৎস ও অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করছে। ফলে এ অনুসন্ধান চলাকালীন যে যে শক্তির ওপর তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তাদেরকেই এরা স্রষ্টা মনে করেছে। এ কারণে মানবজীবনে যে রকম আচরণ সক্রিয় হয়েছে তা হল:

প্রথমত, মানুষের সমগ্র জীবন অবাস্তব অনুমানের পাদপীঠে পর্যবসিত হয়। মানুষ তখন বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিসম্মত পন্থা ব্যতীত নিছক আন্দাজ-অনুমানের সাহায্যে অসংখ্য ব্যক্তি ও বস্তুকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করতে শুরু করে। তারা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক পন্থায় মানুষের ভাগ্যের ওপর ভাল কিংবা মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম বলে মনে করে। এ জন্য উক্ত মতের বিশ্বাসী ব্যক্তিগুলো ভাল প্রভাবের অবাস্তব আশায় এবং মন্দ প্রভাবের অবাস্তব ভয়ে নিমজ্জিত হয়ে বিপুল শক্তি অর্থহীনভাবে অপচয় করে। সামান্য কু-আলামত দেখলে মন ভেঙ্গে যায়, হতাশায় কাতর হয়। এ বিশ্বাসই তার মতাদর্শ, চিন্তাধারা এবং তার চেষ্টা-সাধনাকে স্বাভাবিক কাজ হতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত ক'রে এক সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়ত, এ বিশ্বাসের কারণেই পূজাপাঠ, মানত, উপহার ইত্যাকার আচার অনুষ্ঠানের এক দীর্ঘ কর্মতালিকা রচিত হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, এ মুশরিকী কল্পনাপূজার কুসংস্কারে যারা নিমজ্জিত হয়, ধূর্ত ও শঠ ব্যক্তিরা তাদেরকে নিজের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে অর্থ লুণ্ঠন করার বিরাট সুযোগ লাভ করে, ফলে কেউ রাজা বা বাদশাহ হয়ে বসে এবং চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রসহ অন্যান্য দেবতার সাথে নিজের বংশের সম্পর্ক দেখায়, কেউ ব্রাহ্মণ ও পীর, তাবীজ, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র এবং সাধনার জাল বিস্তার করে; আর লোকদেরকে বিশ্বাস করায় এ সব জিনিস অলৌকিক, এগুলো সকল প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারে, ব্যাথা-বেদনা প্রশমিত করতে পারে।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মুসলিমরা আজ যে কষ্ট ও মুসীবতে জর্জরিত, এর প্রধান কারণ হল, তাদের মধ্যে প্রকাশ্য ও ব্যাপকভাবে শিরক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যে আজ ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, তা আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর গযব হিসেবে নাযিল করছেন। কারণ, তারা তাওহীদ বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং তাদের আক্বীদা ও কর্মকাণ্ডে শিরক প্রকাশ পাচ্ছে। বেশিরভাগ মুসলিম দেশে এ অবস্থা বিরাজ করছে। শিরককে উৎখাত করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব এ কথা মুসলিম সমাজ জানলেও কোন্‌টি শিরকী কাজ তা না জানার কারণে শিরকী কাজকেই পুণ্যের কাজ মনে করে আমল করে যাচ্ছে। তাই এ সব প্রচলিত শিরকের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে না।

www.i-onlinemedia.net

শির্ক

শির্ক: পরিচয় ও এর প্রকারভেদ

'শির্ক' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থে শির্ক হল 'অংশীদারীত্ব' (partnarship), 'বণ্টন' (sharing) বা 'সহযোগী বানানো' (associating)।[১] কিন্তু ইসলামী পরিভাষায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোন প্রকারে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করাই শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য কোন 'ইবাদাত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শির্ক বলা হয়।

শির্কের পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহি.) বলেছেন, 'শির্ক হল আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্‌র মত তাকে ভালবাসা।'[২]

মূলত আল্লাহ তা'আলা যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব রূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোর সব কিংবা কোন একটি গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করাই হল শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করার অর্থ হল, কোন সত্তাকে-

১. আল্লাহ তা'আলার সাথে একজন সঙ্গী জুড়ে দেয়া, ২. সহায়ক বা অংশীদার মনে করা, ৩. আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা, ৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করা, ৫. বহু উপাস্যবাদে বিশ্বাস করা, ৬. কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সম্মান ও মর্যাদায় শরীক করা, ৭. তার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা ৮. কোন কিছু আশা করা, ৯. তাকে ভয় করা, ১০. তার ওপর ভরসা করা, ১১. তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, ১২. তার নিকট বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ফরিয়াদ করা, ১৩. তার নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না, ১৪. তার নিকট মীমাংসা চাওয়া, ১৫. আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, ১৬. তার কাছ থেকে শারীয়াতের বিধান গ্রহণ করা, ১৭. তার জন্য কিংবা তার নামে যবেহ্ করা, ১৮. তার নামে মানত করা, ১৯. তাকে এতটুকু ভালবাসা যতটুকু আল্লাহকে ভালবাসা উচিত।

অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বা মা'বুদ সাব্যস্ত করা সাধারণত শির্ক হিসেবে গণ্য। মূলত শির্ক হচ্ছে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা। অর্থাৎ

---

[১] *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabi*, পৃ. ৪৬৮।

[২] *মাসিক আল-বায়ান, সংখ্যা ৬৯, নভেম্বর ১৯৯৭; গৃহীত: মাদারেজুস সালেকীন, ১/৩৩৯।*

www.i-onlinemedia.net

স্রষ্টা হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন, সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা বা সাদৃশ্যপূর্ণ করলে, সে মুশরিক হয়ে যাবে। ক্ষতি করা, উপকার করা, দান করা ও দান না করার একক অধিকারী হওয়া ইলাহীর বৈশিষ্ট্য, তথা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। আর এ সব গুণাবলীর একক অধিকারী হওয়ার কারণে প্রার্থনা করা, ভয় করা, কোন কিছুর আশা করা এবং ভরসা করা কেবলমাত্র তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি এ সব গুণকে কোন মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে সে যেন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে শরীক সাব্যস্ত করল। আর দুর্বল, নিঃস্ব ও সসীম কোন কিছুকে ক্ষমতাবান, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার সাথে তুলনা করা খুবই নিকৃষ্ট মানের তুলনা।

যে আল্লাহ্‌র সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব প্রকাশ করে এবং তার প্রশংসা করার জন্য, তাকে সম্মান করার জন্য, তার কাছে অবনত হওয়া ও আশা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে, তাহলে ঐ ভয় করা, আশা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌র একত্ব ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। আসলে শির্ক হল আল্লাহ্‌র প্রতি অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম একটা ধারণা বা বিশ্বাস। অতএব, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যম দাঁড় করানো, তাঁর প্রভুত্ব, রবূবিয়্যাত ও একত্বের প্রতি চরম আঘাত এবং তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার শামিল। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য এরূপ ধারণা করাকে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। তাছাড়া, স্বাভাবিক জ্ঞান ও নিষ্কলুষ প্রকৃতিও একে পরিত্যাগ করে এবং সুস্থ প্রকৃতি ও উন্নত স্বভাবের নিকট এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় বলে বিবেচিত।

শির্কের তাৎপর্য:

শির্কের অর্থ শুধু এটা নয় যে, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা তাঁর প্রতিপক্ষ মনে করা হবে। আরবের মুশরিকরাও কাউকে আল্লাহর সমান বা প্রতিপক্ষ মনে করত না। বরং শির্কের প্রকৃত তাৎপর্য হল, যেসব বস্তু একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোকে অন্য কারো জন্য করা, যেমন- অন্যকে সিজদা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মাথা নত করা, বিপদে অন্যকে আহ্বান করা, জীবিত পীর-খাজা-গাউস-কুতুবের কাছে সন্তান, রোগ নিরাময়, ব্যবসায়ে উন্নতি, বিপদ হতে পরিত্রাণ ও পারলৌকিক সুপারিশ ও মুক্তির প্রার্থনা করা, কাউকে আইন দাতা বিধান দাতা মনে করা অর্থাৎ হুকুম ও বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা এবং কুরআন-সুন্নাহ আইনের বিরোধী মানব রচিত সংবিধানের আনুগত্য করা, কাউকে গাউসূল আযম বা মহান ফরিয়াদ শ্রবণকারী ধারণা করা, ইবাদাতের সময় পীরের কল্পনা করা ইত্যাদি।

www.i-onlinemedia.net

শির্ক হল জঘন্যতম গুনাহ। এটা এমন এক গুনাহ যার জন্য কোন ক্ষমা অবশিষ্ট নেই আল্লাহ্‌র নিকটে, যদিও তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً﴾ (سورة النساء: ٤٨)

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত অন্য সব, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, বস্তুত সে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করল। [সূরা নিসা (৪): ৪৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾ (سورة النساء: ١١٦)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হল।' [সূরা নিসা (৪): ১১৬]

শির্ক মিশ্রিত যেকোন 'আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহ্‌র নিকটে তা প্রত্যাখ্যাত। ফলে একজন মানুষের ঈমান, সারা জীবনের 'আমল বিফল হয়ে যেতে বাধ্য কেবলমাত্র শির্কী কর্মকাণ্ডের কারণে। মূলত শির্ক মানুষের ধ্যান-ধারণা, কর্ম ও অভ্যাসের মধ্যকার যেখানেই হোক, এটা এমন একটা বিষক্রিয়া যে, যদি কারো জীবনে কখনও একটি মাত্র শির্কও সংঘটিত হয় এবং সে ব্যক্তি তা থেকে তাওবা করে মৃত্যুবরণ করতে না পারে, তাহলে কেবল এই একটিমাত্র শির্কই তার ঈমান ও জীবনের যাবতীয় সৎকর্মকে নিষ্ফল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ ধরনের লোকদের ঈমান ও 'আমলের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾

(سورة الكهف: ١٠٤-١٠٣)

"বল, 'আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের 'আমালের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?' তারা সেসব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সৎকর্ম করছে।" [সূরা আল-কাহফ (১৮): ১০৩-১০৪]

www.i-onlinemedia.net

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾

(سورة الفرقان: ٢٣)

'আর আমি তাদের আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদ শূন্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব।' [সূরা ফুরক্বান (২৫): ২৩]

কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র তাওহীদের স্বীকৃতি দান, এর সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ পৃথিবীতে আগমনকারী প্রতিটি নবী বা রাসূল সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকেই আহ্বান এবং শির্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য বারবার তাকিদ জানিয়েছিলেন।[১] তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের জন্য জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন তাওহীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে খুব কমই গুরুত্বারোপ করা হয়। এমনকি ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়ে তেমন লেখালেখিও হয় না। ফলে, তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার জন্য তাওহীদ পরিপন্থী বিষয় তথা শির্ক আমাদের মুসলিম সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। আর শির্ক এমনই ভয়াবহ ও জঘন্যতম পাপ যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য। শির্কের ব্যাপারে রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة الزمر: ٦٥)

'(হে নবী) কিন্তু তোমার কাছে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি (আল্লাহ্‌র) শারীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সূরা আয্-যুমার (৩৯) : ৬৫][২]

﴿...إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ...﴾ (سورة المائدة: ٧٢)

---

[১] *সূরা আন-নাহ্‌ল, ৩৬ নং আয়াত।*

[২] *শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কিত আয়াতগুলো হচ্ছে: ২/২১-২২, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৯, ৯২, ১৬৫; ৪/৩৬, ১১৬; ৫/১৭, ৭২, ৭৩; ৬/১৯, ৪৫, ৮২, ৮৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৫০, ১৫১; ৭/৫, ৩৩, ৩৭; ৯/৩, ২৮, ১১৩; ১০/১০৬-৭, ১২/৩৮, ৪০; ১৫/৯৬, ২২/৩১, ২৫/৬৮, ২৬/৭১, ৭৪; ৩১/১৩, ৪৭/১৯।*

www.i-onlinemedia.net

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম।' [সূরা মায়িদাহ (৫) : ৭২]

এ কারণে বান্দার ওপর সর্বপ্রথম অপরিহার্য বিষয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তাওহীদের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজের ঈমান, আক্বীদা ও যাবতীয় 'আমল শির্ক মুক্ত রাখা, যাতে কোন 'আমল বরবাদ না হয়। তাওহীদের প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে, কোন জ্ঞানই পরিপূর্ণ নয়। তাওহীদ বিহীন কোন 'আমলও গ্রহণীয় নয়। তাছাড়া, আল্লাহ্র দ্বীন তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূলকথাই হচ্ছে কালিমায়ে তাওহীদকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা ও এর উপর মৃত্যু পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা। আর এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী হচ্ছে এ তাওহীদকে বিনষ্টকারী শির্ক নামের মহা অপরাধটি কী এবং সমাজে এটি কেন সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখা। তা না হলে যেকোন সময় শয়তানের খপ্পরে পড়ে যে কারো ঈমান ও জীবনের সৎকর্মের যাবতীয় সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এহেন গুরুতর পরিণতির হাত থেকে যেমন নিজেকে রক্ষা করা আবশ্যক, তেমনি এ থেকে অন্য সকল মুসলমানকেও রক্ষা করা আবশ্যক।

www.i-onlinemedia.net

শির্‌কের ইতিহাস

ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী কর্তৃক ধর্মের উৎপত্তি এবং এর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত ভ্রান্ত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে ইসলামী মতাদর্শ। স্বধর্ম ত্যাগ বা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতি এবং পুনর্গঠনমূলক একটি প্রক্রিয়া ব্যতীত ধর্ম বিবর্তনমূলক নয়। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে একত্ববাদীরূপে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তারা বিভিন্ন রকম বহুত্ববাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। কখনো দ্বিত্ববাদ বা ত্রিত্ববাদ। আবার কখনো সর্বব্যাপিতা মতাদর্শের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েছে মানুষ। স্রষ্টার একত্বের সরল পথের মূলে ফিরে আনতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা সকল জাতি ও উপজাতির নিকটে প্রেরণ করেছিলেন নাবী ও রাসূলদেরকে।[১] কিন্তু, প্রেরিত নাবী ও রাসূলগণ কর্তৃক দেখানো সরল পথ থেকে কালক্রমে মানুষের বিচ্যুতি ঘটে এবং তাঁদের শিক্ষার পরিবর্তন করা হয় অথবা কালের আবর্তে হারিয়ে যায়। তথাকথিত আদিম গোত্রের যে সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে এ বাস্তবতার প্রমাণ মেলে যে, তারা সকলেই একজন সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাসী ছিল।

বিবর্তনবাদের তত্ত্বানুসারে ধর্মের ক্রমবিকাশের পর্যায় যা হোক না কেন, অধিকাংশ মানুষ তাদের অন্যান্য সকল দেবতা বা আত্মার উর্দ্ধে এক সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাস করে। মধ্য আমেরিকার মায়িআদের[২] সৃষ্টির দেবতা *'ইতযামা'*[৩], সিয়েরা লিওনের মেন্ডেদের সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা *'গিও'*, হিন্দু ধর্মের অসীম স্রষ্টা *'ব্রহ্মা'* এবং প্রাচীন শহর ব্যাবিলনের গির্জার সর্বোচ্চ ঈশ্বর *'মারদুক'*[৪]-এর প্রতি খেয়াল করলে সর্বোচ্চ সত্তার অস্তিত্বের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি জোরাস্ট্রিয়ীয়দের দ্বিত্ববাদেও *'আংগ্রা মানিউ'*-এর চেয়ে *'আহুর মাজদা'*র মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে। তারা বিশ্বাস করে যে, বিচার দিবসে *'আংগ্রা মানিউ'*-কে *'আহুর মাজদা'* পরাজিত করবে। অতএব, *'আহুর মাজদা'* তাদের সত্যিকারের সর্বোচ্চ সত্তা।[৫]

বিবর্তনবাদের তত্ত্বানুসারেই বহু-ঈশ্বরবাদ বা বহুত্ববাদ থেকে উৎপত্তি হওয়া একত্ববাদের মতাদর্শ সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে কোনক্রমেই পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। যা হোক, এ কথাটি সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে যে, অধিকাংশ ধর্মেই একজন সর্বোচ্চ সত্তার ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। নাবী ও রাসূলগণ কর্তৃক শেখানো একত্ববাদের

---

[১] [সূরাহ ইউনুস (১০) : ৪৭], [সূরাহ আর-রা'দ (১৩): ৭], [সূরাহ্ আল-হিজ্‌র (১৫) : ১০], [সূরাহ্ আন-নাহল (১৬) : ৩৬], [সূরাহ আল-ইসরা (১৭) : ১৫], [সূরাহ্ আশ-শু'আরা (২৬) : ২০৮], [সূরাহ আল-কাসাস (২৮) : ৫৯], [সূরাহ আল-ফাত্বির (৩৫) : ২৪, ৩৭]

[২] পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুয়াটেমালা এবং মেক্সিকোতে বসবাসকারী রেড ইন্ডিয়ান জাতির মানুষ ২। তাদের ভাষা।

[৩] *Dictionary of Religions*, ৯৩ পৃ.।

[4] তদেব, পৃ. ৬৮, ২০৪ ও ২১০ ।

[৫] *Dictionary of Religions*, ২৮ পৃ.।

www.i-onlinemedia.net

মহান শিক্ষা হতে বিপথগামী হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সৃষ্টির উপরে স্রষ্টার গুণাবলী অর্পণ করা, যা শুরু হয়েছিল স্রষ্টার কর্মকাণ্ডকে বিভিন্ন ছোট-বড় দেবতা বা পূর্বসূরী মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেয়ার সূত্র ধরে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রেরিত অন্যান্য নাবী-রাসূল কর্তৃক প্রচারিত জীবন বিধান থেকে তাঁদের উম্মতের পথ বিচ্যুতির মতো সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনীত স্বচ্ছ ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও চর্চার সাথে বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিমের আক্বীদা-বিশ্বাসের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে ইসলামের মূল থেকে তাদের বিচ্যুত হওয়ার বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালক্রমে ইসলামের একত্ববাদী আদর্শের বিশুদ্ধতায় ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। নানা মতাদর্শের উদ্ভবের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ), তাঁর সম্মানিত বংশধরসহ পরবর্তীকালের ধার্মিক বা অর্ধামিক ব্যক্তিবিশেষকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত করে আউলিয়া উপাধিতে ভূষিত করেছে।

ডারউইনের জৈব বিবর্তনবাদের তত্ত্বানুযায়ী, প্রাণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে অ্যামিবার মতো একপ্রকার এককোষী সত্তা হতে। এককোষী ও অবিভক্ত প্রাণই ক্রমান্বয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রমের পর যৌগিক কোষে রুপান্তরিত হয়। তবে এ বিবর্তন তত্ত্ব ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এটা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতির পর্যায়ক্রমকেই মূলত সমর্থন করবে। কারণ, স্বধর্ম বিচ্যুতির পর্যায়ক্রমানুসারে, স্রষ্টার একত্ববাদের মতো সহজ-সরল ধর্ম কালের পরিক্রমায় মূর্তিপূজার মতো জটিল আকারে রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে, ধর্ম সরলতা ও সহজবোধ্যতাহীন হয়ে পড়ে। স্থান, কাল ও পাত্রের উপর ভিত্তি করে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদের প্রসার ঘটে।

শির্‌কের উৎপত্তি (পৃথিবীর সর্বপ্রথম শির্‌কের ঘটনা)

এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আদম (আ:) স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর সন্তানদেরকে তিনি সঠিক ধর্মের ওপরেই একই মুসলিম জাতিভুক্ত রূপে রেখে গেছেন। তখন তাদের ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন এবং মহান আল্লাহই ছিলেন তদের একক রব ও ইলাহ। তাদের মাঝে এ অবস্থা পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। কালের পরিক্রমায় যখন তাদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার অবনতি ঘটে, তখন তাদের চির শত্রু শয়তান তাদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে যেভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল ঠিক সেভাবেই সে তাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। অবশেষে তাদেরকে মু'মিন ও মুশরিক দু'টি দলে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (سورة يونس:١٩)

www.i-onlinemedia.net

'মানুষেরা তো (ধর্মের দিক থেকে প্রারম্ভে) একই জাতিভুক্ত ছিল, অতঃপর তারা (এ ক্ষেত্রে) মতবিরোধে লিপ্ত হয়' [সূরা ইউনুস (১০): ১৯]

নূহ (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক:

প্রথম মানব ও নাবী আদম (আ:) থেকে শুরু হওয়া আল্লাহ্‌র একত্বের মতাদর্শের মাঝে কিভাবে বহু-ঈশ্বরবাদের উন্মেষ ঘটল তা আমাদের শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন। আদম (আ:) থেকে নূহ (আ:) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক স্থাপিত মূর্তিকে পরিত্যাগ করে একমাত্র স্রষ্টার ইবাদাত করতে নূহ (আ:)-এর উম্মাতকে আহ্বান জানালে তারা কী জবাব দিয়েছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূহ-এর ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴿٢٣﴾﴾ (سورة نوح: ٢٣)

'আর তারা একে অপরকে বলেছিল, তোমাদের দেব-দেবীদের কক্ষনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুআ'আকে, আর না 'ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্‌রকে।' [সূরা নূহ (৭১): ২৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"যে প্রতিমার পূজা নূহ (আ:)-এর কওমের মাঝে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে তা কালক্রমে আরবদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। 'দুমাতুল-যান্দাল' নামক স্থানের 'কাল্‌ব' গোত্রের লোকদের দেবমূর্তি ছিল *ওয়াদ*[১], 'হুযাইল' গোত্র কর্তৃক *সুওয়া'আ* গৃহীত

[১] আবু জা'ফর আল-বাক্বি থেকে *'ওয়াদ'* সম্পর্কে একটি পৃথক বর্ণনা রয়েছে। তা হল, 'ইয়াযিদ ইবন আল-মুহাল্লাব এমন এক স্থানে নিহত হয়েছিলেন যেখানে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর উপাসনা করা হয়েছিল। *'ওয়াদ'* নামক ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ও সর্বাধিক নেককার বুজুর্গ মানুষ। তিনি তাঁর জাতির নিকটে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মারা গেলে লোকেরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি তাঁর তিরোধানের পর ব্যাবিলনের মানুষেরা তাঁর কবরের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে তাঁর জন্য খুবই আহাজারী করত। ইবলীস তাদের এ অবস্থা দেখে সুবর্ণ সুযোগটি হাত ছাড়া হতে দেয় নি, তাই একজন মানুষের আকৃতি ধরে আগমন করে সে তাদেরকে প্ররোচিত করে বলল, 'এ ব্যক্তির জন্য তোমাদের যে কী দুঃখ ও বেদনা, আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমি কি তোমাদের জন্য তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ করে দেব যা তোমরা তোমাদের যৌথ মিলন কেন্দ্রসমূহে রেখে এর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবে? তারা এতে সম্মত হলে সে তাঁর অনুরূপ একটি মূর্তি তৈরি করে দিল। তারা এটিকে তাদের যৌথ মিলনকেন্দ্রে রেখে তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। তাদের স্মরণের এ অবস্থা দেখে শয়তান পুনরায় এসে বলল, 'আমি কি তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে রাখার জন্য অনুরূপ মূর্তি তৈরি করে দেব? তারা এতেও সম্মত হলে সে প্রত্যেক গৃহবাসীর জন্য এর অনুরূপ মূর্তি তৈরি করে দেয়। তারা তা গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। তাদের সন্তানরা তাদের এ সকল কার্যকলাপ দেখতে থাকে। বংশবৃদ্ধি হয়ে যখন নতুন প্রজন্ম তাদের স্থান দখল করে নিল এবং তাঁকে স্মরণ করার মূল কারণ

www.i-onlinemedia.net

হয়েছিল দেবমূর্তি হিসেবে, *ইয়াগূছ* দেবমূর্তিকে প্রথমে গ্রহণ করে 'মুরাদ' গোত্র অবশ্য পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বানী গাত্বিফের দেবমূর্তি হিসেবে এবং এটি কওমে সাবা'র নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক এক স্থানে ছিল[১], দেবমূর্তি *ইয়া'উক্ব* গৃহীত হয় 'হামদান' গোত্র কর্তৃক এবং *নাস্র* দেবমূর্তির পূজা করত 'যুলকালা' গোত্রের হিমইয়া উপগোত্রের লোকেরা।[২] নূহ (আ:)-এর কওমের কিছু নেক লোকের নামও ছিল *নাসর*। আদম ও নূহ (আ:)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি খুব নেককার ও বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিল, যারা তাঁদের সৎকর্মপরায়ণতা সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করত। তাঁরা সকলেই এক মাসের মধ্যে একে একে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে স্বজনরা তাঁদের জন্য খুবই বেদনার্ত হল। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এ কথা বলে প্ররোচিত করল যে, 'তোমরা যেসব মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদাত করো, যদি তাঁদের বসার স্থানগুলোতে (বৈঠকশালা) এক একটি মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে দাও এবং তাঁদের নামে নামকরণ করো, তবে এ সব মূর্তি দেখে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাতের প্রতি অধিক আগ্রহী ও মনোযোগী হতে পারবে, তোমাদের ইবাদাত পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের স্মারক হিসেবে প্রতিকৃতি তৈরি করে জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে স্থাপন করল এবং উপাসনালয়ে আসা যাওয়ার সময় সে সব মূর্তির সাথে সাক্ষাত করে পুণ্যবানদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদাতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। তবে তাঁদের প্রজন্মের কেউই এ মূর্তিগুলোর পূজা করেনি। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এ নতুন প্রজন্মের লোকেরা ধীরে ধীরে মূর্তিগুলো স্থাপনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে গেল। এ সুযোগে শয়তান এসে তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, 'তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু মূর্তিই তৈরি করে রাখেন নি, বরং তারা তো অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এঁদেরই ইবাদত করত। উপরন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্রষ্টা ও উপাস্য হল এ সব মূর্তিই।

সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা অজ্ঞ রয়ে গেল, তখন তাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম আল্লাহ্কে ব্যতীত এ মূর্তিরই উপাসনা করতে লাগল। ফলে 'ওয়াদ'-এর মূর্তিই হল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তি, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যার পূজা-অর্চনা ও উপাসনা শুরু হয়। অতএব, এ পৃথিবীর প্রাচীনতম শির্ক হল নেককার মানুষের ক্বর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং যা মুসলিম সমাজে স্থানপূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাস্কর্য পূজায় রূপ নিয়েছে।" (ইবনু আবী হাতিম; ইবনু কাছীর, *ক্বাসাসুল আম্বিয়া*, পৃ. ১১৫; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬/২৬৯)

[১] অথবা ছাবা অথবা ইয়ামেনের প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত মাযহাজ গোত্র।

[২] ইয়েমেনের হিমায়্যার গোত্রের রাজা [মুহাম্মাদ ইবনু মানযূর, *লিসান আল-'আরব*, (বৈরুত: দার সাদির, নতুন সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, ৩১৩ পৃ.]

www.i-onlinemedia.net

তাছাড়া, এ মূর্তিগুলোকে ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত।' এ নতুন প্রজন্মের লোকেরা শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হল। ফলে বিভ্রান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং মূর্তিপূজার শির্কের সূচনা হল।[১] আর তাদের পরবর্তী বংশধরগণ মূর্তিপূজা অব্যাহত রাখল।[২]

আমাদের পূর্ববর্তীদের তাওহীদপন্থী বিশ্বাসের অভ্যন্তরে কিভাবে মূর্তিপূজা ও বহু-ঈশ্বরবাদের অনুপ্রবেশ হয়েছিল তা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীর উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়েছে। এ তথ্যটি স্বধর্ম স্খলনের মতাদর্শকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, পূর্ববর্তীগণের মূর্তিপূজার উৎসমূলকে প্রকাশ করে। উপরন্তু, কোন মানুষ বা প্রাণীকে মূর্তি বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে ইসলাম কেন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে তার ব্যাখ্যাও বিধৃত হয়েছে উপরোক্ত ব্যাখ্যায়।

যুগ পরম্পরায় শির্কের ক্রমবিকাশ

নূহ (আ:)-এর উম্মাত কর্তৃক শুরু করা শির্ক কিভাবে পরবর্তী যুগ পরম্পরায় ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল এবং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১. হুদ (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক:

একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত পরিত্যাগ করে নূহ (আ:)-এর ফেলে আসা মূর্তিপূজার 'শির্ক'-এর পুনরায় প্রচলন ঘটালো। মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ঘটে যাওয়া নূহের সর্বগ্রাসী প্লাবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতে জন্য তাদেরই মধ্য হতে হূদ (আ:)-কে নাবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। মূলত নূহ (আ:)-এর মহাপ্লাবনের পরে এ 'আদ সম্প্রদায়ই (আদ-ই-ইরাম) সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা শুরু করে।[৩]

'আদ জাতি মূর্তি নির্মাণে পটু ছিল। তাদের পূর্ববর্তী মূর্তিপূজকদের মতো তারাও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, '('আদ জাতি) এক মূর্তির পূজা করত, একে সামূদ বলা হতো; আর একটি মূর্তির পূজা করত, ঐ মূর্তিকে আল্-হাতার বলা হতো।'[৪] কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাদের মূর্তি ছিল তিনটি, যথা সামাদ, সামূদ ও হারা।[৫]

২. ইব্‌রাহীম (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক:

---

[১] মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়িসের বর্ণনা। আত্ব-ত্বাবারী।

[২] *বুখারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৪-৪১৫ পৃ., হাদীস নং ৪৪২; তাবারী, তাফসীর, ২৯ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; ইবনু কাসীর, সূরা নূহ। *বুখারী মওকূফ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করেন। 'তাফসীর' অধ্যায় হাদীস নং ৪৯২০।*

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড ১, পৃ. ১২১; আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আন্-নাজ্জার, পৃষ্ঠা ৫১।

[৪] আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আন্-নাজ্জার, পৃষ্ঠা ৫১-এর বরাতে *'সীরাত বিশ্বকোষ'*।

[৫] প্রাগুক্ত।

www.i-onlinemedia.net

ইবরাহীম (আ:)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত, এগুলো জগত নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদাপদ দূরীভূত করে, দু'আ কবূল করে, প্রয়োজন পূরণ করে। তারা আরো বিশ্বাস করত যে, এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহ ও সৃষ্টি জগতের মাঝে মধ্যস্থতাকারী এবং তাদেরকে দেয়া হয়েছে পৃথিবী পরিচালনার দায়-দায়িত্ব। এ বিশ্বাসের ফলে তারা অনুমানের ভিত্তিতে গ্রহ-নক্ষত্র, ফেরেস্তা প্রভৃতির মূর্তি তৈরি করে সেগুলোর ইবাদত করত।

৩. শু'আয়ব (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক:

শু'আয়েব (আ:)-এর সম্প্রদায় চরম বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করত এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, তাদের মাঝে 'শির্ক' ছিল বলেই শু'আয়ব (আ:) সর্বপ্রথম তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[১]

Old Testament-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাদের সবচেয়ে বড় দেবতার নাম ছিল 'বা'আল' (بعل)। তারা সবাই এ মূর্তির পূজা করত, মূর্তির সম্মানে সুগন্ধি পেশ করত, এ দেবতার নামে কুরবানীও করত। তাওরাতে তিনভাবে এ দেবতার নাম এসেছে। (১) বা'ল, (২) বা'ল ফায়ূর, (৩) বা'ল বারিস।[২]

৪. ইউনূস (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক:

ইউনূস (আ:)-এর উম্মাত চরম শির্কে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী ও শির্ক তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, কোনপ্রকার সত্য তাদের কানে প্রবেশ করছিল না। এভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে মুশরিকে পরিণত হয়েছিল।

৫. মূসা (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক (গোবৎস পূজার ঘটনা):

বনী-ইসরাঈলকে ফির'আউনের দাসত্ব হতে মুক্ত করাই ছিল মূসা (আ:)-এর প্রধান কাজ। কেননা, কোন পরাধীন জাতির পক্ষে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে যথাযথভাবে পালন করা কোনরূপেই সম্ভব নয়। মূসা (আ:)-এর সে কর্তব্য তিনি সমাধান করলেন।

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় মূসা (আ:)-এর মু'জিযার বলে লোহিত সাগরে ডুবে মরা থেকে সদ্য নাজাত পেয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাঊনী গোষ্ঠীকে সাগরে ডুবে মরার মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিয়া আসার পথে কিছুদূর অগ্রসর হতেই তারা এমন এক জনপদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের পূজা-অর্চনার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে তাদের মন সেদিকে আকৃষ্ট হল এবং মূসা (আ:)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করল,

---

[১] [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ৮৫], [সূরা হূদ (১১): ৮৪], [সূরা আল-'আনকাবূত (২৯): ৩৬]

[২] Book of Numbers (22:41; 25:3, 9:4)

www.i-onlinemedia.net

'তাদের মূর্তিসমূহের ন্যায় আমাদের জন্যও একটা মূর্তি বানিয়ে দিন।'[১] মূসা (আ:) বললেন, 'তোমরা মূর্খতায় লিপ্ত জাতি। এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করছে, তা সব বাতিল।' তিনি আরো বললেন, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য সন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'[২]

অত:পর বনী-ইসরাঈল তাঁর নিকট আরয করল, 'আমরা এখন সম্পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছি।' অতএব, যদি আমাদের জন্য কোন শরী'আত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা তা গ্রহণ করে নেব।' মূসা (আ:)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলেন যে, 'তুমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এস এবং তুমি তূর পর্বতে এসে এখানে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত 'ইবাদাতে লিপ্ত থাক। আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। যা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে।' তখন তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারপর তিনি হারুণ (আ:)-এর নের্তৃত্বে তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে ৩০ দিন সিয়াম ও ই'তেকাফে মগ্ন থাকেন। এরপর আল্লাহ আরও দশদিন মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এ দশদিন ছিল যিলহজ্জের প্রথম দশদিন, যা অতীব বরকতময়। এভাবে চল্লিশ দিন-চল্লিশ রাত সিয়াম ও ইতেকাফে অতিবাহিত করার পর তিনি তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে তাওরাত লাভ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তার কওম নিশ্চয়ই তার পিছে পিছে তূর পাহাড়ের সন্নিকটে এসে শিবির স্থাপন করেছে। কিন্তু তাঁর এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভূল।

মূসা (আ:) ত্রিশ দিন পরে নির্দিষ্ট সময়ে তূর পর্বত হতে ফিরে না আসায়, ক্ষীণ বিশ্বাসী ইয়াহুদীরা বিচলিত হয়ে উঠল। সে সময় সামেরী নামক জনৈক দলপতি ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করছিল। ওদিকে, মিসর থেকে বিদায়ের দিন যাতে ফেরাউনীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে এবং তারা কোনরূপ সন্দেহ না করে, সেজন্য (মূসাকে লুকিয়ে) বনী ইসরাঈলরা প্রতিবেশী ক্বিবতীদের কাছ থেকে অলংকারাদি ধার নেয় এ কথা বলে যে, আমরা সবাই ঈদ উৎসব পালনের জন্য যাচ্ছি। দু'এক দিনের মধ্যে ফিরে এসেই তোমাদের সব অলংকার ফেরৎ দিব। কিন্তু সাগর পার হওয়ার পর যখন আর ফিরে যাওয়া হল না, তখন কুটবুদ্ধি ও মূসার প্রতি কপট বিশ্বাসী সামেরী মনে মনে এক ফন্দি আটলো যে, এর দ্বারা সে বনী ইসরাঈলদের পথভ্রষ্ট করবে। তারপর মূসা (আ:) যখন তাঁর সম্প্রদায়কে হারুণের দায়িত্বে দিয়ে নিজে আগেভাগে

---

[১] [সূরা আ'রাফ (৭): ১৩৮]

[2] [সূরা আ'রাফ (৭): ১৪০]

www.i-onlinemedia.net

তূর পাহাড়ে চলে যান, তখন সামেরী সুযোগ বুঝে তার ফন্দি কাজে লাগায়। সে ছিল অত্যন্ত চতুর। সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার সময় সে জিব্রীলের অবতরণ ও তার ঘোড়ার প্রতি লক্ষ্য করেছিল। সে দেখেছিল যে, জিব্রীলের ঘোড়ার পা যে মাটিতে পড়ছে, সে স্থানের মাটি সজীব হয়ে উঠছে ও তাতে জীবনের স্পন্দন জেগে উঠছে। তাই সবার অলক্ষ্যে এ পদচিহ্নের এক মুঠো মাটি সে তুলে সযত্নে রেখে দেয়।

মূসা (আ:) চলে যাবার পর সে লোকদের বলে যে, 'তোমরা ফেরাঊনীদের যেসব অলংকারাদি নিয়ে এসেছ এবং তা ফেরত দিতে পারছ না, সেগুলো ভোগ-ব্যবহার করা তোমাদের জন্য হালাল হবে না। অতএব এগুলো একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও।' এ কথাটি অবশেষে হারূণ (আ:)-এর কর্ণগোচর হয়। নাসাঈ-তে বর্ণিত 'হাদীসুল ফুতূনে' আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)এর রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হারূণ (আ:) সব অলংকার একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন, যাতে সেগুলো একটি অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আ:)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা যায়। হারূণ (আ:)-এর নির্দেশ মতে সবাই যখন অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করছে, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হারূণ (আ:)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক- এ মর্মে আপনি দু'আ করলে আমি নিক্ষেপ করব, নইলে নয়।' হারূণ (আ:) তার কপটতা বুঝতে না পেরে সরল মনে দু'আ করলেন। আসলে তার মুঠিতে ছিল জিব্রীলের ঘোড়ার পায়ের সেই অলৌকিক মাটি। ফলে উক্ত মাটির প্রতিক্রিয়ায় হৌক কিংবা হারূণ (আ:)-এর দু'আর ফলে হৌক, সামেরীর উক্ত মাটি নিক্ষেপের পরপরই গলিত অলংকারাদির অবয়বটি একটি গো-বৎসের রূপ ধারণ করে হাম্বা হাম্বা রব করতে থাকে। মুনাফিক সামেরী ও তার সঙ্গী-সাথীরা এতে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল,

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ (٨٨ سورة طـه:٨٨)

'এটাই হল তোমাদের উপাস্য ও মূসার উপাস্য। যা সে পরে ভুলে গেছে।'

[সূরা ত্ব-হা (২০): ৮৮]

মূসা (আ:)এর তূর পাহাড়ে গমনকে সে অপব্যাখ্যা দিয়ে বলল, 'মূসা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে গেছে। এখন তোমরা সবাই গো-বৎসের পূজা কর।' কিছু লোক তার অনুসরণ করল। বলা হয়ে থাকে যে, বনী ইসরাঈল এ ফিৎনায় পড়ে তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে মূসা (আ:)-এর পিছে পিছে তূর পাহাড়ে গমনের প্রক্রিয়া পথিমধ্যেই বানচাল হয়ে গেল।

www.i-onlinemedia.net

হারূণ (আ:) তাদেরকে বললেন,

﴿مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي- قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ (سورة طـه: ٩٠)

'হে আমার জাতির লোকেরা! এর (অর্থাৎ গো-বৎসের) দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, তোমাদের প্রতিপালক হলেন দয়াময় (আল্লাহ), কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর আর আমার কথা মান্য কর। তারা বলল, 'আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে থাকব।' [সূরা ত্ব-হা (২০): ৯০-৯১]

তাছাড়া, মূসা (আ:) -কে আল্লাহ্ তা'আলা যে দশটি বিধান দিয়েছিলেন সেখানে এবং পুরাতন বাইবেলেও প্রতিমূর্তি অংকণ ও তৈরিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

'পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না, তা আকাশের কোন কিছুর মতো হোক বা মাটির উপরকার কিছুর মতো হোক কিংবা পানির মধ্যকার কোন কিছুর মতো হোক। তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমিই তোমাদের মা'বুদ।'[১]

৬. সুলায়মান (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক:

সুলায়মান (আ:)-এর সময়কালে বর্তমান সাবা জাতি ছিল মুশরিক ও প্রতীমা পূজারী, সূর্যই ছিল তাদের সর্বপ্রধান দেবতা।[২] তাছাড়া এরা তারকারাজির পূজাও করত।[৩] ইয়াহুদী বিশ্বকোষেও এদের সূর্য পূজার কথা বলা হয়েছে।[৪]

৭. ইলিয়াস (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক:

ইলিয়াস (আ:)-এর সম্প্রদায় আল্লাহ্র নির্ভেজাল তাওহীদ হতে বিমুখ হয়ে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তারা বা'আলের পূজারী ছিল। এমনকি ইলিয়াস (আ:)-এর স্ত্রী ঈযবীল 'বা'আল' নামক এ দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। এ

---

[১] *Exodus 20: 4 (হিজরত ২০: ৪)*

[২] বিস্তারিত জানতে [সূরা আন্-নামাল (২৭): ২৪-২৬]-এর বিশুদ্ধ তাফসীর দেখুন।

[৩] আম্বিয়া-ই-কুরআন, ২ খণ্ড, পৃ. ১৬৪-এর বরাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত *'সীরাত বিশ্বকোষ'*-এর সুলায়মান (আ:) সম্পর্কিত বর্ণনা দেখুন।

[৪] ১১ খণ্ড, পৃ. ২৩৬-এর বরাতে আম্বিয়া-ই-কুরআন, ৩ খণ্ড, পৃ. ১২২।

www.i-onlinemedia.net

বা'আল মূর্তিটি প্রাচ্যে বসবাসকারী সেমিটিক (সামী) জাতিসমূহের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও পূজনীয় দেবতা ছিল। 'বা'আল'-এর আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক ইত্যাদি। আর এ মূর্তিটি ছিল পুরুষ। একে শনি ও বৃহস্পতি নামক নারী নক্ষত্র দেবীদ্বয়ের স্বামী বলে মনে করা হতো। ফিনিশীয়, কিন'আনী, মুআবী ও মাদয়ানী লোকেরা বিশেষভাবে এর পূজা করত। বস্তুত বা'আলের পূজা অনেক প্রাচীন কাল হতে চলে আসছিল। মু'আবী ও মাদয়ানীরা মূসা (আ:)-এর সময় হতে এর পূজা করত। সিরিয়ার বিখ্যাত শহর বা'আলবাক্ক মূলত এ দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। শু'আয়ব (আ:) মাদয়ানে এ বা'আলের পূজারীদেরই হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হিজাজের দেবতা হুবালও এ বা'আলের আরেক নাম।

বা'আল দেবতার মাহাত্ম ও দানের কথা কল্পনা করে লোকেরা একে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করত। কেননা সেমিটিক জাতিগুলোর বা'আল পূজার উল্লেখ করে তাওরাতে বা'আলকে বা'আল বারীস ও বা'আল ফাযূর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকার লোকের নিকটে এ দেবতাটি 'বা'আল যাবুর' বা 'বি'ল' অথবা 'বি'লুস' বা বা'লুস' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।[১]

৮. ঈসা (আ:)-এর উম্মতের মাঝে শির্ক

ঈসা (আ:)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর তাঁর উম্মতের মাঝে শির্কের প্রবর্তন ঘটে। 'বুলিস' নামক জনৈক ধোঁকাবাজ, প্রতারক ঈসা (আ:)-এর ওপর বাহ্যিক ঈমান আনার নাম করে খ্রিস্টান ধর্মে ত্রিত্ববাদ, ক্রুশের পূজাসহ বিভিন্ন মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়।

একত্ববাদী ইয়াহুদী ধর্ম হতে বহু-ঈশ্বরবাদী খ্রিস্টান ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি হচ্ছে মূলধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার এক অন্যতম প্রমাণ। যিশু [ঈসা (আ:)] কর্তৃক প্রদর্শিত স্রষ্টার একত্বকে ধ্বংসের মাধ্যমে দ্বিত্ববাদের উত্থান ঘটানো হল। দ্বিত্ববাদ অনুযায়ী যিশু [ঈসা (আ:)] স্বয়ং স্রষ্টা ছিলেন না, বরং তাঁর সৃষ্ট পুত্র ছিলেন। অ্যানাক্সাগোরাস থেকে এরিস্টোটল পর্যন্ত প্রচারিত গ্রীক মতাদর্শে গ্রীকরা যিশুকে [ঈসা (আ:)-কে] *'লোগাস'* বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।[২] তারপর রোমানদের মধ্যে এ দ্বিত্ববাদের অধঃপতন ঘটে। ফলে ত্রিত্ববাদের উন্মেষ ঘটে। এমনকি ত্রিত্ববাদকে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন করে।[৩] অবশেষে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় সম্পূর্ণরূপে

---

[১] বিস্তারিত দেখুন সূরা আস্-সাফ্ফাত (৩৭): ১২৩-১৩২ নং আয়াতের তাফসীর।

[২] এ দার্শনিকদের মতানুসারে, মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী অশরীরী আত্মা হল *নাউস* এবং লোগাস হল *নাউস*-এর দৈহিক প্রকাশ। (*Dictionary of Philosophy and Religions*, ৩১৪ পৃ.।)

[৩] ক্যাপ্পাডোসিয়ানরা ত্রিত্ববাদের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক সূত্রের প্রণয়ন করেন এবং কন্সট্যান্টিনোপলের রোমান কাউন্সিল কর্তৃক ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে তা অনুমোদিত হয়। এ ত্রিত্ববাদ অনুযায়ী স্রষ্টা মাত্র একজন হলেও স্রষ্টা মূলত পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা- এ তিনজনের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রকাশ ঘটে। (*Dictionary of Philosophy and Religions*, ৫৮৬ পৃ.।)

www.i-onlinemedia.net

ত্রিত্ববাদের চর্চা চালু হয়। এ ক্ষেত্রে যিশুর [ঈসা (আ:)] মা মেরি [মারিয়াম (আ:)] এবং তথাকথিত অন্যান্য অনেক সন্তদেরকে মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে মধ্যস্থতাকারী বলে দাবী করা হয়। শুধু তাই নয়, মানুষের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষমতাও এদের উপরে অর্পণ করা হয়।

নাবী যিশু [ঈসা (আ:)] কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষানুসারে আদি খ্রিষ্টধর্ম স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানদের মতাদর্শের প্রভাবে তা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে যায়। এর ফলে মূর্তি তৈরির জন্য সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাধারণ যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধে নিহতদের, বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মযাজক (সন্ত), ধর্ম সংস্কারক, মেরি (মারিয়াম), যিশু [ঈসা (আ:)] এবং এমনকি স্বয়ং স্রষ্টার মূর্তি তৈরি করা হল।[১]

৯. আরব জাহানে শির্ক:

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রাসূল হয়ে প্রেরিত হওয়ার প্রাক্কালে আরব দ্বীপের অধিবাসীদের অধিকাংশ লোকেরাই 'আরবুল 'আরিবাহ ও 'আরবুল মুসতা'রিবা-এর অধঃস্তন বংশধর ছিল। মক্কা নগরী ও এর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে আল-'আরাবুল মুসতা'রিবা'দের বসবাস ছিল। তবে আল-'আরাবুল 'আরিবাহ'রাই হল সেখানে অভিবাসনকারী। এদের প্রথম পুরুষ যিনি এ দ্বীপে অভিবাসন গ্রহণ করেন, তিনি হলেন ইসমাঈল (আ:)। তাঁকে আমাদের আদি পিতা ইব্রাহীম (আ:) তাঁর মাতাসহ ছোট বেলায় কা'বা শরীফের পার্শ্বে আল্লাহ্‌র আদেশে রেখে গিয়েছিলেন।

ইসমাঈল (আ:) বড় হয়ে জনগণকে তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আ:)-এর দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানান। ফলে সে সময়ের অধিকাংশ লোকেরাই তাঁর অনুসারী হয়ে মহান আল্লাহ্‌র উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে সম্পূর্ণরূপে তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যায়। যুগের আবর্তনে যখন তাদের মধ্যে কয়েক প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্ম সম্পর্কে তারা নতুন করে কোন শিক্ষা পায়নি, তখন তারা ধর্মের অনেক বিষয়াদি ধীরে ধীরে ভুলতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের মাঝে শুধু তাওহীদী বিশ্বাস এবং ইব্রাহীম (আ:)-এর স্মৃতি বিজড়িত কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও নিদর্শনাদি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। অবশেষে তারা তাওহীদী বিশ্বাস থেকেও বিচ্যুত হয়ে মূর্তি পূজা করার ফলে মুশরিকে পরিণত হয়। তাদের মাঝে প্রতিমা পূজার মাধ্যমে শির্কী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় কা'বা শরীফের সম্মানে এর পার্শ্ব থেকে সংগৃহীত পাথরের চার পার্শ্বে ত্বাওয়াফ করার মাধ্যমে, যা তারা মক্কা থেকে দূর-দূরান্তে হিজরত করার সময় সাথে করে নিয়ে অবতরণ স্থলের এক পার্শ্বে স্থাপন করত। তাদের মাঝে ইব্রাহীম ও

[১] ঈশ্বরে (স্রষ্টায়) বিশ্বাসের নিদর্শন হিসেবে মূর্তি নির্মাণে নিসিয়ার দ্বিতীয় কাউন্সিল (৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) সরকারিভাবে অনুমোদন করেছিল। তাদের ধারণা মতে, স্বর্গীয় Logus (অর্থ 'শব্দ') যেহেতু সম্পূর্ণভাবে মানবীয় রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তাই তাঁকে যেকোন রূপে রূপায়িত করা যায়। (*Dictionary of Religions*, ১৫৯ পৃ.)

www.i-onlinemedia.net

ইসমাঈল (আ:)-এর ধর্মের কিছু বিষয়াদী যেমন- কা'বা শরীফের সম্মান করা, এর ত্বাওয়াফ, তজ্জ ও 'উমরা করা, সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ে সা'য়ী করা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উট ও বকরী কুরবানী বা উৎসর্গ করা... ইত্যাদি কর্ম প্রচলিত ছিল। যদিও এ সব ক্ষেত্রে তারা নিজ থেকে কিছু বিষয়াদী সংযোজন ও বিয়োজন করেছিল যা মূল ধর্মীয় কর্মের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

এরপর তাদের ধর্মীয় অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। তাদের মাঝে মূর্তি পূজার মাধ্যমে শির্কী কর্মকাণ্ড শুরু হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রিসালাত লাঝের প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে খুযা'আহ গোত্র প্রধান ও মান্যবর ব্যক্তিত্ব 'আমর ইবন লুহাই-এর মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ইবন হিশামের বর্ণনা মতে, 'আমর ইবন লুহাই কোন উপলক্ষ্যে মক্কা থেকে সিরিয়া গমন করে সেখানকার লোকদেরকে কতিপয় মূর্তির পূজা করতে দেখে বলে, 'এ মূতিগুলো কী, যাদের আপনারা উপাসনা করছেন?' উত্তরে লোকেরা বলল, 'এদের কাছে বৃষ্টি চাইলে এরা আমাদেরকে বৃষ্টি দান করে, সাহায্য চাইলে তারা আমাদের সাহায্য করে। এ কথা শুনে 'আমর ইবন লুহাই বলল, 'এদের মধ্য থেকে একটি মূতি আমাকে দান করুন, আমি সেটাকে আরব দেশে নিয়ে যাব, ফলে আরবরা এর উপাসনা করবে।' এতে লোকেরা তাকে 'হুবল' নামের একটি মূর্তি দান করে। তারপর সে তা নিয়ে মক্কায় আগমন করে এবং তা কা'বা শরীফের নিকটতম এক স্থানে সম্মানের সাথে স্থাপন করার পর আরব জনগণকে এর উপাসনা ও সম্মান করার জন্য নির্দেশ করে।

এ 'আমর ইবন লুহাই ছিল জ্বিন সাধক। সে তার অনুগত জ্বিনের পরামর্শ অনুযায়ী নূহ (আ:)-এ জাতির উপাস্য সেই মূর্তিগুলো জিদ্দা এলাকা থেকে মাটি খনন করে বের করে নিয়ে আসে। সেগুলোকে নূহ (আ:)-এর সময়কার প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও তুফান এ অঞ্চলে বয়ে নিয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে বন্যার পানি নেমে যাবার সময় এগুলো জিদ্দা এলাকার চরাঞ্চলে আটকা পড়েছিল এবং পরবর্তীতে তা বালুর নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। 'আমর ইবন লুহাই তার অনুগত জ্বিনের পরামর্শে এগুলোকে বের করে নিয়ে এসে হজ্জের মৌসুমে আরব জনগণকে এগুলোর উপাসনা করার প্রতি আহ্বান জানায়। লোকেরা এতে তার আনুগত্য স্বীকার করলে সে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে তা বন্টন করে দেয়। সে অনুযায়ী 'ওয়াদ' নামের মূর্তিটি ছিল দাওমাতুল জানদাল এলাকার 'কালব' গোত্রের নিকট, সুয়া' নামের মূর্তিটি ছিল 'হুজায়েল' গোত্রের নিকট, 'ইয়াগুছ' নামের মূর্তিটি ছিল হামাদন গোত্রের নিকট।

উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির পাশাপাশি আরব জনপদে আরো অসংখ্য মূর্তি ছিল। আরবের লোকেরা ছোট-বড় বিভিন্ন রকমের মূর্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মূতি হচ্ছে লাত, উয্যা, মানাত, ইয়াসাফ, নায়েলাহ, জুল খাসাসাহ, জুল কাফীল ইত্যাদি। এ ছাড়া কা'বার বাইরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা বা পূজা করার পাশাপাশি আরবের জনগণ নানা রকম পাথর, গৃহ, ফেরেশতা, জ্বিন ও গাছের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছিল।

www.i-onlinemedia.net

আরবরা যে সকল শির্কে নিমজ্জিত ছিল তা নিম্নরূপ:

জ্ঞানগত শির্ক:

১. তাদের ভাগ্য জানার জন্য গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট গমন করা,
২. দেবতারা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দিতে সক্ষম বলে মনে করা,
৩. আউলিয়া নামের দেবতাদেরকে শাফা'আতকারী মনে করা,
৪. দেবতার নিকট থেকে ভাগ্য যাচাই করা,
৫. পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করা,
৬. ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদেরকে প্রতিপালকের বৈশিষ্ট্য দান করা,
৭. কোন কোন রোগ নিজ থেকে সংক্রমিত হয় বলে বিশ্বাস করা,

উপাসনাগত শির্ক:

১. চন্দ্র ও সূর্যকে সিজদা করা,
২. দেবতাদের যিয়ারত করতে দূর-দূরান্তে গমন করা,
৩. দেবতাদের চারপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা,
৪. বরকত হাসিলের জন্য দেবতাদের গায়ে হাত বুলানো,

অন্তরের ইবাদতগত শির্ক:

১. দেবতাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা,
২. দেবতাদের অনিষ্টের গোপন ভয় করা,
৩. বিপদে দেবতাদের শরণাপন্ন হওয়া,
৪. বিপদে দেবতাদেরকে আশ্রয়স্থল হিসেবে মনে করা,
৫. দেবতাদের উপর ভরসা করা।

অভ্যাসগত শির্ক:

১. দেব-দেবীদের নামে শপথ করা,
২. দেব-দেবীদের নামে সন্তানাদির নাম রাখা,
৩. দেব-দেবীদের নিকট সন্তানের জন্য কল্যাণ কামনা করা,
৪. আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে কোন বস্তু হালাল বা হারাম করা,
৫. শির্কযুক্ত কথার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক দেয়া,
৬. শিশুদের তা'বিজ পরানো,
৭. শিশুদের গলায় ঝিনুকের মুক্তা ঝুলিয়ে রাখা,
৮. রোগ নিরাময়ের জন্য ধাতব দ্রব্য নির্মিত বালা ব্যবহার করা,
৯. মূর্তি ও প্রতিমার স্থলে মেলা বসানো,
১০. নাবী ও অলিদের কবরে মসজিদ নির্মাণ করা,
১১. পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা,
১২. উপত্যকার জ্বিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা,
১৩. বরই গাছ দ্বারা বরকত গ্রহণ করা।

www.i-onlinemedia.net

মূর্তি, প্রতিমা পূজা এবং শির্ক ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ যে ধর্মের কথা উপরে আলোচিত হল তা হচ্ছে প্রায় সকল আরবদের ধর্ম। ফলে, এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ইব্রাহীম (আ:)-এর ধর্মের ক্ষেত্রে যে বিকৃতি আরবগণ আনয়ন করেছিল, তা শির্কের সকল প্রকারকেই শামিল করেছিল। একইভাবে তারা আল্লাহ্র ইবাদতের ক্ষেত্রেও বিকৃতি সাধন করেছিল, যা তাদের নিকট বিদ'আতে হাসানাহ (উত্তম বিদ'আত) হিসেবে গণ্য ছিল। তাদের যাবতীয় শির্কী ও বিদ'আতী বিশ্বাস ও কর্মই তাদেরকে ইব্রাহীম (আ:)-এর দ্বীন থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাকে একক সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং দ্বীনে ইব্রাহীমের কিছু কর্ম করে এর অনুসারী বলে তাদের শত দাবী থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাদেরকে কাফির ও মুশরিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্র স্বীকৃতি, কা'বা শরীফের ত্বাওয়াফ ও সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি ভাল কর্ম করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর দৃষ্টিতে তারা মুসলিম থাকতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুগে যুগে দ্বীনে মুহাম্মাদীর অনুসারীদের মধ্যে যারা আরব জনগণের অনুরূপ হবে, তারাও দ্বীনে মুহাম্মাদীর অনুসারী হওয়ার শত দাবী করে থাকলেও তারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর দৃষ্টিতে মুসলিম থাকতে পারবে না।

১০. উম্মাতে মুহাম্মাদীর মাঝে শির্ক:

খালেস তাওহীদের দাবীদার এবং তাওহীদের ভিত্তির ওপর যাদের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত সে সব মুসলিমদের নিকটে এটা অবিসংবাদিত কথা যে, স্থান ও পাত্র পরিবর্তন দ্বারা কখনো বস্তুর মূল তত্ত্বের বিবর্তন হয় না। মুশরিকদের মধ্যে যেসব বস্তু শির্ক, আহলে কিতাবদের মধ্যে এবং মুনাফিকদের মধ্যে যা কিছু শির্ক, সেই বস্তুই যদি মুসলিমেদের মধ্যে পাওয়া যায়, তা কখনো তাওহীদ হবে না, বরং শির্কই থাকবে। মলমূত্র যদিও স্বর্ণ-রৌপ্যের নির্মিত সুন্দরতম পাত্রে রাখা হয়, উভয় স্থানেই তা অপবিত্র। স্থান ও পাত্র পরিবর্তনের ফলে তার মূল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনই পার্থক্য হয় না। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তার হুকুম অবশ্যই পরিবর্তন হয়।

মুসলিমদের অবস্থা যদি পর্যলোচনা করা হয় এবং প্রকৃত সত্যকে স্বীকৃতি দিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তবে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রাচীন আরবীয় জাহিলিয়াত হতে আরম্ভ করে মুনাফিকদের পর্যন্ত শির্কের যতগুলো শ্রেণী রয়েছে, তার প্রায় সবটুকুই মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। বিবর্তন শুধু রূপরেখায় এসেছে, আসল বস্তুতে নয়। জাহেলী আরবে জ্বিনদের পূজা, নক্ষত্ররাজীর পূজা, পূর্বপুরুষদের পূজা, আলিম-উলামা-পীর-পুরোহিত ও ধর্ম যাজকদের পূজা, জিবত পূজা, তাগুতের পূজা, জাতি পূজা ও শির্কের সহায়তা, মুনাফিকদের তাগুত

www.i-onlinemedia.net

পূজা, আমিত্বের পূজা, স্বার্থের পূজা ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে এমন কোন পূজা নেই, যা বর্তমান মুসলিম সমাজে পাওয়া যাবে না।

বহু মুসলিম রয়েছে যারা যাদু বিদ্যা, ভাগ্য গণনা বিদ্যা ইত্যাদি অভিশপ্ত শির্কী কাজের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। তারা তাবীজ-তুমার, যাদু-টোটকা, সোলায়মানী তেলেসমাতি ইত্যাদি শির্ককে জীবিকা অর্জনের পেশা বানিয়ে নিয়েছে।

জ্বিন বশীভূত করা ও শয়তানী আমল-আক্বীদার ইলমই তাদের কাছে আসল ইলম। জ্বিন-বশীভূত করার জন্য তারা নানারূপ কঠোর যোগসাধনা করে, চিল্লায় বসে ও নযর-নিয়ায, শিন্নি ও মান্নত করে। আর জ্বিন-ভূত ইত্যাদিকে গায়েবী ইলম লাভের মাধ্যম ভেবে থাকে। তাদেরকে ক্ষতিকারক ও উপকারকারক ভাবতেও ত্রুটি করে না। বহু অবস্থায় তাদের দোহাই দেয় এবং তাদের সাথে সম্পর্কের দরুন অনেক বৈধ বস্তুকেও অবৈধ করে নেয় এবং অবৈধকেও বৈধ করে।

বর্তমান যুগের তাবীজগুলো সাধারণত মুশরিকী ও দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত। কুরআনের আয়াত অবলম্বনের তাবীজ লিখা হলে তাও হয় আয়াতগুলো তাহরীফ ও রদ-বদল করা অবস্থায়।

অনেক মুসলিম যারা ইলমুল আসমায়া (আল্লাহর নামসমূহের জ্ঞান) ও কালিমার খাসিয়াতসমূহের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ জ্ঞানকে ইয়াহুদীরা যেরূপ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করত, একইভাবে তারাও অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করে, এমনকি কিছু যাদের লোক স্বয়ং কুরআনকে বেগানা নর-নারীর প্রেম-ভালবাসা, শত্রুতা বশীকরণ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি কাজের দফতর বানিয়ে নিয়েছে।

বস্তুত মানুষ সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা প্রিয় এবং অদৃশ্য সত্তার চেয়ে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি অধিকতর আসক্ত। ফলে নূহ (আ:)-এর যুগ থেকেই অদৃশ্য আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের অসীলা কল্পনা করে নিজেদের হাতে গড়া দৃশ্যমান মূর্তিসমূহের পূজ-অর্চনা চলে আসছে। অবশেষে আল্লাহকে ও তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে মানুষ মূর্তিকে ও নিজেদের মনগড়া বিধানকে মুখ্য গণ্য করেছে। মক্কার মুশরিকরাও শেষনাবীর কাছে তাদের মূর্তিপূজাকে আল্লাহর নৈকট্যের অসীলা বলে অজুহাত দিয়েছিল। তাদের এ অজুহাত অগ্রাহ্য হয় এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়। বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধসহ পরবর্তীকালের সকল জিহাদ মূলত এ শির্কের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সে স্থান আজ দখল করেছে মুসলিমদের মধ্যে কবর পূজা, ছবি-মূর্তি ও প্রতিকৃতি পূজা, স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনার ও বেদী পূজা, শিখা ও আগুন পূজা ইত্যাদি। বস্তুত এগুলো স্পষ্ট শির্ক, যা থেকে নাবীগণ যুগে যুগে মানুষকে সাবধান বাণীর দ্বারা জন্য ধমকানোর পর তাদের হুঁশ ফিরল এবং তাঁরা বিরত হল।

সক্ষেপে বর্তমানের মুসলিম জনসাধারণের সামগ্রিক ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে এখানে উল্লেখিত হল। উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে বিদ্যমান শির্ক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানোর উদ্দেশ্যে আমাদের বাস্তব জীবনে ও সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের শির্ক সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে।

www.i-onlinemedia.net

বাংলার মুসলিম সমাজে শির্‌কের অনুপ্রবেশ

বাংলার মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে কখন পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার মতো সন, তারিখ নির্ধারণ করে বলা মুশকিল। তবে নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজে এর অনুপ্রবেশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন, 'বাংলার মুসলিম সমাজে শির্‌ক ও বিদআত অনুপ্রবেশ করে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় থেকে। তিনি হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলনের ধারক মন্ত্রীসভার দ্বারা পরিচালিত হোসেন শাহ শ্রী চৈতন্যর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিমরা হিন্দু প্রজামণ্ডলী বেষ্টিত হয়ে বসবাস করতে লাগল। মসজিদের পাশে দেব মন্দিরের ঘন্টা বাজতে লাগল। মুহাররম, ঈদ, শব-ই-বরাত ইত্যাদির পাশে দুর্গোৎসব, রাস, দোল উৎসব চলতে লাগল।'

তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণববাদের প্রবল প্লাবন বাংলার মুসলিম সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমকে সহজেই আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল হিন্দু তান্ত্রিকদের অপরাধমূলক অশ্লীল ও জঘন্য সাধন পদ্ধতি, বাবাচারীদের পঞ্চতত্ত্ব। পরবর্তীকালে ইসলাম বৈরীরা বাদশাহ আকবর (১৪৫৩-১৬০৫ ঈসায়ী) তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য সাধনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি দ্বীনে ইলাহী নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করে গেছেন।

অন্যদিকে কবি-সাহিত্যিকরা যেমন- আব্দুস শুকুর ও সৈয়দ সুলতান শৈব ও তান্ত্রিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা করে কবি আলাউল ও মির্জা হাফিজ যথাক্রমে শিব ও কালীর স্তবস্তুতি বর্ণনা করে কবিতা রচনা করে। তাদের কবিতা, সাহিত্য, পাঁচালী, সংগীত প্রভৃতি তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সৈয়দ সুলতান নাবী বংশের তালিকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং কৃষ্ণকে সন্নিবেশিত করে। তান্ত্রিক গুরুদের প্রতি এ বিশ্বাসই ধর্মান্তরের ফলে পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সময়ই পীর পূজা ও কবর পূজার ব্যাধি মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। পীরের প্রতি তাদের অতিভক্তির ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। মূলত পীর পূজা, কবর পূজা ছাড়াও 'কদম রাসূল' নামে আরো এক ধরনের কুসংস্কার বহুকাল পূর্ব হতেই বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল। বাংলায় এ 'কদম রাসূল'-এর সংখ্যা পাঁচটি। এ জাতীয় নানা উপলক্ষ্য বানিয়ে তারা শির্‌ক ও বিদআতে লিপ্ত হতো।

মানুষের শির্‌ক দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার পর্যায়ক্রম:

আমাদের সমাজে অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ে শির্‌ক সংক্রমিত হয় যা অনেক সচেতন ব্যক্তিই সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আজ এতদসংক্রান্ত

www.i-onlinemedia.net

শির্কমূলক কার্যক্রম ব্যাপক মাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ আমাদের মুসলিম সমাজে শির্কের উৎপত্তি কিভাবে হল, উদাহরণস্বরূপ তা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উল্লেখিত হচ্ছে :

১. আল্লাহ্র আইন না মানা সংক্রান্ত শির্কঃ

আমাদের দেশে মানুষের মনগড়া আইন চালু আছে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করলে বোঝা যায় যে, মানুষের তৈরি চালু আইনকে মন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব আইন বৈধ মনে করা যে শির্ক অনেকেই তা বুঝে না। যারা এ সব অবৈধ আইনকে উৎখাত করে আল্লাহ্র আইন তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আইন চালু করার চেষ্টা করে তারা শির্ক থেকে বেঁচে গেল। ইসলামের তাওহীদী আক্বীদায় আল্লাহর একত্বের অনন্যতা স্বীকৃত যেমন বিশ্বসৃষ্টি,'লালন-পালন, রিযিক দান এবং দু'আ ও ইবাদত পাবার অধিকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে, অনুরূপভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে নিরংকুশভাবে আনুগত্য করে চলতে হবে কেবল এক আল্লাহকেই। মানুষের নিকট এ আনুগত্য পাবার একমাত্র অধিকার হচ্ছে আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত আর কারোই এ অধিকার নেই, যেমন সমগ্র বিশ্বলোক, বিশ্বলোকের অণু-পরমাণু পর্যন্ত আনুগত্য করে চলেছে এক আল্লাহর। উপরন্তু, নিখিল জগতের সবকিছুর ওপর যেমন আল্লাহর বিধান চলে এক আল্লাহর তেমনি মানুষের জীবনেও সর্বদিক ও বিভাগে আইন জারী করার নিরংকুশ অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর সৃষ্ট এ মানুষের ওপর আল্লাহর ছাড়া আর কারোরই আইন জারী করার অধিকার নেই। মানুষও পারে না আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মেনে নিতে ও পালন করতে। করলে তা হবে সম্পূর্ণরূপে অনধিকার চর্চা, অন্যায় এবং অনাচার; তা হবে সুস্পষ্টরূপে শির্ক।

বস্তুত মানুষের জন্য আইন-বিধান আল্লাহই রচনা করবেন, মানুষ তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবল তাঁরই দেয়া আইন পালন করে চলবে। তাঁর দেয়া আইন-বিধানের বিপরীত কোন কাজ কিছুতেই করবে না। কেননা, মানুষের ওপর হুকুম করার অন্য কথায় আইন দেয়ার ও জারী করার অধিকার তো আল্লাহ ছাড়া আর কারোই নেই, থাকতে পারে না। এ বিষয়ে মূল কথা হল, আমরা কাকে এ অধিকার দিচ্ছি যে, সে আমাদের জন্য আইন রচনা করবে, আর আমরা তা পালন করব, করতে প্রস্তুত হব, আর কাকে এ অধিকার দিচ্ছি না। যদি আমরা একমাত্র আল্লাহকে এ অধিকার দেই, তাহলে আল্লাহর তাওহীদ বিশ্বাস পূর্ণ হল, আর যদি অন্য কাউকে কাউকে, কোন ব্যক্তিকে, কোন প্রতিষ্ঠানকে এ অধিকার দেই বা অধিকার আছে বলে মনে করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে-ই হল আমাদের আল্লাহ, আর আমরা তার বান্দা-দাস। কিন্তু এ শেষোক্ত অবস্থা নিঃসন্দেহে শির্ক-এর অবস্থা।

নির্দেশ দান, হস্তক্ষেপকরণ, ইচ্ছা করা ও মালিকানা বা নিরংকুশ কর্তৃত্ব এ সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি তাঁর বান্দাদের চূড়ান্তভ বে নির্দেশ

www.i-onlinemedia.net

দিয়েছেন যে, তারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই ইবাদাত-বন্দেগী বা দাসত্ব করবে না। মূলত, যার হুকুম পালন করা হয়, কার্যত তারই দাসত্ব করা হয়। আর কারো হুকুম আইন, আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম পালন করা, মেনে নেয়া ও অনুসরণ করাই হচ্ছে শরীয়াতের পরিভাষায় ইবাদাত। কাজেই এ ব্যাপারে আল্লাহকেই একমাত্র আইনদাতা বলে মেনে নেয়া তাওহীদেরই আক্বীদা এবং আমল। আর এ দিক দিয়ে অপর কাউকে এ অধিকার দিলে তা হবে সুস্পষ্ট শির্ক। রাসূল (ﷺ)-এর পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও মুসলিমদের আক্বীদা ও আমল ছিল এ রকমই।

কিন্তু উত্তরকালে মুসলিম সমাজে তাওহীদের এ মৌলিক ভাবধারা- যাকে আমাদের ভাষায় বলতে পারি, তাওহীদ আক্বীদার রাজনৈতিক তাৎপর্য স্তিমিত হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এমন একদিনও আসে, যখন মুসলিমরা দ্বীন-ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিকে দুই বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন বিষয় বলে মনে করতে শুরু করে এবং এ মনোভাবের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। কেবল আল্লাহর হুকুমই নয়, সেই সঙ্গে ধর্মনেতা তথা পীর সাহেবের হুকুম পালন করাও দরকারী বলে মনে করে। জীবনের বৃহত্তম দিক- রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কাজকর্মকে ইসলামের আওতার বাইরে বলে মনে করে। সেখানে মেনে নেয়া হয় রাজনীতিক ও শাসকদের বিধান। সলাতের ইমামতি ধার্মিক লোকেই করবে বলে গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফাসিক্ব-ফাজির তথা ইসলামের দুশমনদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করা হয় না। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনে যারা ধর্মকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করে, পালন করা দরকার মনে করে, তারাই যখন রাজনীতি করতে নামে, তখন সেখানে করে চরম গায়র-ইসলামী রাজনীতি, চরম শরীয়াত বিরোধী সামাজিকতা এবং সুস্পষ্ট হারাম উপায়ে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কেননা, এ সবের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে হুকুম দেয়ার অধিকার দিতে রাজি হয় না, আল্লাহর হুকুম এ ক্ষেত্রেও মেনে চলতে হবে তা মনে করতে পারে না। ধর্ম ও রাজনীতি কিংবা ধর্ম ও অর্থনীতি ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন মনে করাই হল আধুনিক সেকিউলারিজমের মূল কথা এবং ইসলামের তাওহীদী আক্বীদার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকে এটা হল এক মারাত্মক বিভ্রান্তি। এ পর্যায়ে এসে সমাজের ধার্মিক লোকেরা আল্লাহকে পাবার জন্য পীর ধরা ফরয বলে প্রচার করে। আর অপর শ্রেণীর লোকেরা রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও ডিকটেটরী শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত ইসলামসম্মত মনে করতে শুরু করে। ফাসিক্ব-ফাজির নেতা, রাজা-বাদশাহ ও ডিকটেটরকে বাস্তব জীবনে আইন-শাসনের ক্ষেত্রে ঠিক আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দেয়। মুসলিমদের বাস্তব আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিক দিয়ে আলিম ও পীরকে এবং জাগতিক ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ, রাজনৈতিক নেতা ও ডিকটেটরকে

www.i-onlinemedia.net

আল্লাহর সমতুল্য করে তুলেছে। আল্লাহ যেমন মানুষের ওপর নিজস্ব আইন-বিধান জারি করেন, তেমনি ধর্মনেতা বা পীর-বুযুর্গ এবং রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রকর্তাদেরও নিজেদের মর্জীমতো আইন-বিধান জারী করার অধিকার আছে বলে মনে করেছে। ইসলামী ধর্ম ব্যবস্থায় এবং বৈষয়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমনিভাবেই এক মহা বিদআতের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে। আর তারই ফলে আল্লাহর একচ্ছত্র তাওহীদী ধর্মে ধর্মনেতার তথা পীর-বুযুর্গ লোকদের এবং রাজনীতি ও সমাজ সংস্থায় সমাজকর্মী, সমাজনেতা, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে শির্কের এক অতি বড় বিদআত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে ক্রমশ এমন একদিন এসে পড়ে, যখন রাজা বাদশাহ ও রাষ্ট্রকর্তাদের রচিত আইন-বিধান পালন করাকে আল্লাহর আইন পালনের মতোই কর্তব্য বলে মনে করতে থাকে। আর তাদের নাফরমানীকে আল্লাহর নাফরমানীর মতোই গুনাহের কাজ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। অথচ, মুসলিমদের অবশ্য পালনীয় কাজ ছিল, এরূপ একজন ইমাম বা খলীফা নিয়োগ করা সেই দ্বীন-ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, যে দ্বীন হল মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ সামগ্রিক জীবনের ভিত্তি।

২. আল্লাহ্‌কে রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে না মানা সংক্রান্ত শির্ক:

এ কথা কেবল মুসলিমদেরই নয়, পৃথিবীর কারোরই অজানা থাকার কথা নয় যে, ইসলামের মূল আক্বীদাই হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদ মানে আল্লাহর একত্ব। আল্লাহর এ একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাত্মক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা ও আইন-বিধানদাতাও। অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহকে, ইবাদাত-বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহর। সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও লালন-পালনকারী হিসেবে মানবে একমাত্র আল্লাহকে। এ সব দিক দিয়ে তিনিই একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নেই, কেউ ইলাহ নয়, কেউ মাবুদ হতে পারে না এবং তিনিই একমাত্র রব, তিনি ছাড়া লালন-পালনকারী ও ক্রমবিকাশ দাতা, রক্ষাকর্তা ও প্রয়োজনপূরণকারী আর কেউ নেই। মাবুদ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া আর কেউ মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী ও আনুগত্য পাবার অধিকারী নয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, রব হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, একক, অনন্য আর ইলাহ হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, লা-শরীক। রবুবিয়্যাতের দিক দিয়েও আল্লাহ এক, উলুহিয়্যাতের দিক দিয়েও তিনি এক। এর কোন একটি দিক দিয়েও তাঁর শরীক কেউ নেই, জুড়ি নেই কেউ, সমতুল্য কেউ নেই।

www.i-onlinemedia.net

ইসলামে এ তাওহীদী আক্বীদা কুরআন থেকে প্রমাণিত, প্রমাণিত সহীহ হাদীস থেকেও। রাসূল (ﷺ) সর্বশেষ নাবী ও রাসূল হিসেবে এ আক্বীদাই-ই পেশ করেছেন বিশ্ববাসীদের সামনে। দাওয়াত দিয়েছেন মৌলিক আক্বীদা হিসেবে এ তাওহীদকে গ্রহণ করার। যাঁরা সেদিন ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁরা সকলে তাওহীদের এ ধারণার প্রতি ঈমান এনেই হয়েছিলেন মুসলিম। অতএব রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীরাও ছিলেন এ আক্বীদায় বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে তাঁরা কখনও দুর্বলতা দেখাননি, এ ক্ষেত্রে কারো সাথে তাঁরা রাজী হননি কোনরূপ আপোষ বা সমঝোতা করতে। অতএব এটাই হচ্ছে সুন্নাতের তাওহীদ।

কিন্তু ইসলামের এ সুন্নাতী আক্বীদায় বর্তমানে দেখা দিয়েছে নানা শির্ক ও বিদআত। মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে শিকার করা হয় বটে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহর উলুহিয়্যাতী তাওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে; কিন্তু তার রবুবিয়্যাতের তাওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না। মুখে স্বীকার করা হলেও কার্যত অস্বীকার করা হচ্ছে। বরং এ ক্ষেত্রে অন্য শক্তিকে শরীক করা হচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে শির্ক। শব্দগত আক্বীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব বলে স্বীকার করা হয়; কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত বুযুর্গ লোকদের নিকট থেকে কোন কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিস্কৃতি চায়, উন্নতি তাদের নিকট থেকেই চায় লাভ করতে। মনে করে, এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দু'আ শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফয়েজ দিতে পারে। ভাল-মন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যই তাদের উদ্দেশ্যে মানত মানে, পশু যবাই করে, সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্য ব্যয় করা কর্তব্য মনে করে। ধীরে ধীরে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক থেকে ভক্তেরা এসে জমায়েত হয়। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো গমন করে তাদের জাতীয় তীর্থভূমে।

ইসলামের তাওহীদী আক্বীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট আর কাউকে সম্বোধন করে দু'আ করা সুস্পষ্ট শির্ক।

৩. ওলী-আওলিয়া, দরবেশ ও বুযুর্গদের প্রতি ধারণাপোষণ সংক্রান্ত শির্ক:

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দর্শন ও প্রযুক্তির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করেও আধুনিক সমাজে অনেক বিজ্ঞজনই এমন ধারণা পোষণ করে যে, এ পৃথিবীতে অনেক সম্মানিত ওলী, দরবেশ, কুতুব, সালেহ মনীষী আছেন, যারা মানব সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ ইলাহী শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। তাঁরা মানুষের

www.i-onlinemedia.net

জীবনে উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় ও লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে অনেক কঠিন সমস্যা ও সংকটময় মুহূর্তে তাঁদেরকে সাহায্য-সমাধানের মুক্তিদাতা মনে করে স্রষ্টার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এ ছাড়া, আমাদের সমাজে এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, তথাকথিত জীবিত ওলী-সাধকদের চেয়ে মৃত ওলী ও দরবেশগণ অধিক রূপান্তর শক্তিতে মহিমান্বিত। তাই আমরা অগাধ মানসিক শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাস ধারণপূর্বক তাঁদের মাযারে গমন করি এবং তাঁদের নাম ধরে সরাসরি অসিলা করে দু'আ কামনা করি। এ ধরনের কাজ ও বিশ্বাস নিঃসন্দেহে শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কঠিন সমস্যা, রোগ-ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি অসুবিধায় পতিত হলে প্রচুর আহারীয় সামগ্রী, কালো টাকার বান্ডিল এবং অনেক নযর-মানত নিয়ে তাদের মাযারে গমন করি, অধিকন্তু তাদেরকে দু'আ ও মুক্তিদূত মনে করি। ইসলামী অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে প্রবৃত্তিগতভাবে এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যা প্রকাশ্য শির্ক। অবশ্য এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আওলিয়া, মাশায়িখ ও সালেহীন মনীষীগণ যেহেতু আল্লাহর বিধানের তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে সাধনা করেন, সেহেতু তাদেরকে কদমবুছি, এমনকি কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করাতে কোন দোষ নেই। বরং এটা পালনযোগ্য শিষ্টতাও বটে। মূলত এ সবের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে শির্ক ও বিদ'আত সংঘটিত হয়। লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই মূলত এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্কের সূচনা হয়েছিল। তাদের যা মর্যাদা তার চাইতে বেশী তাদেরকে সম্মান করা হয়েছিল, আর এ ধরনের ক্রিয়াকলাপই শির্কের চোরা গলির দরজা উন্মুক্ত করে।

সুন্নাহ ও শির্ক সংক্রান্ত কাম্য শিক্ষা না থাকার কারণে সমাজে আজ এ জটিলতা বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের শরীয়ত, সুন্নাহ ও শির্ক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি অত্যাবশ্যক বলে মনে করতে হবে।

www.i-onlinemedia.net

অদৃশ্য জগতে রয়েছে জ্বিন মুহূর্তেই তারা হয়ে যায় বিলীন

আমাদের মুসলিম সমাজে আমরা অনেকেই জ্বিনকে ভয় করি এবং কেউ কেউ আবার তাদের অনুকম্পা প্রাপ্তির মানসে কৌতূহলবশত কিছু সামাজিক কাজের অজুহাতে অপসংস্কৃতির চর্চা করে থাকি, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শির্কের পর্যায়ভূক্ত। যেমন কেউ কোন নতুন বাড়ি করার সময় সেখানে জ্বিনের ভয় অপসারণের লক্ষ্যে কুরবানী মানত করে, কেউ আবার নতুন পুকুর খননের উদ্দেশ্যে তার পাড়ে পশু যবেহ করে অথবা প্রকাণ্ড বৃক্ষ কাটার সময় সেখানে পশু কুরবানী করে- এ ধরনের সকল কার্যক্রম অবশ্যই শির্কী। ইসলামে এ সব কর্মকাণ্ডের কোন স্বীকৃতি নেই এবং এগুলো অমুসলিম সমাজের শির্ক যা অতি সূক্ষ্মভাবে আমাদের সমাজে সংক্রমিত হয়েছে। অনেকেই জ্বিনকে অদৃশ্য শক্তির অধিকারী মনে করে তাদেরকে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে তাদের উদ্দেশ্যে মানত-সদকা করে। এ ধরনের কার্যকলাপও আপত্তিকর। কারণ জ্বিনকে কল্যাণ-অকল্যাণ, ব্যর্থতা ও সফলতার উৎস মনে করা একটি শির্কী এবং গর্হিত কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন তাওহীদবাদী মুসলিমের পক্ষে কখনো এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করা সমীচীন নয়। অনেকে আবার জ্বিনকে মানব ব্যাধি নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ কোন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারেও জ্বিনের ফকীরদের কাছে পরামর্শ কামনা করেন। আমাদের মুসলিম সমাজে জ্বিনকে নিয়ে নানা রকম আজব তথ্য-কাহিনীর প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া, মুসলিম সমাজে প্রচলিত অসংখ্য শির্কের মূলে সক্রিয় রয়েছে জ্বিন সংক্রান্ত বিশ্বাস। এ জন্য জ্বিনজাতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

জ্বিন জাতি:

'জ্বিন' (একবচন হচ্ছে 'জিন্নি') সম্পর্কে কুরআনে সম্পূর্ণ একটি সূরা 'সূরা আল-জ্বিন (৭২ নং)' অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক জ্বিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। ক্রিয়াপদ 'জান্না', 'ইয়াজুন্ন' হতে উৎপন্ন হওয়া 'জ্বিন' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের ভিত্তিতে তারা দাবী করে, জ্বিন হচ্ছে 'চতুর ভিনদেশী' বা 'ভিন্ন জাতের প্রাণী'। আবার অনেকে এমনও দাবী করে যে, জ্বিন হচ্ছে স্বভাবে অগ্নিময় এমন ধরনের মানুষ যার মস্তিষ্কে অন্তরের উপস্থিতি নেই। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, এ পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানকারী আল্লাহ্‌র অপর এক সৃষ্টি হল জ্বিনজাতি।

www.i-onlinemedia.net

মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনজাতি সৃষ্টি করেন। মানব সৃষ্টির উপাদান হতে ভিন্নতর উপাদানের সমষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনজাতি সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾﴾ (سورة الحجر: ٢٦-٢٧)

'পচা কর্দমের ঠনঠনে গাড়া থেকে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। এর পূর্বে আমি জ্বিনকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।' [সূরা আল-হিজ্র (১৫): ২৬-২৭]

লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে তাদেরকে জ্বিন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সিজদা করার হুকুম দানকালে ফিরিশতাদের মাঝে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইবলীস (শয়তান) জ্বিন জগতের অন্তর্ভুক্ত। সিজদা করতে অস্বীকার করলে তাকে এ অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾﴾

(سورة الزمر: ٧٦)

'সে বলল- আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।' [সূরা স-দ (৩৮): ৭৬]

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

'ফিরিশতাদেরকে নূর (আলো) হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জ্বিনদেরকে করা হয়েছে আগুন হতে।'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ... ﴿٥٠﴾﴾ (سورة الكهف: ٥٠)

'স্মরণ কর, যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর।' তখন ইবলিশ ছাড়া তারা সবাই সাজদাহ করল। সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত...।' [সূরা আল-কাহফ (১৮): ৫০]

এ কারণে ইবলিসকে পদস্খলিত ফিরিশতা বা ফিরিশতা মনে করা ভুল।

---

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৪০, হাদীস নং ৭১৩৪।

www.i-onlinemedia.net

জ্বিনদের অস্তিত্বের ধরন অনুযায়ী সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রাসূল ﷺ বলেন,

'তিন শ্রেণীর জ্বিন রয়েছে- প্রথম প্রকার জ্বিন সারাক্ষণ আকাশে উড়ে বেড়ায়, দ্বিতীয় প্রকার জ্বিনেরা সাপ ও কুকুর হিসেবে অস্তিত্বশীল, তৃতীয় প্রকার জ্বিন পৃথিবী অভিমুখে অগ্রসরমান তথা পৃথিবীতে অবস্থান করে এবং এরা এক জায়গায় বসবাস করা সত্ত্বেও এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে বেড়ায়।[১]

জ্বিনজাতির বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদেরকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে:

১. মুসলিম (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী) এবং

২. কাফির বা মুশরিক (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী)।

আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিম জ্বিনদের সম্পর্কে 'সূরা আল-জ্বিন'-এ বলেন:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤﴾ (سورة الجن: ١-٤)

"বল, 'আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী আর কোন সন্তান। আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত।" [সূরা আল-জ্বিন (৭২):১-৪]

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥﴾

(سورة الجن: ١٤-١٥)

'আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহ্‌র প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে

[১] আত্ব-ত্বাবারী ও আল-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত।

www.i-onlinemedia.net

Contents-1 Contents-2

নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।' [সূরা আল-জ্বিন (৭২):১৪-১৫]

কাফির (অবিশ্বাসী) জ্বিনদেরকে বিভিন্ন নামে আরবীতে ও বাংলাতে উল্লেখ করা হয়: 'ইফরীত, শয়ত্বান, ক্বারীন, দৈত্য, পিশাচ, অপদেবতা, ভূত, পেত্নী, প্রেতাত্মা ইত্যাদি। এরা নানাভাবে মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যে কেউ তাদের প্রতি কর্ণপাত করে, সেই তাদের কর্মী হিসেবে মানবীয় শয়ত্বানরূপে পরিগণিত হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ... ﴿١١٢﴾﴾ (سورة الأنعام: ١١٢)

'এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জ্বিন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি...।' [সূরা আল-জ্বিন (৬):১১২]

প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ক্বারীন (সঙ্গী) নামক একজন জ্বিন রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। এটা এ জীবনে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পরীক্ষার অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যতীত কিছুই না। এ জ্বিনটি তাকে নিচু প্রকৃতির কামনা-বাসনার প্রতি অবিরত উৎসাহিত করে এবং সরল-সত্য পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর প্রচেষ্টায় রত থাকে। এ বিষয়টিকে রাসূল ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'জ্বিনদের মধ্যে হতে একজন করে সাথী তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।' সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, 'এমনকি আপনার সাথেও, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ?' রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ, আমার সাথেও, কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন এবং সে আনুগত্য স্বীকার করেছে, তাই সে আমাকে শুধু সৎকাজ করতে বলে।'[১]

নাবী সুলায়মান (عليه السلام)-কে নবূয়তের নিদর্শনস্বরূপ জ্বিনদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ (سورة النمل: ١٧)

'সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল, জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হল।'
[সূরা আন্-নামাল (২৭): ১৭]

---

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৭২, হাদীস নং ৬৭৫৭।

www.i-onlinemedia.net

কিন্তু অন্য কাউকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। জ্বিনদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি কাউকে প্রদান করা হয় নি। তাছাড়া কেউ তা পারেও না। রাসূল ﷺ বলেন, 'আমার সলাত ভাঙ্গার জন্য গতরাতে জ্বিনদের মধ্য হতে এক 'ইফরীত[১] থু থু নিক্ষেপ করেছিল। তবে তার উপরে বিজয়ী হতে আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন। সকালে তোমাদের সবাইকে দেখানোর জন্য আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধতে চেয়েছিলাম। তারপর আমার ভাই সুলায়মানের দু'আ মনে পড়ল-

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾﴾ (سورة ص: ٣٥)

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন রাজ্য দান কর যা আমার পরে অন্য কারো জন্য শোভনীয় হবে না। তুমি হলে পরম দাতা...।'

[সূরা স-দ (৩৮): ৩৫][২]

মানুষ জ্বিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। কেননা, এ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা কেবল নাবী সুলায়মান (আ:)-কে প্রদান করা হয়েছিল। বাস্তবে, এমতাবস্থায় 'আছর বা আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত অধিকাংশ সময় জ্বিনদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধারণত ধর্মদ্রোহী (কুফরী বা শির্কী) ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে করা হয়।[৩] এভাবে উপপস্থিত করা জ্বিনেরা তাদের সাথীদেরকে পাপকাজে লিপ্ত হতে ও স্রষ্টায় অবিশ্বাস করতে সাহায্য করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের বা আল্লাহ্র সাথে শরীক করার মতো বৃহত্তম পাপকর্মে লিপ্ত করতে যত বেশি মানুষকে পারা যায় আকৃষ্ট করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

জ্বিনদের সাথে গণকদের একবার যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জ্বিন তার অনুসারী গণকদেরকে জানাতে পারে। ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনার সংবাদ জ্বিনেরা কিভাবে সংগ্রহ করে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেন, জ্বিনেরা প্রথম আসমানের নিম্নাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনাবলী সম্পর্কে ফিরিশতারা

---

[১] খুব শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান শয়তান জ্বিন (E.W. Lane, *Arabic-English Lexicon,* (Cambridge, England: Islamic Texts Society, 1984), Vol. 2, p. 2089)

[২] *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৮, হাদীস নং ৭৫; *মুসলিম,* খণ্ড ১, পৃ. ২৭৩, হাদীস নং ১১০৪।

[৩] আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স, জ্বিন *সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার রচনা,* (রিয়াদ: তাওহীদ পাবলিকেশন, ১৯৮৯), পৃ. ২১।

www.i-onlinemedia.net

পরস্পর যে আলোচনা করে তা শুনতে সক্ষম। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে শ্রবণকৃত সংবাদগুলো তাদের সেই চুক্তিকৃত বন্ধুদের নিকটে পরিবেশন করে।[১] মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবূওত প্রাপ্তির পূর্বে এ ধরনের অনেক ঘটনা সংঘটিত হতো এবং গণকরাও তথ্য প্রকাশে অনেকাংশে নির্ভুল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পাশাপাশি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে তাদের পূজা-অর্চনাও করা হতো।

রাসূল ﷺ-এর উপরে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আসমানের নীচের অংশে পাহারা দেবার জন্য ফিরিশতাদেরকে নিযুক্ত করা হল এবং বেশিরভাগ জ্বিনকে উল্কা ও ধাবমান নক্ষত্র দিয়ে তাড়ানো হতো। এক জ্বিন কর্তৃক বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۝٩﴾ (سورة الجن: ٨-٩)

'আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ। আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে।' [সূরা আল-জ্বিন (৭২): ৮-৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝١٧ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ۝١٨﴾ (سُوْرَةُ الحجر: ١٧-١٨)

'আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ চুরি করে (খবর) শুনতে চাইলে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবণ করে।'

[সূরা আল-হিজ্‌র (১৫): ১৭-১৮]

কুরআনের অন্য একটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে:

[১] *বুখারী*, খণ্ড ৪, পৃ. ১২১০; *মুসলিম*, হাদীস নং ৫৫৩৮।

www.i-onlinemedia.net

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ... ۝﴾ (سورة الملك: ٥)

'আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি আর শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, এবং প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি...।' [সূরা আল-মুল্ক (৬৭): ৫]

রাসূল ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন যে, পৃথিবীতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনারত ফিরিশতাদের কথাবার্তা মাঝেমাঝে জ্বিনেরা নিচের আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করে আড়ি পেতে শ্রবণ করে পৃথিবীতে ফিরে এসে জ্যোতিষীদের অবগত করত। তিনি ﷺ আরও বলেন, অধিকাংশ সময় আড়িপাতা বন্ধে বেশিরভাগ জ্বিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কক্ষচ্যুত নক্ষত্র (উল্কাপিণ্ড) ব্যবহার করেন।

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ﷺ এবং তাঁর একদল সাহাবী উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে আসমান থেকে ইলাহী সংবাদ শ্রবণে শয়তানরা বাধাগ্রস্ত হল।[১] তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হল। তাই তারা ফিরে এল তাদের লোকজনের নিকটে। তাদের লোকেরা ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বলল। কেউ কেউ বলল, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে; ফলে তারা কারণ উদ্ঘাটনে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কয়েকজন রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদেরকে সলাতরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কুরআন পড়া শ্রবণ করল। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, নিশ্চয়ই এটাই তাদেরকে আসমানী সংবাদ শ্রবণ থেকে বাধা দান করেছে। যখন তারা তাদের লোকজনের নিকটে ফিরে গিয়ে বলল,

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً ۝٢﴾ (سورة الجن: ١-٢)

'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না।' [সূরা আল-জ্বিন (৭২):১-২][২]

---

[১] দেখুন, সহীহ বুখারী, (আরবী), ২য় খণ্ড, পৃ. নং ৭৩২।

[২] *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ৬, পৃ. ৪১৫-৪১৬, হাদীস নং ৪৪৩; *মুসলিম*, খণ্ড ১, পৃ. ২৪৩-২৪৪, হাদীস নং ৯০৮; *তিরমিযী* ও *আহমাদ*।

www.i-onlinemedia.net

রাসূল ﷺ কর্তৃক ইসলাম প্রচারের পূর্বে জ্বিনেরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে তা আর পারেনি। এ কারণে, তারা তাদের সংবাদের সংগে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে।

মূলত, এ দিন বা এ সময় থেকে শয়ত্বানদেরকে ইলাহী খবরাখবর শোনায় বাধা প্রদান এবং তাদের ওপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা শুরু হয়নি। বরং তা এর আগে থেকেই শুরু করা হচ্ছিল। হয়তো শয়ত্বানরা এর কারণ এ ঘটনার মাধ্যমে এ সময়ে জানতে পেরেছে মাত্র। কারণ, এ সম্পর্কিত যেসব শব্দ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা অতীত নির্দেশক। জ্বিনদের প্রকৃত ব্যাপার ছিল, জ্বিনেরা গোপনে চুরি করে ফেরেশ্‌তাদের পরস্পরের কথোপকথন শুনে ঐ গণক বা জ্যোতিষির নিকট বলে। শ্রবণ চুরি তিনটি অবস্থা রয়েছে-

১. নবুওয়তের পূর্বে এবং তা ব্যাপকভাবে ছিল,
২. নবুওয়াতের পরে জ্বিনদের পক্ষে শ্রবণ চুরি সম্ভব হয়নি যদিও কিছু হয়েছে তবে তা আল্লাহ্‌র কিতাব বা কুরআনের ওহী ব্যতিরেকে।
৩. নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর শ্রবণ চুরির ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তা খুবই সীমিত আকারে, কেননা আসমানে পাহারার কঠোর ব্যবস্থা ও অগ্নি নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রাসূল ﷺ বলেন, 'গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী কিছু সত্যের সঙ্গে শত শত মিথ্যার সংমিশ্রণ বৈ কিছুই নয়।'[১]

রাসূল ﷺ আরো বলেন, 'জ্বিনেরা সংবাদ পাঠাতেই থাকবে যতক্ষণ না এটা যাদুকর বা গণক পর্যন্ত পৌঁছায়। মাঝে মাঝে সংবাদ পাঠানোর পূর্বেই একটা উল্কাপিণ্ড তাদেরকে আঘাত করবে। আর উল্কাপিণ্ড দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই যদি সংবাদটি পাঠাতে সক্ষম হয়, তাহলে এর সঙ্গে একশ'টা মিথ্যা যোগ করে পাঠাবে।'[২]

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এরা কিছুই না। তারপর গণকদের কথা মাঝে মাঝে সত্য হওয়ার ব্যাপারে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উল্লেখ করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'এটা সত্য সংবাদের একটি অংশবিশেষ যা জ্বিনেরা চুরি করে এবং এ তথ্যের সঙ্গে একশ'টি মিথ্যা যুক্ত করে তার বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে।'[৩]

'উমার ইবনে আল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন বসেছিলেন, এমন সময় এক সুদর্শন লোক[৪] তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমার যদি ভুল না হয়,

---

[১] *বুখারী*, ৭ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃ., হাদীস নং ৬৫৭ এবং *মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড, ১২০৯ পৃ., হাদীস নং ৫৫৩৫।
[২] *বুখারী*, খণ্ড ৮, পৃ. ১৫০, হাদীস নং ২৩২ এবং *তিরমিযী*।
[৩] *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ৭, পৃ. ৪৩৯, হাদীস নং ৬৫৭; *মুসলিম*, খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীস ৫৫৩৫।
[৪] তার নাম হল, সাওয়াদ ইবনে ক্বারিব।

www.i-onlinemedia.net

লোকটি এখনও প্রাক-ইসলামী বিশ্বাসের অনুসরণকারী অথবা সম্ভবত সে তাদের মধ্যে যেসব গণক রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকটিকে তাঁর নিকটে আনার জন্য আদেশ করলেন এবং তিনি তাঁর অনুমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটা উত্তর দিল, একজন মুসলিমকে আজ এমন এক অভিযোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যা আমি আর কখনও দেখিনি। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, নিশ্চয়ই আমাকে এ ব্যাপারে জানানো তোমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তারপর লোকটি বলল, জাহেলি যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ-গণনাকারী ছিলাম। এ কথা শুনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সবচেয়ে বিস্ময়কর যে বিষয়টি তোমার পরী (নারী জ্বিন) তোমাকে বলেছে তা আমাকে বল। লোকটি তখন বলল, "আমি একদিন বাজারে থাকাবস্থায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে আমার নিকটে আগমন করে বলল, 'অপমান হওয়ার পর হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তুমি কি জ্বিনদের দেখতে পাওনি? এবং তাদেরকে (জ্বিনদেরকে) এমন অবস্থায় দেখতে পাওনি যে, তারা মাদী উট ও এদের পিঠে আরোহণকারীদের অনুসরণ করছে?"[১] উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মন্তব্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্য'।[২]

জ্বিনেরা মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল ব্যবধানের দূরত্ব অতিক্রম করা, গোপনীয় বিষয় বা ঘটনা, হারানো দ্রব্য, অদৃষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে পারে। এ ক্ষমতার সত্যতা আমরা নাবী সুলায়মান (আ:) এবং সাবার রাণী বিলকিস সম্পর্কে কুরআনের বিবরণে দেখতে পাই। সুলায়মান (আ:)-কে রাণী বিলকিস দেখতে আসলে, রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে তিনি [সুলায়মান (আ:)] উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে নির্দেশ প্রদান করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত মানুষ, জ্বিনসহ অন্যান্যদের মধ্যে থেকে-

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾﴾ (سورة النمل: ٣٩)

"এক শক্তিধর জ্বিন বলল– 'আপনি আপনার জায়গা থেকে উঠবার আগেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেব, এ কাজে আমি অবশ্যই ক্ষমতার অধিকারী ও আস্থাভাজন।" [সূরা আন্-নামাল (২৭): ৩৯]

আমরা জানি যে, সাপ ও কুকুরের রূপে থাকা জ্বিন ব্যতীত অন্য সকল জ্বিন আদতে অদৃশ্য। তবে, জ্বিনের জগতে এমন কতিপয় জ্বিন রয়েছে যারা তাদের

[১] ফিরিশতাদের উপর আড়িপাতা থেকে জ্বীনদেরকে বাধা প্রদান করা হলে, এ বাধা দানের কারণ উদ্ঘাটনে তারা আরববাসীদেরকে অনুসরণ করা শুরু করেছিল।

[২] *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ৫, পৃ. ১৩১-১৩২, হাদীস নং ২০৬।

www.i-onlinemedia.net

ইচ্ছামতো মানুষসহ বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নাবী (সাঃ) আমাকে রমাযানের যাকাত হিফাযাত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত করব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র।' তিনি [আবূ হুরায়রা] বলেন, আমি ছেড়ে দিলাম, যখন সকাল হল, তখন নাবী (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?' আমি বললাম, 'হে রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া উদ্রেক হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি বললেন, 'সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।' *'সে আবার আসবে'* আল্লাহ্‌র রাসূলের এ উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! সে তার তীব্র প্রয়োজন ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'খবরদার, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।' তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, 'আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে এবার অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হল তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিব। যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, 'যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (সূরা আল-বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।' কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল

www.i-onlinemedia.net

Contents-1 Contents-2

কুরসী প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল যে, এতে আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত করবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না।' সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নাবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে? আবূ হুরায়রা বললেন, না। তিনি ﷺ বললেন, সে ছিল শয়তান।[১]

জ্বিনেরা মানুষের শরীরে অশরীরী হিসেবে অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। অন্যান্য প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন মানুষের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তেমনিভাবে তিনি জ্বিনকেও এ অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন। তবুও, সকল সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।[২]

---

[১] *বুখারী*, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৯-৩২০ পৃ., হাদীস নং ৪৯৫।

[২] জ্বিনজাতি, শয়তান ও এদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে কিছু বিশুদ্ধ গ্রন্থের নাম দেওয়া হল: *The Jinn and Human Sickness* by *Dr. Abu'l-Mundhir Khaleel ibn Ibraaheem Ameen; The World of the Jinn and Devils* by *Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar; Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn & The Fundamentals of Tawheed* by *Dr. Abu Ameenah Bilal Philips* ও ড. আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স কর্তৃক রচিত *তাওহীদের মূল নীতিমালা* (অনু: ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান; ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।

www.i-onlinemedia.net

ভূতের ভয় লোকে কয়
এক হিসেবে কিছুই নয়!

আমাদের সম্ভবত সকলেরই ভূত নামক চরিত্রটির সঙ্গে পরিচয় হয় ছেলেবেলাতেই। মা ভূতের ভয় দেখিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ান বা খাবার খাওয়ান তারপর বড় হতে হতে শিশুর অনেক রকম ভূতের কাহিনী পড়া হয়ে যায়। এভাবে ভূতের একটা ভয়ার্ত চেহারা ছোট থেকে আঁকা হয়ে যায় শিশুমনে। আসলে কী কিছু আছে ভূত বলে! নেই তো বটেই। আবার কিন্তু আছেও। উত্তরটা একটু জটিল হয়ে গেল তো! আগেই তো বলা হল নেই। তবে আছেও ভূত। তাও আবার দু'রকমের। এ ভূতদ্বয় হল- মনের ভূত ও ভূত নামক শয়তান-জ্বিন । গল্প-কাহিনী শুনে মনের মধ্যে কাল্পনিক ভূতের যে ছবি আঁকা হয়ে যায় সেটাই হল মনের ভূত। অর্থাৎ এক ভূত থাকে মনে আর এক ভূত হয় শয়তান জ্বিন। এ দুই ভূতেরই নাগাল আমরা পেয়ে থাকি অনেকেই, অনেক সময়ই। তবে এ ভূত ক্ষতিকর নয় তেমন। সাময়িক ভয় দেখানোর জন্য বা ঠাট্টাচ্ছলে এ ভূতদ্বয়ের উপস্থিতি ঘটে। এ দুই ভূত যে একেবারে ক্ষতিমুক্ত তাও তো বলা যায় না। ছেলেবেলায় ভূত ভূত শুনতে শুনতে এক ভয়ঙ্কর রূপ গেঁথে যায় মনে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিশুদ্ধ আক্বীদা তথা তাওহীদের প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা সেটা সরানোর ব্যবস্থা পরে না করা হলে ভূতের রূপটা মনে হয়ত অনেক সময়ই স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।

এবার আমাদের আলোচিত ভূতের কথায় আসা যাক। আমরা অনেকের অস্বাভাবিক আচার-আচরণ দেখে বলি, ভূত ভর করেছে। অথবা বলি, ভূতে পেয়েছে। এটা আসলে এক ধরনের রোগ। মানসিক রোগ। তিন ধরনের রোগ হলে রোগীর আচার-ব্যবহারে অস্বাভাবিকতার প্রকাশ ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ রোগ তিনটিকে বলা হয়- হিস্টিরিয়া, সিজোফ্রেনিয়া ও ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ। এ রোগগুলোতে শারীরিক কোন ক্ষতি হয় না। শরীরে কোন ত্রুটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কষ্টটা হয় মনে। সবটাই মনের তৈরি। মনের মধ্যে তৈরি। মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রোগী উন্মত্ত হয়ে হয়ে পড়ে। হয়ে পড়ে বিকারগ্রস্ত, স্মৃতি ও চিত্তভ্রংশ।

ছোটবেলার অতীত স্মৃতি, যা অবসরে মনে করা হয়েছে, হয়ত বেশ পরে সেটাই হিস্টিরিয়া রোগের জন্ম দেয়। এ সকল ঘটনা শৈশবে খুব দুঃখ, যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য, ভয় বা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তবে সেটা মনে চাপা পড়েছিল। এমন ঘটনাই পরবর্তীতে হিস্টিরিয়া রোগের রূপ নিতে পারে। হিস্টিরিয়া রোগী যে সকল অস্বাভাবিক কাজকর্ম করে তা করে ইচ্ছাকৃতভাবে। কিন্তু ইচ্ছার ব্যাপারে রোগী কিন্তু সচেতন নয়। সচেতন মনে হিপনোটাইজ করে চাকরের মতো রোগ সচেতনভাবে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ করিয়ে নেয়। হিস্টিরিয়া রোগের উৎস জানতে হলে রোগীর অতীত জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। জেনে নিতে হবে, সে কখন কিভাবে কেন ভয়-ভীতি, দাবি-

www.i-onlinemedia.net

দাওয়া, অভাব-অভিযোগ বা টানাপোড়েনে (মানসিক ও পার্থিব) পতিত হয়েছিল। এটা বের করতে পারলেই তবে হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা তথা ভূতের ভয় দূর করা সহজ হয়ে যায়। হিস্টিরিয়া, সিজোফ্রেনিয়া ও ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ রোগীর একটা সুবিধাজনক দিক হল, সে সকলের শাসন ও নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে যেতে পারে। পরিবর্তে সে সহজে অভিভাবকের মনোযোগ, সহানুভূতি, ভালবাসা বা গুরুত্ব আদায় করতে পারে। এ কারণেই হয়ত স্বেচ্ছাচারের এক বিকৃত প্রকাশ ঘটে তার রোগের আলামতের মধ্য দিয়ে। আমাদের কথিত রোগ তিনটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পরিবারে। উচ্চশিক্ষিত বা আধুনিক পরিবারে এ রোগ দেখা যায় খুব কম। মূলত যে পরিবার ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন; সেখানেই এ রোগ হয় বেশি। আর এর মধ্যে মেয়ে রোগীর সংখ্যাই হয় বেশি। সংসার মেনে বিভিন্ন চাপ, অধীনতা ও জবরদস্তি সইতে হয় সমাজের অসহায় মেয়েদের। সেজন্য মানসিক চাপ ও টানাপোড়েনে স্বাভাবিক মানসিকতা বিকল হয়ে অনেকেই বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগীতে পরিণত হয়।

এ ধরনের ভূতের ভয় বা ভূতে পাওয়া একটা স্রেফ মানসিক ব্যাধি। মানসিক বৈকল্যই আসলে ভূতে ধরা বা জ্বিনে পাওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ব্যাধি হল হিস্টিরিয়া বা স্কিটসোফ্রেনিয়া ও ম্যানিয়াক ডিপ্রেসান। এ রোগগুলোর ফলে মানুষের মস্তিষ্ককোষে নানা গোলমাল দেখা দেয়। কোষগুলো ঠিকমতো কাজ করে না। ফলে মানুষ মানসিক ভারসাম্যবস্থা হারিয়ে ফেলে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আর এ রোগগুলো সাধারণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায়। অমানুষিক মারধর ক'রে, ভয় দেখিয়ে, গরম তেলে ছ্যাঁকা দিয়ে বা তাবিজ-কবচ পরিয়ে এ রোগ সারানো যায় না। বিশ্বাসের জোরে দু'একটি ক্ষেত্রে কদাচিৎ এগুলোতে কাজ হলেও তা নিছক দুর্ঘটনা। নির্যাতন ক'রে বা ভয় দেখিয়ে কোনক্রমে রোগ সারানো গেলেও পরে তা অন্যরূপে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি। সেটা হতে পারে আরও বিপজ্জনক। মানসিক রোগ মানসিক চিকিৎসকের চিকিৎসাতেই সারাবার ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.i-onlinemedia.net

মানুষের ওপর জ্বিন-ভূতের আছর হয় কুসংস্কার ও শির্‌কের সাথে বাসর

জ্বিন-ভূতের আছর এবং এর চিকিৎসা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা মহা কুসংস্কার। এর পিছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জ্বিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন তার 'ইবাদত করার জন্য। দু'টোই জীব কিন্তু একটি শরীরী এবং অন্যটি অশরীরী। মানুষ শরীরী এবং জ্বিন অশরীরী। মানুষ দৃশ্যমান আর জ্বিন অদৃশ্যমান। কুরআনের মাধ্যমে এবং আমাদের রাসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে মুসলিমরা জ্বিনকে জেনেছে এবং বিশ্বাস করেছে। জ্বিনজাতি আমাদের কাছে অদৃশ্য (যেমন ফেরেশতারাও অদৃশ্য)। রোগজীবাণু আমরা খালি চোখে দেখি না কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাকালে তার অস্তিত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু জ্বিন কোন যন্ত্রের দ্বারা দৃশ্যমান হয় না। নাবী সুলায়মান (আ:) জ্বিনদের ওপরও রাজত্ব করেছেন। তাদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন, অনেক অসাধ্যকে সাধন করেছেন। আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে এ সব বিষয়াদি জানতে পারি।[১] কুরআনে জ্বিনজাতির কথা রয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) জ্বিনদের ওপর রাজত্ব কায়েম করেছেন বা তাদের দিয়ে কিছু করিয়েছেন এমন কোন ঘটনা বা কাহিনী নেই। জীনদের সাথে রাসূল (ﷺ)-এর কথা হয়েছে, জ্বিনেরা এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে- এ সব সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে। শয়ত্বান-জ্বিন মানুষের দুশমন, তারা মানুষের ক্ষতি করে থাকে। তবে জ্বিনদের সাথে মানুষের দুনিয়ার কোন কিছু নিয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। অতএব দুনিয়ার কোন বিষয় নিয়ে জ্বিন মানুষের শত্রু নয়। জ্বিন সংক্রান্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের বর্ণনার পাশাপাশি জাল ও যঈফ হাদীসের বর্ণনার প্রভাবে এবং শয়ত্বানের ধোঁকায় অশরীরী জ্বিন নিয়ে মানুষ যে কত জল্পনা ও কল্পনার জাল বুনেছে তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের কল্পনা শক্তি খুবই আশ্চর্যজনক, এর দ্বারা মানুষ বস্তু ও বাস্তবের দিকেও এগুতে পারে আবার অসম্ভবের দিকেও যেতে পারে। মানুষ জ্বিনকে তার কল্পনায় ধরতে চাইল। তার মনে হল জ্বিন খুব বিশাল আকারের হতে পারে, তার শক্তি মানুষের তুলনায় সর্বদিক দিয়ে বেশি, সে কোন মানুষকে এমনিতেই তুলে নিয়ে যেতে পারে, মানুষকে যেকোন সময় আঘাত করে আহত বা নিহত করতে পারে। এ জাতীয় নানা চিন্তা-ভাবনা মানুষ করতে লাগল। জ্বিন সম্পর্কিত ধারণা থেকেই মানুষ কল্পনায় আরো কিছু প্রাণীর আবিষ্কার করে ফেলল। যেমন- পরী, ভূত-পেত্নী, দেও-দৈত্য, দানব, অসূর ইত্যাদি। এ কল্পনাপ্রবণ মানুষগুলো হল বেশিরভাগ কবি-সাহিত্যিক। প্রথম দিকে কাব্য সাহিত্য ও গদ্য সাহিত্য রচনা করতেন যারা, তারা

---

[১] জীনজাতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে পূর্বের অধ্যায়ে।

www.i-onlinemedia.net

অবাস্তব বিষয় নিয়েই বেশি লিখতেন বা ভাবতেন। কাজেই তাদের রচনায় ঠাঁই পেত দেও, দৈত্য, দানব, পরী, জ্বিন, ভূত, পেত্নী প্রভৃতি অদৃশ্য ও অশরীরী প্রাণী। এদের নিয়ে লেখা বিষয়গুলো সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতো। মানুষ এ সব শুনত তন্ময় হয়ে। গল্প শুনে শুনে মানুষ রোমাঞ্চিত হতো, পুলকিত হতো, ভয় পেত এবং চিন্তা-ভাবনায় পড়ে যেত। এমনটা আজও হয়। বংশ পরম্পরায় এ সব চলে আসছে। মানুষ এদের বিশ্বাস করল এবং কল্পনায় এদের ছবি আঁকলো। সাহিত্যে বর্ণিত ও লোকের মাঝে প্রচলিত ধারণাকে ধার করে নিল আরেকটি গোষ্ঠী। এরা হল শিল্পী, আঁকিয়ে বা চিত্রাংকণকারী। তারা যেভাবে ভূত, পরী, দৈত্য প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হল সেসব নিয়ে ছবি আঁকতে লাগল। এদের সম্পর্কিত কবি-সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে ও শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখে ছোট ছোট শিশুরা বেশি প্রভাবিত হল। সেই সাথে তারা পরিবারের প্রাচীন বা বয়স্ক সদস্যদের কাছ থেকে জ্বিন-পরী, দেও, দৈত্য, দানব, ভূত, পেত্নীদের নিয়ে নানা লোক-কাহিনী শুনতে লাগল। এদেরকে তারা বিশ্বাস করতে লাগল এবং ভয় পেতে থাকল। সেই বিশ্বাস ও ভয় বয়সকালেও তাদের মধ্যে থেকে যায়। কুরআন ও সহীহ হাদীসের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে আমাদের মুসলিম সমাজের মানুষেরা আজও তাদের বিশ্বাসকে শানিত করার পাশাপাশি তাদের সন্তান-সন্ততিকে জন্মলগ্ন থেকেই তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করতে সহায়তা করেনি। তাদের মাঝে বিশুদ্ধ বিশ্বাস সমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। আর এটা দেখা গেছে যে, শিশু-কিশোরদের মনে অবাস্তব অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনী খুবই প্রভাব বিস্তার করে। ভূতুড়ে গল্প, দৈত্য-দানবের কাহিনী, পরীর কেচ্ছা-কাহিনী শুনতে তারা খুবই ভালবাসে। সেই আদিকাল থেকেই শিশু-কিশোরদের মাঝে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অবাস্তব গাল-গল্পের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি। সেসব তারা খুব আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে শোনে এবং পড়ে। আর এ সব নিয়ে বাজারেও আছে প্রচুর শিশুতোষ বই-পত্র।

জ্বিন-ভূতের আছর

যাহোক, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে কেবল কবি-সাহিত্যিক আর চিত্র শিল্পীরাই পরী ও দেও-দানবের কাহিনী লুফে নিয়েছে তা-ই নয়, আরেকটি গোষ্ঠীও এ সব অলৌকিক ধ্যান-ধারণাকে কেড়ে নিয়েছে। তারা হচ্ছে তথাকথিত চিকিৎসক শ্রেণী। তারা জটিল ও দুর্বোধ্য রোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য জ্বিন-পরী, দেও, দৈত্য, দানব, ভূত, পেত্নী প্রভৃতির আশ্রয় নিল। এরা দেখল যে, জ্বিন-ভূত-পরী প্রভৃতি অশরীরী জীবগুলোকে মানুষ ভিন্নভাবে বিশ্বাস করে। মানুষের এ ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসকে তারা কাজে লাগাতে উঠে-পড়ে লাগল। মানসিক রোগের কোন ধারণা প্রথম দিকের চিকিৎসকদের ছিল না। মানসিক রোগের কারণ হিসেবে তারা জ্বিন-ভূতকে দায়ী করল। তাছাড়া, বাচ্চাদের নানা রোগ বিষয়েরও কারণ হিসেবে তারা দুষ্ট জ্বিন-ভূতের আছর বলতে লাগল। অশরীরী আত্মাগুলোর বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত করল পাহাড়,

www.i-onlinemedia.net

বন-বাদাড় প্রভৃতিকে। আর তারা যখন লোকালয়ে থাকে তখন নাকি তারা পুকুর পাড়ের বড় তালগাছ, তেঁতুলগাছ, রাস্তার ধারের বটগাছ, বেতবন, গাবগাছ, বাঁশঝাড়, কবরস্থান প্রভৃতিতে আশ্রয় নেয়। এদের চলাফেরার সময় হল ভোরবেলা, সন্ধ্যাবেলা, গভীর রাত্রি এবং ভর দুপুর। কবিরাজগণ প্রচার করল বাচ্চা এবং মহিলারা বিশেষকরে কিশোরী মেয়েরাই জ্বিন-ভূতের শিকার হয় বেশিরভাগ সময়ে। তারা কারণ হিসেবে দেখাল অসময়ে খারাপ জায়গায় চরাফেরা করা, জ্বিন-ভূত ইত্যাদির সামনে পড়া, সুন্দর বা সুন্দরী হওয়া, বেপর্দা চলাফেরা করা ইত্যাদি। কবিরাজরা প্রচার করল যে, জ্বিনেরা চেগ দিয়ে অর্থাৎ পা ফাঁক করে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত-পা-ঘাড় মটকে দেয়, পাগলা করে ফেলে, মানুষকে আঁচর দিয়ে আহত বা নিহত করে, গায়ে গরম বাতাস লাগিয়ে দেয়, বিকট চেহারা ধরে ভয় লাগায়, অদ্ভুত রকমের শব্দ করে, বাড়িতে ঢিল মারে, কাউকে ধরে নিয়ে যায়, বেহুঁশ করে ফেলে রেখে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিরাজদের মতে, জ্বিন-ভূত মানুষের চেহারা ধরে, বিড়াল হয়, বুড়ীর বেশ ধরে, কিশোরী সাজে, বেশিরভাগ সময়ে সাদা কাপড়ে এসে হাজির হয়। তাদেরকে এই দেখা যায় আবার দেখা যায় না।

মানুষ বাগানে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে ভয় পায়, বাতাসের শো শো শব্দে ভয় পায়, ঘূর্ণিবায়ুর চক্করে পড়ে ভয় পায়, কালো বা সাদা বিড়াল দেখে ভয় পায়, পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ গায়ে বাতাস লাগলে বা গরম হাওয়া লাগলে তাতে ভয় পায়, রাত্রে কোন বন্য প্রাণীর আওয়াজ শুনে ভয় পায়, সরিসৃপ জাতীয় কোন প্রাণীর সুড়ৎ করে সরে যাওয়ার আওয়াজ শুনে ভয় পায়, রাত্রি বেলায় কোন সাদা পোশাক পরিহিত মানব বা মানবী দেখে ভয় পায় প্রভৃতি নানা কারণে মানুষ ভয় পায়। অশরীরী আত্মাগুলোর ব্যাপারে মানুষের মনে যে বিশ্বাস, সেগুলো এ সব ক্ষেত্রে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সে মনে করে ওসব প্রাণীরা তার ওপর সওয়ার হয়েছে। এ রকম নানা ভয়জনিত কারণে এবং দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন জটিলতার কারণে মানুষ নানা দুর্বোধ্য রোগের শিকার হয়। এ সব রোগের শিকার তারাই বেশি হয়, যারা দুর্বল চিত্ত ঈমানের অধিকারী ও যাদের মধ্যে কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্ভর চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে।

জ্বিন-ভূত বিতাড়নের নানা পদ্ধতি

কবিরাজরা এ সব রোগের নানা চিকিৎসা পদ্ধতি বের করেছে। যেমন পানি পড়া, তাগা বা রশি পড়া, পান পড়া, চিনি পড়া, বাড়ি-ঘর বন্ধ করা, জ্বিন-ভূতকে বোতলবন্দী করা, জ্বিন-ভূত চালান দেওয়া, তাবিজ-কবজ দেওয়া, দু'আ-দরূদ, যাদুমন্ত্র ইত্যাদি পড়ে রোগীর গায়ে ও পানিতে ফুঁ দেওয়া ইত্যাদি।

জ্বিন-ভূত সংক্রান্ত রোগ দেখা দিলে কবিরাজরা সেগুলোকে আলগা পাওয়া বা বাতাস লাগা বলে থাকে। আবার সোজা করেও বলে দেন ভূতে ধরেছে, জ্বিনে পেয়েছে, জ্বিন–ভূতের আছর হয়েছে।

www.i-onlinemedia.net

মেয়েদের জ্বিন-ভূতে ধরা রোগের চিকিৎসা হল এক ধরনের নারী নির্যাতন। কোন মেয়ে যখন কোন কারণে অস্বাভাবিক আচরণ করে তখন বলা হয় তাকে ভূতে ধরেছে। শুরু হয়ে যায় তাবিজ-কবজের পালা আর শির্ক-কুফরযুক্ত ঝাড়-ফুঁক। কবিরাজ দিয়ে ভূত বা জ্বিন চালান দেওয়া হয়। এ ভূত চালান বড়ই জঘন্য। রোগীকে একটা বদ্ধ ঘরে অন্ধকারে রাখা হয়। তাকে মশারীর ভিতরে নেয়া হয়। মরিচ বা অন্য ঝাঁঝালো কিছু পোড়া দিয়ে ধোঁয়া করে রোগীর নাকে-চোখে লাগানো হয়। কাঁসার থালা-বাটি-বদনা পিটানো হয়, মুখে যাদুমন্ত্র পাঠ করা হয়। আর রোগীর কনিষ্ঠা আঙ্গুলে একটি জাত মরিচ বা গোল মরিচের গোটা রেখে আঙ্গুল বাঁকা করে তার উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়। রোগী চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। কবিরাজ মশাই প্রচণ্ড পিটাতে থাকে। রোগী আরও জোরে কাঁদতে থাকে। ঠিক ঐ সময়ে কবিরাজ তার চেলা-সাগরেদ দিয়ে একটি জঘন্য ঘটনা ঘটান। সেটাও তার পূর্ব পরিকল্পিত। যে ঘরে রোগী রেখে ভূত চালান দেওয়া হয়, সেই ঘরের চালে বা ঘরের পাশের গাছ-গাছড়ায় ঝাঁকানি দিতে থাকে। তখন মানুষ মনে করে জ্বিন-ভূত এসে হাজির হয়েছে। কবিরাজ মশাই অন্যান্যদেরকে বলতে থাকেন, 'আপনারা কেউ কোনদিকে তাকাবেন না, কথা বলবেন না, নড়াচড়া করবেন না। কেউ কথা না শুনলে তার ক্ষতি হবে।' তার এ সমস্ত কথায় উপস্থিত লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রোগী অত্যাচারে নানা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে। লোকজনকে বুঝানো হয় যে, আঘাতগুলো রোগীকে করা হয়নি। রোগীর গায়ে কোন বাড়ি পড়েনি। অথচ পরবর্তীতে যখন রোগীর গায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় তখন তার সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা দেয়। তাকে আঘাত করা হয় নানা আবোল-তাবোল বকার জন্য। রোগীর কথার কোন তাল থাকে না। কবিরাজ মশাই রোগীকে জেরা করতে শুরু করে। অত্যাচারের তীব্রতায় রোগীর কণ্ঠস্বর ও কথা বলার ধরন পাল্টে যায়। কবিরাজ বা মৌলভী সাহেব এ অবস্থাকেই ভূতে বা জ্বিনে কথা বলছে বলে চালিয়ে দেন।[১] রোগীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তুই হিন্দু না মুসলিম? তোর কি নাম? তুই কোথায় থাকিস? তোরা ক'ভাই? একে ধরলি কেন? কবে থেকে এর সাথে আছিস? এ রোগী ছেড়ে যাবি কি-না বল?' ভয় দেখিয়ে রোগীকে কবিরাজ সাহেব এ সব প্রশ্ন করতে থাকে। অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য রোগী কবিরাজকে আপোষমূলক জবাব দিয়ে থাকে। যেমন, সে বলে, 'আমি হিন্দু, আমরা তিন ভাই, ঐ তেঁতুল গাছটায় থাকি। আমি চলে যাব, আর আসব না, আমায় ছেড়ে দিন।' ইত্যাদি নানা কিছু। তথাকথিত জ্বিন-ভূতের আছর করা ব্যক্তি থেকে জ্বিন-ভূত দূর করতে অনুসৃত বিভিন্ন ভ্রান্ত, কুসংস্কার, শির্ক-কুফরযুক্ত পদ্ধতির মধ্যে একটি।

---

[১] তবে, সত্যিকারভাবেই যদি কারও ওপর জ্বিন আছর করে, তাহলে তার কণ্ঠস্বর এমনিতেই পরিবর্তন হতে পারে। এ বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত। *[এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: ইবনু তাইমিয়া কর্তৃক লিখিত এবং ড. আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, সম্পাদিত গ্রন্থ The Jinn (Demons), পৃষ্ঠা ১০৭-৯]*

www.i-onlinemedia.net

তবে, সাধারণত জ্বিন-ভূতে পাওয়া বা আছর করা ব্যক্তির ওপর থেকে জ্বিন-ভূতকে বিতাড়িত করতে সাধারণত তিন ধরনের পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়:

১. প্রথমত, অন্য জ্বিনকে ডেকে এনে উপস্থিত জ্বিনকে বিতাড়িত করা যায়। এ পদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ, জ্বিনকে ডাকতে প্রায়ই অপবিত্র তথা শির্কী-কুফরী ও অবৈধ কর্ম সম্পাদন করতে হয়। মূলত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর বিরোধিতা করেই জ্বিনকে আহ্বান করতে হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমেই এক যাদুকর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত যাদুমন্ত্রকে অন্য যাদুকর ধ্বংস করে থাকে।[১]

২. দ্বিতীয়ত, জ্বীনের সামনে বড় ধরনের শির্কে লিপ্ত হয়ে তাকে বিতাড়ন করা যায়। যাদুকরের কুফরী ও শির্কে সন্তুষ্ট হয়েও জ্বিন অসুস্থ ব্যক্তিকে ত্যাগ করতে পারে। এভাবে জ্বিন চলে যাওয়ার মাধ্যমে যাদুকরের ব্যবহৃত পদ্ধতিকে সে সঠিক বলে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ নিয়মেই খ্রিস্টান যাজকেরা যিশুকে ডেকে এবং ক্রশ ব্যবহার করে ভূত বিতাড়নের কাজ সমাধা করে। আর পৌত্তলিকদের প্রধান পুরোহিত বা ফক্কির বা ওঝাগণও তাদের মিথ্যা দেবতাদের নামে ভূত বিতাড়ন করে।

৩. তৃতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে জ্বিনকে তাড়ানো যায়। এ আসমানী শব্দসমষ্টি এবং বিধানসমূহ জ্বীনে পাওয়া বা ভূতাবিষ্টের চারদিকের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। তারপর, আদেশ বা আঘাতের দ্বারা জ্বিনকে তাড়ানো যায়। যে ব্যক্তি এ কর্ম সম্পাদন করবে তার ব্যক্তিগত ঈমান যদি মজবুত না হয় অথবা সৎকর্মের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভাল সম্পর্ক না থাকে, তাহলে সে জ্বিন বিতাড়নের এ কর্মে সিদ্ধি লাভ করতে ব্যর্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বৈধভাবে জ্বিন-ভূত বিতাড়নের উপায়

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নিম্নোক্ত দু'আসমূহ পাঠ করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করা যায়:

১. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা-খালাক্ব।*[২] তবে যাদু-টোনা ও জ্বিন-শয়তানের আক্রমণ থেকে

---

[১] জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যাদু দ্বারা যাদু মুক্ত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এটি শয়তানের কর্ম।' *(আহমাদ, ৩/২৯৪; আবূ দাউদ, ১০/৩৪৮; আওনুল মা'বূদ, হা/৩৮৫০; হায়সামী বলেন, অত্র হাদীসটি আনাস থেকে ইমাম বাযযার ও তাবরানী স্বীয় আওসাত্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ বুখারী বা মুসলিমের রাবী। দ্রঃ মাযমাউয যাওয়াইদ, ৫/১০৫; হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এই হাদীসটির সনদ হাসান। দ্রঃ ফাতহুল বারী, ১০/২৩৩; গৃহীতঃ আল্লামা ফাহাদ বিন যুইয়ান সুহায়মী, আহকামুর রুক্বা ওয়াত তামাইম, পৃ. ১৫০-১)*

[২] সহীহ মুসলিম, হা/২৭০৮।

www.i-onlinemedia.net

নিরাপদে থাকতে দু'আটি যেকোন সময় বিশেষ করে রাত্রী বেলায় পাঠ করতে হয়।

২. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَمَّاتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّمَّـاتٍ *'আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বা-নিন ওয়া হা-ম্মাতিন, ওয়ামিন কুল্লি 'আয়নিন লা-ম্মাতিন।*[১]

৩. بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُـوَ الـسَّمِيعُ الْعَلِيمُ *'বিসমিল্লাহ-হিল্লাযী লা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামায়ি, ওয়াহুয়াস সামী'উল 'আলীম।*[২] এ ছাড়া ফজর ও মাগরিবের সলাতের পরও তিনবার করে এ দু'আটি পাঠ করা যায়।

৪. أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَـادِرُ سَـقَمًا *'আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাসি ওয়াশফি আন্তাশ শা-ফী, লাশিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।*[৩]

৫. সূরা বাক্বারার ২৮৫ ও ১৮৬ নং আয়াত। তাছাড়া, রাতের প্রথম অংশেও এ আয়াত দু'টি পাঠ করা যায়।[৪]

৬. বরইয়ের সাতটি সবুজ পাতা বেটে পাউডার বানিয়ে তা একটি পাত্রে রেখে তাতে গোসলের সমপরিমাণ পানি ঢেলে তার মধ্যে এ আয়াতগুলো পাঠ করবেঃ আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত), সূরা কাফিরূন, ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস তিন বার করে এবং যাদু সংক্রান্ত আয়াতসমূহ যেমন- সূরা আ'রাফের ১১৭ থেকে ১১৯ নং আয়াত, সূরা ইউনুসের ৭৯ থেবে ৮২ নং আয়াত এবং ত্বহা-এর ৬৫ থেকে ৬৯ নং আয়াত পাঠ করবে। এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর উক্ত বরই পাতার পাউডার মিশানো পানিতে তিনিবার ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করবে এবং বাকী পানি দ্বারা গোসল করবে।[৫]

---

[১] বুখারী, হা/৩১২০।

[২] আহমাদ, হা/৪১৮, ৪৪৪, ৪৯৭; তিরমিযী, হা/৩৩১০, আবূ দাউদ, হা/৪৪২৫; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৫৯; হাদীস সহীহ।

[৩] বুখারী, হা/৫৭৪৩; মুসলিম, হা/২১৯১; আহমাদ, হা/৫৩৩; আবূ দাউদ, হা/৩৩৮৫; তিরমিযী, হা/৩৪৮৮।

[৪] বুখারী, হা/৩৭০৭, ৪৬২৪, ৪৬৫২, ৪৬৬৩; মুসলিম, হা/১৩৪০, ১৩৪১।

[৫] বরই পাতা গুড়া করে তাতে পানি ঢেলে সে পানিতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করার কথা ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ তাবিঈর কিতাবে লিখিত আছে বলে ইবনু বাত্তাল উল্লেখ করেছেন। *দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ১০/২৩২; আযওয়াউল বায়ান, ৪/৪৬৪; মাহমূদ খলীফা আল-জাসেম, যাদু ও বদ-নযর, পৃ. ৫৪।* হাফিয ইবনু কাছীরও অনুরূপ কথা স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। সঊদী 'আরবের সাবেক প্রধান মুফতী

www.i-onlinemedia.net

জ্বিনে পাওয়া বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থ্য করা সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) ও সাহাবী (رضي الله عنهم) থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয় সংশ্লিষ্ট চারটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল:

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (رضي الله عنه)-এর স্ত্রী যায়নাব (رضي الله عنها) বলেন, 'ইবনু মাসঊদ (رضي الله عنه) যখন বাড়িতে আসতেন তখন সাড়া দিয়ে আসতেন। ... একদিন তিনি এসে সাড়া দিলেন। তখন আমার ঘরে একজন বৃদ্ধা আমাকে ঝাড়ফুঁক করছিল। আমি বৃদ্ধাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখি। ইবনু মাসঊদ (رضي الله عنه) আমার ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সূতা দেখতে পান। তিনি বলেন, এ কিসের সূতা? আমি বললাম, এটা ফুঁক দেওয়া সূতা। যায়নাব (رضي الله عنها) বলেন, তখন তিনি সূতাটি ধরে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শির্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: 'ঝাড়ফুঁক, তা'বীজ-কবচ এবং মিল-মহব্বতের তা'বীজ শির্ক।' যায়নাব বলেন, তখন আমি আমার স্বামী ইবনু মাসঊদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহ্‌র কসম, আমার চক্ষু থেকে পানি

আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বাযও অনুরূপ ফাৎওয়া দিয়েছেন। *(মাযমূউল ফাতাওয়া, ৩/২৭৪-৮১)* মিশরের অন্যতম সালাফী বিদ্বান শায়খ হামিদ ফক্বীহ তাঁর প্রতিবাদ করলে তিনি তার জবাব দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে তা বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। ডাক্তারগণ অনুরূপ বহু কিছু বলে থাকেন। যেমন, ওমুক ট্যাবলেট একসাথে দু'টি খেতে হবে, রাতে এই সংখ্যায় খেতে হবে, দিনে এই সংখ্যায় খেতে হবে ইত্যাদি। অতএব এটিকে অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। *(দ্র. হামিদ ফক্বীহ কর্তৃক তাহক্বীক কৃত এবং শায়খ ইবনু বায কর্তৃক সম্পাদিত 'ফাতহুল মাজীদ')* ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ একজন তাবিঈ বিদ্বান এবং তাঁর এই 'আমলটি কুরআন-হাদীস বিরোধী নয় হেতু 'আমলটির বৈধতাকে ঐসমস্ত মুসলিম মনীষীগণ মেনে নিয়েছেন। এরপরও বিষয়টি যেহেতু ইজতিহাদ ভিত্তিক। অতএব কেউ তা মানতে বাধ্য নয়। কুরআনের আয়াত, ঝাড়-ফুঁক সংক্রান্ত নাবীর শিখানো দু'আ প্রভৃতি পড়ে পানিতে দম করার কথা সালাফী সালিহীন থেকে বর্ণিত হওয়ায় সঊদী আরবের মান্যবর সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায ও আল্লামা ইবনু উছায়মীন এটিকে বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন। *(দ্রঃ ফাতাওয়াল ইলাজ বিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ৯-১০ এর বরাতে ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম, পৃ. ১৩৫২-১৩৫৩)* এমনকি যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত দু'আ পানিপাত্র বা কাগজে লিখে তা পানিতে মিশিয়ে সে পানি পান করতে কতিপয় সালাফী সালিহীন যেমন, ইবনু 'আব্বাস, মুজাহিদ, আবূ কিলাবাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত হওয়ায় সঊদী আরবের স্থায়ী কমিটি তা বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন। *(দ্রঃ মাজাল্লাতুল বুহুছিল ইসলামিয়্যাহ, সংখ্যা ২৭, পৃ. ৫১-৫২; ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম, ১৩২৩-২৪)* তবে এগুলো ইজতিহাদী বিষয় মাত্র, যা মানতে কেউই বাধ্য নয়। অবশ্য আমভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীস ভিত্তিক দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক প্রমাণিত। মনে রাখা আবশ্যক যে, যাদু-টোনা চিকিৎসার সর্বোত্তম মাধ্যম হল যদি জানা যায় যে, ওমুক জায়গার যাদুর উপকরণ রাখা হয়েছে বা প্রোথিত হয়েছে, তবে তা বের করে ধ্বংস করে দেওয়া। এতেই সংশ্লিষ্ট যাদু-টোনার আছর ধ্বংস যাবে ইনশাআল্লাহ্‌। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। *(বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৫৩২৪; মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, হা/৪০৫৯)*।

www.i-onlinemedia.net

পড়ত। আমি অমুক ইহূদীর কাছে যেতাম। সে যখন ঝেড়ে দিত, তখন চোখে আরাম বোধ করতাম। তখন ইবনু মাস'ঊদ ﷺ বলেন, 'এটা হল শয়ত্বানের কর্ম। শয়ত্বান নিজ হাতে তোমার চক্ষু খোঁচাতে থাকে।[১] এরপর যখন (কুফরী ও শির্কযুক্ত) ফুঁক দেওয়া হয় তখন সে খোঁচানো বন্ধ করে। তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলতেন তা বলবে। তিনি ﷺ বলতেন:

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءً إِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"আযহিবিল-বা'স রব্বান-নাস ওয়াশফি, আংতাশ-শা'ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফাউক, শিফা আন লা ইউগহাদিরুহু সাক্বামা"

অর্থ: অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থতা দান করুন, আপনিই একমাত্র শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা) ছাড়া আর কোন শিফা নেই, এমন (পরিপূর্ণ) শিফা বা সুস্থতা দান করুন যার পরে আর কোন অসুস্থতা অবশিষ্ট থাকবে না।[২]

ইয়ালা ইবনু মারাহ বলেন, "আমি একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে ভ্রমণে বের হয়ে এক মহিলাকে তার বাচ্চাসহ রাস্তায় বসে থাকতে দেখলাম। মহিলাটি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ, এ শিশুটি অসুস্থ এবং আমাদেরকেও যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছে। আমি জানি না প্রতিদিন কতবার তাকে যাদু দ্বারা আক্রমণ করা হয়!' রাসূল ﷺ বললেন, 'বাচ্চাটি আমার কাছে দাও।' তাই মহিলাটি বাচ্চাটিকে উপরে উঠিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে দিল। তারপর রাসূল ﷺ বাচ্চাটিকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে তাঁর সম্মুখে বসালেন। এরপর বাচ্চার মুখ খুলে তিনবার মুখের ভিতরে ফুঁ[৩] দিয়ে বললেন, 'বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা, তাই চলে যাও, ওহে আল্লাহ্‌র শত্রু!' তারপর বাচ্চাটি মহিলার কাছে ফেরত দিয়ে রাসূল ﷺ বললেন, 'ফিরতি পথে আবার এখানে আমাদের সাথে সাক্ষাত করবে এবং বাচ্চাটির অবস্থা সম্পর্কে জানাবে।'

---

[১] মানুষের অসুস্থতা ও শয়তান-জ্বিনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে, পড়ুন: *The Jinn and Human Sickness* by *Dr. Abu'l-Mundhir Khaleel ibn Ibraaheem Ameen* (Darussalam Publication, Riyad, Saudi Arabia)।

[২] আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* ১/৩৮১; হাকিম, *আল-মুসতাদরাক,* ৪/২৪১। আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত, *সুনান আবী দাউদ,* খণ্ড ৩, পৃ. ১০৮৯, হাদীস নং ৩৮৭৪। ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান। শাইখ আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, *সহীহ সুনান আবী দাউদ,* খণ্ড ২, পৃ. ৭৩৬-৩৭, হাদীস নং ৩২৮৮। এ দু'আটি অবশ্য 'আয়িশা ও আনাস কর্তৃকও বর্ণিত এবং *বুখারী* ও *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত। *বুখারী,* খণ্ড ৭, পৃ. ৪২৭-২৮, হাদীস নং ৫, ৬৩৮-৩৯; *মুসলিম,* খণ্ড ৩, পৃ. ১১৯৫, হাদীস নং ৫৪৩৪।

[৩] এখানে ব্যবহৃত আরবী শব্দ হচ্ছে *'নাফাছা',* যার অর্থ জিহ্বার অগ্রভাগকে দুই ঠোঁটের মাঝখানে রেখে ফুঁক দেওয়া। অতএব, এটা ফুঁক দেওয়া ও হালকাভাবে থু থু ফেলার মাঝামাঝি পর্যায়।

www.i-onlinemedia.net

তারপর আমরা চলে গেলাম এবং ফিরতি পথে আমরা মহিলাকে সেই জায়গাতেই তিনটি ভেড়াসহ দেখতে পেলাম। তাই রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাচ্চা কেমন আছে?' মহিলা উত্তর দিল, 'তাঁর নামে শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি দু'আ করার পর থেকে তার কোন সমস্যা আমরা দেখতে পাইনি, তাই আমি এই ভেড়াগুলো আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।' রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'ঘোড়া থেকে নামো এবং একটি ভেড়া গ্রহণ কর। আর বাকীগুলো তাকে ফেরত দাও।'[১]

উম্মু আবান বিনতু আল-ওয়াযি বর্ণনা করেন, "আমাদের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আমার দাদা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়ার সময় তিনি তার এক ছেলেকেও সাথে নিয়ে যান, যে ছিল পাগল। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর নিকটে পৌঁছে তিনি বললেন, 'আমার একটি পাগল ছেলে রয়েছে, তাই আপনার দু'আ চাইতে আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে এসেছি।' রাসূল ﷺ তাকে নিয়ে আসতে বললেন। ফলে তার ছেলের পরনে যে ভ্রমণের পোশাক ছিল তা পরিবর্তন করে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসে পিছন ফিরে দাঁড় করাও।' তারপর রাসূল ﷺ ওই ছেলেটির পরনের কাপড় শক্ত করে ধরে তার পিছে সজোরে আঘাত করতে শুরু করলেন। তাকে আঘাত করা অবস্থায় রাসূল ﷺ বলছিলেন, 'দূর হয়ে যা, আল্লাহ্‌র শত্রু! দূর হয়ে যা, আল্লাহ্‌র শত্রু!' এরপর ছেলেটি এমনভাবে চারদিকে তাকাতে শুরু করল যেন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। রাসূল ﷺ তাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন এবং কিছু পানি আনতে আদেশ করলেন। তারপর রাসূল ﷺ পানি দিয়ে ছেলেটির মুখ ধুয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। রাসূল ﷺ-এর দু'আর পর উক্ত প্রতিনিধি দলের মধ্যে আর কেউই ওই ছেলের মতো সুস্থ ছিল না।[২]

খারিজাহ ইবনু আছ-ছাল্‌ত বর্ণনা করেন যে, তার চাচা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর সান্নিধ্য ত্যাগ করে যাওয়ার সময় এক বেদুইন গোত্রের সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন বলল, 'আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তোমরা ঐ ব্যক্তিটি (রাসূল মুহাম্মাদ) থেকে কিছু উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছ। জ্বিনেপাওয়া ব্যক্তির জন্য তোমাদের নিকটে কি কোন ওষুধ বা মন্ত্র আছে?' আমরা বললাম, হ্যাঁ। তাই তারা জ্বিনগ্রস্ত এক পাগলকে আনল। তিনদিন ধরে আমি প্রতি

---

[১] *আহমাদ* কর্তৃক সংগৃহীত।

[২] মাতার ইবনু আর-রাহমান থেকে *আহমাদ* এবং আবু দাউদ আত-তাইলাসী কর্তৃক সংগৃহীত, (*উসুদ আল-গাবাহ*)। উসমান আবানকে ইবনু হাজার বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

www.i-onlinemedia.net

সকালে ও সন্ধ্যায় তার উপরে *সূরা আল-ফাতিহা* তিলাওয়াত করলাম। প্রতিবার পড়া শেষে আমি আমার মুখে লালা জমা করে তাকে থু থু মারতাম। অবশেষে সে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল যেন শক্তিশালী কোন বন্ধন থেকে মুক্ত হল। তারপর বেদুইনরা পারিশ্রমিক হিসেবে একটি উপহার নিয়ে এলে আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত আমি এটি গ্রহণ করতে পারব না।' আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'ওটা গ্রহণ করো। আমার জীবনের শপথ, মিথ্যা যাদুমন্ত্রের মাধ্যমে যে ব্যক্তি আয় করবে, সে নিজেই তার গুনাহের জন্য দায়ী। কিন্তু তুমি পারিশ্রমিক অর্জন করেছ সত্য আয়াতের মাধ্যমে।'[১]

জ্বিন-শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

উপরে বর্ণিত দু'আ ও আয়াতসমূহ জ্বিন-শয়তানের অনিষ্ট হতে নিজেকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে কেউ জ্বিন, শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হলে তার জন্যও উপরোক্ত রূহানী চিকিৎসা যথেষ্ট বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে তাদের ক্ষেত্রে যাদু সংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ এবং বরই পাতার ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলো শুধুমাত্র যাদু দ্বারা আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের জন্য উপরোক্ত দু'আগুলো ও যিকরগুলোই যথেষ্ট।[২] তাছাড়া প্রতিদিন সকাল বেলায় সাতটি করে খেজুর বিশেষ করে আজওয়া খেজুর ভক্ষণ করবে। এরূপ করলে বিষ ও যাদু কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[৩] এটি অতি মূল্যবান এক প্রকার খেজুর। দেখতে একেবারেই কালো এবং অন্যান্য খেজুর অপেক্ষা ছোট। এটি সঊদী আরবে পাওয়া যায়। মদীনা মুনাওয়ারায় অবশ্য এই খেজুর বেশি দেখা যায়। এ খেজুরের মূল্য সাধারণ খেজুর অপেক্ষা বেশি। অনেক আলেমে দ্বীন মনে করেন, শুধু আজওয়া খেজুরেই উক্ত প্রতিষেধক রয়েছে, অন্যান্য খেজুরে নেই।

এ ছাড়া কুরআনের আয়াতের নামে তথাকথিত *সুলায়মানী নকশা*, ইহূদীদের থেকে প্রাপ্ত বিদ্যা তথা কুরআনের আয়াতসমূহ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা; যেমন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা ইত্যাদি দিয়ে তা'বীজ-কবচ তৈরি করে ব্যবহার করা শারী'আতের দৃষ্টিতে বড় ধরনের পাপ ও নিকৃষ্ট বিদ'আত।

উল্লেখ্য, যাদু-টোনায় বা জ্বিন-শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ঔষধ-বড়ি মোটেই ফলপ্রসূ হয় না। কাজেই যাদু-টোনা বা জ্বিন-শয়তান থেকে নিরাপদ থাকা বা

---

[১] *সুনান আবি দাউদ*, ৩য় খণ্ড, ১০৯২ পৃ., হাদীস নং ৩৮৮৭।

[২] আল্লামা ফাহাদ বিন যূইয়ান সুহায়মী, আহকামুর রুক্বা ওয়াত তামাইম, পৃ. ১৫০-১৫১; বিস্তারিত দ্র: মাজমূউল ফাতাওয়া ওয়াল মাক্বালাত মুতানাব্বিআহ, ৩/২৭৪-২৮১ এর বরাতে ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম, পৃ. ১৫১২।

[৩] বুখারী, 'খাদ্য' অধ্যায়, হা/৫২৫ এবং 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/ ৫৩২৬-৭, ৫৩৩৪; মুসলিম, 'পানীয়' অধ্যায়, হা/৩৮১৪।

www.i-onlinemedia.net

এগুলো দ্বরা আক্রান্ত হলে তা থেকে আরোগ্য লাভ করার ক্ষেত্রে একমাত্র শারী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁকই বিকল্প চিকিৎসা। তবে সচরাচর দেখা যায়, উভয় প্রকার রোগী আরোগ্য লাভের জন্য এমন কিছু কাজ করে অথবা প্রচলিত কবীরাজদের অনেকেই ঐসব রোগের চিকিৎসা স্বরূপ এমন কিছু কাজ করে থাকে বা রোগী দ্বারা করিয়ে থাকে যা প্রকাশ্য শির্ক। যেমন- তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জ্বিন, ফিরিশতা, নাবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট তারিখে লাল বা কালো মোরগ জ্বিন-ভূতের নামে রোগীকে যবেহ করতে বলে কিংবা ৪/৫ কেজি মিষ্টি গায়রুল্লাহর নামে মানত হিসেবে প্রদান করতে বলে ইত্যাদি। এ সকল কর্মই শির্ক। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস সম্মত চিকিৎসাই এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ সব শির্কী পন্থায় চিকিৎসা ফলপ্রসূ হলেও তা গ্রহণ করা শারী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম। এভাবে চিকিৎসা নেওয়া মানেই নিজেকে কাফির, মুশরিক সাব্যস্ত করা।

শারী'আত সম্মত চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হতে হলে রোগী ও চিকিৎসক উভয়কে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি যেহেতু কুরআন ও সহীহ হাদীস সম্মাত কাজেই তার সুপ্রভাবও সুনিশ্চিত। বিশ্বাস ও আস্থাহীনভাবে শুধু পরীক্ষাস্বরূপ তা ব্যবহার করলে কোনই উপকারে আসবে না। মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ্ পূর্ণ কুরআনকেই 'শিফা' তথা আরোগ্য বলেছেন।[১] এটা হল কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন বাণী। অতএব চাই এর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। কুরআনের পরপরই নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাদীছের স্থান। এটাও এক প্রকার ওহী। সুতরাং সহীহ হাদীছে বর্ণিত ঝাড়-ফুঁকের দু'আসমূহেও পূর্ণ বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা রাখতে হবে। এভাবে আস্থাশীল হয়ে কুরআন ও হাদীন সম্মত উক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে। তবে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এ সব ঝাড়-ফুঁক আরোগ্য লাভের বৈধ উপায়-উপকরণ মাত্র, প্রকৃত আরোগ্য দানকারী হলেন আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা।

[১] [সূরা হামীম সিজদা (৩২): ৪৪; সূরা ইসরা (১৭): ৮২]

www.i-onlinemedia.net

ভাগ্য গণনা-যাদুমন্ত্র ও অলৌকিকত্বের প্রভাব
সবই জ্বিন-শয়তানের স্বভাব

জ্বিনের ক্ষমতা সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ হাদীছে বর্ণিত মৌলিক বিষয়সমূহ স্মরণ রাখলে ভাগ্য গণনাসহ সকল প্রকার অতিপ্রাকৃতিক তথা অলৌকিক ও যাদুসংক্রান্ত ঘটনাগুলো যে ধোঁকা বা ভেলকিবাজি নয় তা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

১. ভাগ্য গণনায় জ্বিন-শয়তানের প্রভাব:

মানুষের মধ্যে যেসব লোক অদৃশ্য ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন- গণক, ভবিষ্যৎ-বক্তা, যাদুকর, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্যক্তি, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ প্রভৃতি। এ সব ভবিষ্যৎ-বক্তারা নানা পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাবলী উপস্থাপন করার দাবী করে থাকে সে সব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছেঃ চায়ের পাতা পড়া, নানা প্রকার রেখা বা নকশা আঁকা, সংখ্যা লেখা, হাতের তালুর রেখা পড়া, রাশিচক্র খুঁটিয়ে দেখা, স্ফটিক বলের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করা, হাড় দিয়ে খটর খটর বা ঝনঝন করানো, লাঠি ছোঁড়া ইত্যাদি। এখানে ভাগ্য গণনার নানাবিধ কলা-কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

অদৃশ্য প্রকাশে ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হওয়ার দাবীদার জ্যোতিষীদেরকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. সে সব জ্যোতিষী প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন সত্য জ্ঞান বা গুপ্ত রহস্য জানা নেই; বরং তারা তাদের খরিদ্দারদেরকে তাই বলে যা সাধারণত অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে থাকে। তারা প্রায় সময়ই অর্থহীন কিছু ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার মাধ্যমে পূর্বপরিকল্পিত সাধারণ অনুমান প্রকাশ করে থাকে। কখনো কখনো তাদের কিছু অনুমান অতি সাধারণতার জন্য সত্য হয়ে যায়। অতিসামান্য যে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে আত্মপ্রকাশ লাভ করে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সেগুলো মনে রাখার প্রবণতা দেখা যায়; কিন্তু যেগুলো আদৌ সত্য বলে প্রকাশিত হয় না, তার বেশিরভাগই মানুষ খুব দ্রুত ভুলে যায়। আসলে প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি পুনরায় মনে না পড়ে, তাহলে কিছু দিন পরে সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অর্ধেকই মানুষ অবচেতনভাবে ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি নতুন বৎসরের শুরুতে আসন্ন বছরে মানুষের জীবনে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন খ্যাতিমান জ্যোতিষীদের নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা উত্তর আমেরিকায় একটা সাধারণ প্রথার রূপ পরিগ্রহ করেছে।[১] ১৯৮০ সালে প্রচারিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর

[1] কেবল উত্তর আমেরিকাতেই নয় বরং বাংলাদেশ সহ সারাবিশ্বের প্রায় দেশের জ্যোতিষীরা নতুন বছরের আগমনকে কেন্দ্র করে এ ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে থাকে।

www.i-onlinemedia.net

পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে দেখা যায়, সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যৎ-বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ২৪% সঠিক হয়েছিল!

২. যাদের সঙ্গে জ্বিনের সখ্যতা ও যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ধরনের অপজ্ঞান রয়েছে, তারা এ দ্বিতীয় শ্রেণীর দলভুক্ত। এ দলটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কারণ এরা শির্কের মত বৃহত্তর ও জঘন্যতম গুনাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ কাজে জড়িতদের উপস্থাপিত তথ্যাবলী সাধারণত কিছুটা নির্ভুল হয়, যা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্য বড় ধরনের ফিৎনার কারণ।

জ্বিনদের সাথে যোগাযোগকারী মানুষকে অর্থাৎ জ্বিনদের সাহায্যে যেসব ভবিষ্যৎবক্তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাদেরকে জ্বিনেরা অতিনিকট ভবিষ্যত সম্পর্কে জানাতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- ভবিষ্যৎবক্তার নিকটে কেউ গমন করলে, উপস্থিত ব্যক্তিটি গণকের নিকটে আসার পূর্বে কী কী পরিকল্পনা তৈরি করেছিল তা গণকের জ্বিন আগত ব্যক্তির সাথী জ্বিনের (ক্বারীন)[১] নিকট থেকে অবগত হয়। ফলে, আগত ব্যক্তিটি কী কী করবে বা কোথায় কোথায় যাবে তা জানাতে গণক সক্ষম হয়। আর এভাবেই, একজন প্রকৃত গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তা আগন্তুক ব্যক্তির অতীত সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে। সেই গণক সবিস্তারে বলতে সক্ষম হয়- আগন্তুকের পিতা-মাতার নাম, জন্মস্থান এবং ছোটবেলার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।

গণক বলতে ভবিষ্যতদ্বক্তা ও জ্যোতিষীদের বুঝানো হয়েছে, গণক বিদ্যা এমন একটা পেশা যা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং গণক মুশরিক বলে বিবেচিত। কেননা, সে জ্বিনদের ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের উপাসনা করে তাদের নৈকট্য লাভ করে এবং জ্বিন তাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত করে। জ্বিনের উপাসনা ও তার নৈকট্য লাভ ছাড়া এটা আদৌ সম্ভব নয়। জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ গণকদের নেতৃত্বে আস্থা রাখত এবং বিশ্বাস করত যে, তারা গায়েব সম্পর্কে যা পৃথিবীতে অথবা মানব সমাজে ঘটবে তার অবগত আছে। যার ফলে আরবরা গণকদের সম্মান করত ও তাদের প্রতি ভীত থাকত।

জ্বিনের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এমন একজন সত্যিকারের ভবিষ্যৎবক্তার আলামত হচ্ছে যে, সে বিস্তারিতভাবে অতীতের বর্ণনা দিতে পারবে। কারণ, মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল ব্যবধানের দূরত্ব অতিক্রম করা, গোপনীয় বিষয় বা ঘটনা, হারানো দ্রব্য, অদৃষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা জ্বিনের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য।

২. যাদুমন্ত্র ও অলৌকিক ঘটনায় জ্বিন-শয়তানের প্রভাব

যাদু ভাষাগত দিক থেকে একটা ব্যাপক শব্দ। শয়তানের সহযোগিতায় ও তার ইবাদত ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে যাদুকর যা কিছু প্রয়োগ করে তার সবই যাদুর

[১] যে জ্বিন প্রতিটি মানুষের সাথে সর্বদা অবস্থান করে।

www.i-onlinemedia.net

পর্যায়ভুক্ত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা বা অন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে অতি-প্রাকৃত মাধ্যম বা শক্তিসমূহের নিকট প্রার্থনা করে অথবা সেগুলোকে আহ্বান করে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান প্রাকৃতিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করা অথবা প্রাকৃতিক শক্তির ভবিষ্যদৃষ্টিকে অর্জন করাকেই সাধারণত যাদু বলে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া, নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার, পদ্ধতি ও কর্মের ব্যবহার দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে পারে- এ ধরনের বিশ্বাসকেও যাদু বলা হয়। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী পাপাত্মা বা শয়তান অথবা দেবদূতের সহায়তা ব্যতীত অনুষ্ঠিত 'ঐন্দ্রজালিক বা কুহকময় বা অপ্রাকৃত অনুষ্ঠান', 'ভেলকিবাজি', 'ভানুমতীর খেল' বা 'প্রাকৃতিক যাদু' নামে পরিচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক বস্তুর অধ্যয়ন পাশ্চাত্য সমাজে বর্তমানে আধুনিক ভৌত বা প্রকৃতি বিজ্ঞান হিসেবে প্রচারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত বা বদ বা কুটিল উদ্দেশ্যে অলৌকিক শক্তি তথা পাপাত্মা বা শয়তান বা দেবদূতকে আহ্বান করা বা সহায়তা গ্রহণ করা ও ব্যবহার করার প্রচেষ্টা হচ্ছে ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে 'অদৃশ্য যাদু' বা 'মায়াবিদ্যা', 'ইন্দ্রজাল', 'ডাইনিবিদ্য', 'ডাকিনীবিদ্যা'-এর পার্থক্যের মূল বিষয়। যাদু এবং এর চর্চাকারী ব্যক্তিদেরকে বুঝাতে সাধারণত ডাইনীবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রেতসিদ্ধি[১] নামক পরিভাষাসমূহ ব্যবহৃত হয়। 'অপদেবতা', 'ভূত', 'দৈত্য' বা 'প্রেত'তাড়িত বা মন্ত্রচালিত নারীর যাদু চর্চাকে ডাইনীবিদ্যা বলা হতো। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিপ্রাকৃতিক (অলৌকিক) দৃষ্টি অর্জনের প্রয়াসকে ভবিষ্যৎ-কথন বলা হয়। অন্যদিকে, প্রেতসিদ্ধি অথবা মৃতব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনও ভবিষৎ-কথনের পদ্ধতিসমূহের একটি।

আরবী سِحْر *(সিহর)* শব্দটি যেহেতু যাদুবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না, সুতরাং মায়াবিদ্যা, কুহক, ইন্দ্রজাল, ডাইনীবিদ্যা, ভবিষ্যৎ-কথন এবং প্রেতসিদ্ধিকে বুঝাতেও *'সিহর'* শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মূলত, অদৃশ্য ও রহস্যময় শক্তি হতে ঘটা সবকিছুকে আরবীতে *সিহর* বলে বুঝানো হয়।[২] উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীছের কথা বলা যায়। হাদীসটিতে রাসূল ﷺ বলেন,

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»

'নিশ্চয় কোন কোন কথা ও আলোচনার মধ্যে যাদু আছে।'[৩]

কতকগুলো কথা একেবারে যাদুর মতো অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা, যা কখনও হৃদয় ছুঁয়ে যায় ও অন্তঃকরণে বিশেষ রেখাপাত করে এমনকি ভাষার জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে মনে হয়। আর

---

[১] মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভবিষ্যদ্বাণী করার তথাকথিত যাদু বা ডাইনীবিদ্যা।

[২] *Arabic-English Lexicon*, ১ম খণ্ড, ১৩১৬-১৩১৭ পৃ.।

[৩] *সহীহ আল-বুখারী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫, হাদীস নং ৬৬২, ৫১৪৬, ৫৭৬৭; *সুনান আবূ দাউদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯৩, হাদীস নং ৪৯৮৯; মুসনাদ আহমাদ, ২/১৬, ৫৯, ৬৩, ৯৪।

www.i-onlinemedia.net

এভাবেই, একজন বাগ্মী ও প্রেরণাসঞ্চারকারী বক্তা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে উপস্থাপন করতে পারে। সে কারণেই বাগ্মীতার একাংশকে রাসূল ﷺ যাদু বলে অভিহিত করেছেন। শেষরাত্রের অন্ধকার যেহেতু তখনও অবশিষ্ট থাকে[১] তাই সাওম পালন করার পূর্বে শেষ রাতের খাবারকে *সাহূর*[২] (মূল *সিহ্‌র* হতে) বলা হয়।

যাদুর বাস্তবতা

যাদুর মধ্যে যে বাস্তবতার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে তা অস্বীকার করার প্রবণতা বর্তমানকালের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুর্ছারোগের মতো মানসিক বিকারগ্রস্ততা যাদুর প্রভাবে হয় বলে জনপ্রিয় সব গল্পসমূহে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং এ কথাও বলা হয় যে, যারা যাদুতে বিশ্বাস করে তারাই এর দ্বাঁরা প্রভাবান্বিত হয়।[৩] যাদুর দ্বারা সম্পন্ন কর্মকে অক্ষিবিভ্রম ও কিছু কৌশলের সমষ্টি নির্ভর ধোঁকা বৈ কিছু নয় বলে প্রচার করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যকে দূরীভূত করে সৌভাগ্য আনয়নে যাদু ও কবচের প্রভাবকে ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করা সত্ত্বেও যাদুর কিছু অংশ ইসলাম বাস্তব বলে স্বীকার করে। তবে এ কথাটিও সত্য যে, আজকালকার যাদুর বেশিরভাগই জটিল কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তৈরি করা চমকপ্রদ যান্ত্রিক বস্তু যা প্রদর্শন করা হয় কেবল দর্শকদেরকে ধোঁকা দিতে। কিন্তু কিছু লোক রয়েছে যারা ভাগ্য গণনার ক্ষেত্রে *শয়তান*দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাদুবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রাখে। জ্বিন এবং জ্বিনদের শক্তি ও ক্ষমতার বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌র প্রমাণের আলোকে যাদুর বাস্তবতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমর্থন বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। মানুষের নিকটে প্রেরিত আসমানী বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড নিহিত বিধায় মূল বিধানের প্রতি প্রথম পদক্ষেপেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

যাদু সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾ (سورة البقرة: ١٠١)

---

[১] *তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ*, পৃ. ৩৮২।

[২] অথবা সূহর। দেখুন: *Arabic-English Lexicon*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১৭।

[৩] সূরা আল বাকারার ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আশ'আরী বিদ্বান ফখরুদ্দীন আর রাযী (মৃত্যু ১২১০ ঈসায়ী) এ ধরনের মন্তব্য করেন। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন এ মতবাদের পক্ষাবলম্বন করেন।

www.i-onlinemedia.net

'এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না।' [সূরা আল-বাক্বারা (২) : ১০১]

ইয়াহুদীদের প্রতি প্রেরিত নাবীদের সঙ্গে তাদের কপটতার বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মিথ্যা সম্পর্কে আমাদের নিকটে বর্ণনা করছেন যা নাবী সুলায়মান (আঃ) -এর ব্যাপারে তারা উদ্ভাবন করেছিলঃ

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

'এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়ত্বানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলত সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়ত্বানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফিরিশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফিরিশতাদ্বয় কাউকেও শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না, এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলত তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুত এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হতো আর এদের কোন উপকার হতো না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত!' [সূরা আল-বাক্বারা (২): ১০২]

www.i-onlinemedia.net

'কাবালা' নামক একটি দুর্বোধ্য আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাধ্যমে চর্চা করা যাদুর সত্যতা প্রমাণের নিমিত্তে ইয়াহুদীরা তাদের যাদুচর্চার পন্থাটি নাবী সুলায়মান (আ:)-এর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করেছিল বলে দাবী করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ যে বর্ণনা দিয়েছেন তার 'মর্মার্থ' বা 'ব্যাখ্যা' বা 'সারাংশ' হচ্ছে, আল্লাহ্র কিতাবকে পিছনে ফেলে দিয়ে এবং শেষ নাবীকে অস্বীকার করে ইয়াহুদীরা শয়ত্বানের শেখানো যাদুমন্ত্রের পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ব করে। এ শয়ত্বানেরা কুফরী কর্ম করেছে যাদু শিখিয়ে। তারা জ্যোতিষশাস্ত্র নামক মায়াবিদ্যার এক কৌশলও শিখিয়েছে। ব্যাবিলনের জনগণের নিকটে পরীক্ষাস্বরূপ প্রেরিত হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশতা তাদেরকে এ বিদ্যা শিক্ষাদান করেছিল। মায়াবিদ্যার কোন তত্ত্ব শিক্ষা দেবার পূর্বেই ফেশেতারা জনগণকে এ বিদ্যা শিখে কুফরী কর্ম সম্পন্ন না করতে সতর্ক করত, কিন্তু ফিরিশতাদের সতর্কবাণীর প্রতি তারা কোনই কর্ণপাত করেনি। মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি ও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে ফিরিশতাদের নিকট থেকে তত্ত্বাবলীর জ্ঞান এমন স্তর পর্যন্ত অর্জিত হয়েছিল যে, তারা মনে করত তাদের ইচ্ছামতো যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষতি করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ্ই একমাত্র সত্তা যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কে হবে না। তবে অর্জিত এ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই কাজে আসেনি বরং তারা শুধু নিজেদের ক্ষতি বৃদ্ধি করেছিল। সত্যিকারের যাদুবিদ্যার চর্চা যেহেতু কুফরী তাই এ কর্ম সম্পাদনের ফলস্বরূপ জাহান্নামে তাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে।

যারা উক্ত কৌশলসমূহ আয়ত্ব করেছিল তারা এটা ভালভাবেই জানত যে, তারা অভিশপ্ত (লা'নত প্রাপ্ত)। কারণ, তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারেও যাদুচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। নিম্নের নিয়মগুলি এখনো তাওরাতে পাওয়া যায়:

'তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে সেখানকার জাতিগুলো যেসব জঘন্য কাজ করে তোমরা তা করতে শিখবে না। তোমাদের মধ্যে যেন এমন কোন লোক না থাকে যে তার নিজের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী করে, যে গোণাপড়া করে কিংবা মায়াবিদ্যা খাটায় কিংবা আলামত দেখে ভবিষ্যতের কথা বলে, যে যাদু করে, যে তন্ত্রমন্ত্র খাটায়, যে ভূতের মাধ্যম হয়, যে ভূতের সংগে সম্বন্ধ রাখে এবং যে মৃত লোকের সংগে যোগাযোগ রাখে। এই সব কাজ যে করে মাবুদ তাকে জঘন্য মনে করেন। এই সব জঘন্য কাজের জন্যই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ ঐ সব জাতিকে তোমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবেন।'[১]

কিন্তু এ সব নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার স্থানে তারা স্বশরীরে উপস্থিত ছিল না বলে ভান করে এ বিধানাবলীর প্রতি কর্ণপাতই করে না। তাওরাতে এটাও লেখা ছিল যে, কোন ব্যক্তি যাদু বা মায়াবিদ্যার কৌশলের আংশিক চর্চা করলেই সে জান্নাতের যে-কোন পুরস্কার

[১] Deuteronomy 18:9-12 [তৌরাত শরীফ: দ্বিতীয় বিবরণ, (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০০ ইংরেজি) ১৮: ৯-১২]

www.i-onlinemedia.net

থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাকে চিরদিন আগুনে থাকতে হবে। কিন্তু ইয়াহুদীরা উপরোক্ত বাক্যগুলো মূল তাওরাত থেকে বাদ দিয়ে যাদুমন্ত্রের বিভিন্ন কৌশল চর্চায় লিপ্ত রয়েছে।

তাদের এ শোচনীয় অবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত পংক্তিগুলোর ইতি টানেন করুণাপ্রকাশক বাক্যাংশের মাধ্যমে। মৃত্যুপরবর্তী জীবনে শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে ইয়াহুদীদের কোন জ্ঞান থাকলে তারা ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে কয়েকটি সস্তা কৌশল আয়ত্বের জন্য তাদের মহা মূল্যবান আত্মার ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয়ার ভয়ংকর পরিণাম উপলব্ধি করতে পারত।

আয়াতগুলোর এ বাকাংশ দ্বারাও যাদু নিষিদ্ধ (হারাম) হওয়ার বিধান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়:

﴿... وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ...

﴿١٠٢﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

'... যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না ...।' [সূরা আল-বাক্বারা (২): ১০২]

একমাত্র কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কর্মের শাস্তি হতে পারে জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আবার এটাও প্রমাণিত হয় যে, যাদুকরই নয় বরং এদের পাশাপাশি যারা যাদুবিদ্যা অর্জনকারী ছাত্র ও যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানকারী শিক্ষক উভয়ই কাফির। *'যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে'*- এ বাক্যাংশটির সুগভীর তাৎপর্য রয়েছে। যাদু শিক্ষা দিয়ে যে অর্থ উপার্জন করে, যাদুবিদ্যা অর্জনের নিমিত্তে যে অর্থ ব্যয় করে অথবা যাদু সম্পর্কে যে জ্ঞানের অধিকারী- এরা সবাই এ বিধানের অধীন। তাছাড়া নিম্নবর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাদুকে কুফর বলে অভিহিত করে বলেন: *'নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না।'* এবং *'মূলত সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল।'* [সূরা আল-বাক্বারা (২): ১০২]

কিছু যাদুর যে বাস্তবতা রয়েছে তা পূর্বে বর্ণিত আয়াতটি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু, রাসূল ﷺ নিজেই যাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কষ্ট ভোগ করেছিলেন- এ বিষয়টি বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা জানা যায়:

"যায়িদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, লাবীব ইবনু আ'সাম নামে জনৈক ইয়াহুদী রাসূল ﷺ-এর উপর যাদু করেছিল এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূলের ﷺ নিকটে মু'আওয়াযাতান (সূরা আল-ফালাক্ব এবং নাস) নিয়ে জিবরীল (জিবরাঈল) (আ:) আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইয়াহুদী যাদু করেছে এবং যে জিনিসে যাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। তারপর সেই জিনিস কূপ

www.i-onlinemedia.net

থেকে উদ্ধার করে আনতে 'আলী ইবনু আবি ত্বালিবকে রাসূল ﷺ পাঠালেন। 'আলী (রাঃ) তা নিয়ে ফিরে এলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। রাসূল ﷺ এক এক করে গ্রন্থি খুলতে এবং প্রতিটির সঙ্গে সূরা দু'টি থেকে একটি করে আয়াত পড়তে বললেন। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে রাসূল ﷺ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন।[১]

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলত যাদু করে। আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলত শির্ক করে। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস (তাবীজ কবজ) লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়।'[২]

যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতপর তাতে ফুঁক দেয়, সে মূলত যাদু করে। ফুঁক দেওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, সে এমন কিছু পড়ে ফুঁক দেয়, যা দ্বারা সে শয়তানকে ব্যবহার করে ও কথাগুলো প্রয়োগের সময় সে জ্বিন উপস্থিত করে এবং সেই জ্বিন ফুঁকের মাধ্যমে উক্ত গিরাতে কাজ করে। যাদুকরের নিকট গিরা লাগানোর উপকার হচ্ছে, যতক্ষণ গিরা বলবৎ থাকবে ততক্ষণ যাদুও ক্রিয়াশীল থাকবে। গিরা কখনও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় আবার কখনও অতি ছোট ছোট ও সূক্ষ্ম হয়। প্রকৃতপক্ষে যাদুর বাস্তবতা হচ্ছে যাদুকে কার্যকর এবং ক্রিয়াশীল করতে হলে শয়তানকে ব্যবহার এবং তার নৈকট্য লাভ করতেই হয়। আর শুধুমাত্র তার নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই জ্বিন-শয়তান যাদুকৃত ব্যক্তির শরীরে যাদুর ক্রিয়া শুরু করে। শয়তানের নৈকট্য লাভ ছাড়া কোন যাদুকরের পক্ষেই যাদুকর হওয়া সম্ভব নয়। যে যাদু করল সে শির্ক করল। যাদু মূলত শির্কে আকবার তথা বড় শির্ক-এর অন্যতম এবং তা তাওহীদের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কারণেই আমরা বলব যে, যাদু শির্ক-এর পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, '(বলুন যে আমি পরিত্রাণ কামনা করছি) গিরা তথা বন্ধনে অধিক ফুঁ দান কারিনীদের অনিষ্ট হতে।' نفاثات শব্দটি نفاثة-এর বহুবচন এবং نفث/نفاثة থেকে মুবালাগা তথা অতিমাত্রায় ফুঁ দান করার অর্থ বহন করে এবং তা দ্বারা নিঃসন্দেহে যাদুকারিনী বুঝানো হয়েছে এবং সরাসরি যাদুকারিনী না বলে অতিমাত্রায় ফুঁ দানকারিনী বলা হয়েছে। কেননা তারা অতি মাত্রায় ফুঁ দান করত এবং ঝাড় ফুঁক ও বিভিন্ন রকমের তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ফুঁ দিত এবং সে ফুঁ এর মাধ্যমে জ্বিন সেই গিরা বন্ধনে

---

[১] 'আবদ ইবনু হুমাইদ এবং আল-বায়হাক্বি কর্তৃক সংগৃহীত। এ হাদীছের অনেকাংশ *বুখারী* ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। *বুখারী*, ৭ম খণ্ড, ৪৪৩-৪৪৪ পৃ., হাদীস নং ৬৬০ এবং *মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, ১১৯২-১১৯৩ পৃ., হাদীস নং ৫৪২৮।

[২] সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ৪০৮৪। এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি কোন জিনিস লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ততা রাখে আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট আর যখন বান্দা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে তখন তাকে সেদিকে সোপর্দ করা হয়। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী তিনিই একমাত্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের মালিক। 'হে মানব সকল! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ্ প্রশংসিত ধনবান।'

www.i-onlinemedia.net

কাজ করত যাতে যাদুকৃত ব্যক্তির শরীরের কিছু একটা থাকত অথবা এমন কিছু থাকত যার সাথে যাদুকৃত ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে যাদু ক্রিয়াশীল হয়ে যায়।

এ পৃথিবীতে বসবাসরত প্রতিটি জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ রয়েছে, যারা কোন না কোন প্রকারের যাদু চর্চা করেছে- এ সম্পর্কে প্রমাণাদি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নিকটে সংগৃহীত রয়েছে। এ সব সাক্ষপ্রমাণের কতিপয় মিথ্যা হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, যাদু এবং অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত গল্প তৈরিতে পুরো মানবজাতি একত্রে সম্মত হয়েছে। অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দৃষ্টান্তসমূহের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে সুগভীর চিন্তায় মগ্ন হলে অবশ্যই এগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু বাস্তবতার যোগসূত্রের সন্ধান মিলবে। জ্বিনের জগৎ সম্পর্কে পরিচিত নয় এমন লোকদের কাছে 'ভূতুড়ে বাড়ি', 'প্রেত নামানোর আসর'[১], 'ওঝার কাষ্ঠফলক'[২], ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশেষত হাইতিতে প্রচলিত ডাকিনীতন্ত্র[৩], ভূতে বা জ্বিনে পাওয়া বা ভূতাবিষ্ট, কেবল জিহ্বা দিয়ে কথা বলা, দেহকে শূন্যে ভাসমান রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রকাশ রয়েছে। এমনকি মুসলিম বিশ্ব বিশেষত বিভিন্ন চরমপন্থী সুফীতন্ত্রের (মরমীবাদের) গুরুজন তথা সুফীবাদীরা এর অস্বাভাবিক প্রভাবে বিপদগ্রস্ত। তাদের অনেকেই দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল দূরত্বের পথ অতিক্রম করতে, কোন উৎস ব্যতিরেকে খাদ্য ও টাকা-পয়সা তৈরি করতে সক্ষম বলে মনে হয়। আর তাদের অজ্ঞ অনুসারী ও অন্ধ ভক্তরা এ সব যাদুর প্রহেলিকাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনা বা কারামত বলে বিশ্বাস করে। ফলে তথাকথিত এ সব ওলী-আওলিয়া, মুরশিদ, পীর-মাশাইখ, দরবেশদের উদ্দেশ্যে ভক্তরা তাদের সম্পদ ও জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আশ্চর্য হওয়ার মতো এ ধরনের অনেক ঘটনার মূলে জ্বিন জগতের হস্তক্ষেপ থাকে, অথবা জ্বিনের গোপন ও দুষ্ট জগৎ লুকিয়ে রয়েছে।[৪]

জ্বিনের ক্ষমতা সম্পর্কে এ বইয়ে বর্ণিত মৌলিক বিষয়সমূহ স্মরণ রাখলে সকল প্রকার অতিপ্রাকৃতিক তথা অলৌকিক ও যাদুসংক্রান্ত ঘটনাগুলো যে ধোঁকা বা

---

[১] মৃতের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বৈঠক বা প্রেততাত্ত্বিক গবেষণার সভা।

[২] প্রেতচক্রের অধিবেশনে ব্যবহৃত অক্ষর ও অন্যান্য চিহ্ন সংবলিত কাষ্ঠফলক।

[৩] এর প্রয়োগ বা বিশ্বাস বা এতে সিদ্ধ ব্যক্তি।

[৪] তবে উপরে বর্ণিত সকল ঘটনার মূলে যে জ্বিন জগতের হাত রয়েছে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেননা, আওলিয়াদের কারামত যেটাকে আমরা স্বীকার করি, সেখানেও তো মাঝে-মধ্যে এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটে থাকে এবং ঘটতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে আমরা সে-সব ঘটনার পিছনেও জ্বিনের জগত সক্রিয় রয়েছে বলে ঘোষণা দিতে পারি না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, অতি প্রাকৃত বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে শুধু ঘটনার ধরন নয়, বরং আমাদেরকে দেখতে হবে যে ঘটনা কার মাধ্যমে ঘটেছে এবং কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে ঘটেছে।

www.i-onlinemedia.net

ভেলকিবাজি নয় তা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, হঠাৎ হঠাৎ আলো জ্বলে উঠে ও নিভে যায়, দেয়াল থেকে ছবি পড়ে যায়, জিনিসপত্র বাতাসে উড়ে বেড়ায়, মেঝে ফেটে যায় ইত্যাদি ঘটনাগুলো সাধারণত একটি ভূতুড়ে বাড়ির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অদৃশ্য অবস্থায় জ্বিনেরা জড় বা ভৌত উপাদান বা বস্তুর উপর সক্রিয় হয়ে উক্ত ঘটনাগুলোসহ আরও অন্যান্য অভূতপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হতে সহায়তা করে। আধ্যাত্ম বৈঠকের বেলায়ও এ বিষয়টি উপরের ঘটনার অনুরূপ বলেই প্রতীয়মান হয়। আধ্যাত্ম বৈঠকে মৃতরা জীবিতদের সাথে যোগাযোগ করে ব'লে বাহ্যিকদৃষ্টিতে মনে হয়। মৃত আত্মীয়-স্বজনদের কণ্ঠস্বর যাদের নিকটে পরিচিত তারা মৃতদের জীবনে সংঘটিত নানা প্রকার ঘটনা সম্পর্কে তথাকথিত মৃত ব্যক্তির মুখ থেকে অনুরূপ কণ্ঠেই শুনতে পায়। মৃতব্যক্তিটির জীবিতাবস্থায় তার জন্য যে জ্বিনটি নিয়োজিত ছিল সর্বক্ষণ, সেই জ্বিনটিকে আহ্বান করে তাকে মাধ্যম করে এ কৃতিত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করা হয়। এ জ্বিনটিই মৃতের কণ্ঠস্বরকে হুবহু নকল করে মৃতব্যক্তির জীবনে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সবিস্তার বর্ণনা পেশ করে। ওঝার কাষ্টফলককেও অনুরূপ উত্তর প্রদান করতে দেখা যায়। যথাযথ পরিবেশের ব্যবস্থা করলে জ্বিনের অদৃশ্য হস্তক্ষেপে বিস্ময়কর ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে। যারা শূন্যে ভেসে বেড়াতে অথবা কোন জিনিসকে স্পর্শ না করেই উপরে উঠাতে বা নিচে নামাতে সক্ষম বলে মনে হয়- এগুলোতেও জ্বিনের অদৃশ্য হাত রয়েছে। কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের দূরত্ব অতিক্রম করতে অথবা একই সময়ে দু'টি স্থানে উপস্থিত থাকতে সক্ষম হয়- এটাও আদতে তাদের অদৃশ্য সঙ্গী কর্তৃক স্থানান্তরিত হয়।[১] অনুরূপভাবে, যারা শূন্য থেকে খাদ্যদ্রব্য বা টাকা-পয়সা উপস্থিত করতে পারে তারাও অদৃশ্য ও দ্রুতগতির জ্বিনের সহায়তা নিয়ে এ সব কৃতিত্ব সম্পন্ন করে থাকে। এমনকি পুনর্জন্মগ্রহণের মত বিস্ময়কর ঘটনার প্রকাশেও জ্বিনদের হস্তক্ষেপ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাত বৎসর বয়স্ক *শান্তি দেবী* নামে এক বালিকা তার পূর্ববর্তী জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলীর সুস্পষ্ট ও নিখুঁত বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিল।[২] বালিকাটি তখন যেখানে বাস করত সে স্থান থেকে বহুদূরের অন্য একটি প্রদেশের মুতরা নামক একটি শহরে অবস্থিত তার বাড়ির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছিল (যেখানে সে তার পূর্ববর্তী জীবনে বসবাস করত)। লোকজন বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে সেখানে গমন করলে, বালিকাটির বর্ণনানুপাতে একটি বাড়ি সে স্থানে এক সময় ছিল বলে সেখানকার স্থানীয় লোকেরা স্বীকার করেছিল। তাছাড়া তারা সেই বালিকার পূর্ববর্তী জীবনের কিছু ঘটনার সত্যতাও নিশ্চিত করেছিল। নিশ্চয়ই এ সকল তথ্যাবলী জ্বিনেরা বালিকাটির অবচেতন মনে প্রথিত করে দিয়েছিল। রাসূল ﷺ এ বিষয়টিকে

[১] এ সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে *Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn* -এর ৪৭-৫৯ পৃ. দেখুন।

[২] Colin Wilson, *The Occult,* (New York: Random House, 1971) 514-515 পৃ.

www.i-onlinemedia.net

Contents-1 Contents-2

সমর্থন করে বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ ঘুমন্তাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখে তা তিন প্রকার: আর-রাহমান-এর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হতে, খারাপ স্বপ্ন শয়তান হতে এবং অবচেতন স্বপ্ন।'[১]

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, জ্বিন মানুষের দেহের পাশাপাশি মনের মধ্যেও প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। জ্বিনের আছর বা জ্বিনে পাওয়া মানুষের ঘটনা অসংখ্য এবং প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এ ঘটনা ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে, এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে বহু খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের কথা বলা যায়, শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যতার দরুন এরা অবচেতন হয়ে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। এমন দুর্বলতর অবস্থায় জ্বিন সহজেই তাদের শরীরে প্রবেশ করে প্রলাপ বকাতে পারে। তথাকথিত মুসলিম সুফীদের[২] জিকিরের[৩] বৈঠকের সময়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটার অনেক নজীর রয়েছে। আবার জ্বিনের এ আছর দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। ফলে মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। জ্বিনে বা ভূতে পাওয়া অথবা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যবহার করে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটায় অথবা তাদেরকে মাধ্যম করে অনেক সময় নিয়মিতভাবে কথাবার্তা বলতে পারে।

মধ্যযুগে ভূত-প্রেত[৪] বিতাড়ন রেওয়াজের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ভূত-প্রেত বিতাড়ন সংক্রান্ত খ্রিস্টানদের এ প্রথার উৎপত্তি মূলত বাইবেলে। মন্ত্র দ্বারা যিশু ভূত-প্রেত দূর করেছেন- এ সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা বাইবেলে দেখতে পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা এ রকম যে, 'যিশু ও তাঁর সহচরগণ গেরাসেনীদের এলাকায় গিয়ে ভূতে পাওয়া একজন লোকের সাক্ষাত পান। সেই ভূতগুলোকে তার মধ্য থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ করলে তারা লোকটিকে ত্যাগ করল এবং নিকটবর্তী পাহাড়ের ঢালে চরে বেড়ানো শূকর পালের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তাতে সেই শূকরের পাল পাহাড়ের ঢালু পার দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে মরল।'[৫] সত্তর ও আশির দশকের শেষের দিকে মুক্তি পাওয়া *'The Exorcist', 'Rosemary's Baby'* ইত্যাদি চলচ্চিত্রে এ ভূত-প্রেত বিতাড়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অতিপ্রাকৃত তথা অলৌকিক যেকোন বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা যেহেতু বস্তুবাদী পশ্চিমাদের সাধারণ প্রবণতা, তাই ভূত-প্রেত বিতাড়নের কোন যৌক্তিক ভিত্তি

---

[১] আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত। আবূ দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* ৩য় খণ্ড, ১৩৯৫ পৃ., হাদীস নং ৫০০১; *সিলসিলাহ আল-আহাদীস আছ-ছাহীহাহ,* ৪র্থ খণ্ড, ৪৮৭ পৃ., হাদীস নং ১৮৭০।

[২] *মুসলিম*দের মধ্য থেকে উৎসরিত আধ্যাত্মবাদ।

[৩] অনবরত আল্লাহ্‌র নাম বলা এবং অনেক সময় গান-বাদ্যের তালে তালে শরীর ঝাঁকিয়ে এমনকি নৃত্যের তালে তালে।

[৪] ইছলামী পরিভাষায় ভূতপ্রেত ইত্যাদি কোন শব্দ নেই। কারণ, কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, জ্বীনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে বিশ্বাসী তথা মু'মিন এবং কিছু সংখ্যক হচ্ছে অবিশ্বাসী বা কাফির, তন্মধ্যে অবিশ্বাসীদেরকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়। তন্মধ্যে একটি নাম হচ্ছে ভূত বা প্রেত যা আমাদের সামাজিক পরিভাষায় প্রচলিত একটি নাম বা শব্দ।

[৫] মথি ৮:২৮-৩৪, মার্ক ৫:১-২০ এবং লূক ৮: ২৬-৩৯।

www.i-onlinemedia.net

পশ্চিমাদের নিকটে নেই এবং এটিকে তারা কুসংস্কার বলে গণ্য করে থাকে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্ধকার ও মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে ডাইনি খুঁজে বের করে আগুনে পোড়ানোর ঘটনা অহরহ ঘটতে দেখা গেছে। তথাপি, জ্বিনে পাওয়া বা ভূতগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি থেকে জ্বিন বা ভূত বা প্রেতকে বিতাড়ন করতে এবং জ্বিনে পাওয়া বা ভূতগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত রোগের চিকিৎসায় কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক বৈধ পদ্ধতি প্রয়োগ জায়েয।

পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বর্তমানে অনেক মুসলিম জ্বিনে পাওয়া বা ভূতাবিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে। এমনকি অনেক মুসলিম এমনও রয়েছে যারা জ্বিনের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে না। অথচ, কুরআন ও সুন্নাহতে এ ব্যাপারে হ্যাঁ-বাচক বর্ণনা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ লোকদেরকে জ্বিনের আছর থেকে মুক্ত করেছেন। তাছাড়া এমন হাদীছের সংখ্যাও কম নয় যেখানে আমরা দেখতে পাই, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরাও তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে লোকজনকে জ্বিনের আছর থেকে মুক্ত করেছেন।

www.i-onlinemedia.net

যত আছে গণক-জ্যোতিষ ও সাধু করে তারা চর্চা জ্যোতিষশাস্ত্র ও যাদু

নক্ষত্র ও গ্রহসংক্রান্ত গণনা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চাকে পূর্ববর্তী মুসলিম পণ্ডিতেরা সামগ্রিকভাবে *'তানযীম'* বলে অভিহিত করেন। এ বিষয়টির উপর ইসলামী বিধানকে বিশেষভাবে কার্যকর করতে তারা *তানযীম*কে তিনটি ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।

১. প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিষীরা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সমগ্র বিশ্ব যেহেতু জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভাবে প্রভাবিত, তাই ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করা সম্ভব।[১]

যতদূর জানা যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র নামে পরিচিত এ চর্চার উদ্ভব হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়ায়। গ্রীক সভ্যতার সময়কালে তা পূর্ণতা লাভ করে। ষষ্ঠ শতাব্দিতে মেসোপটেমিয়ার জ্যোতিষীদের উদ্ভাবিত পুরাতন পদ্ধতিগুলো ভারতে ও চীনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তবে কেবল নক্ষত্রের মাধ্যমে ভবিষ্যত গণনার পদ্ধতির চর্চা চীনে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। মেসোপটেমিয়াতে জ্যোতিষশাস্ত্রের মর্যাদা অনেক উঁচুস্তরে ছিল এবং ক্রমান্বয়ে তা রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের জ্যোতিষীরা আকাশে দৃশ্যমান নানা প্রতীকের বিশ্লেষণ করে রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ-অকল্যাণ সংক্রান্ত শুভাশুভ সংকেতের ঘোষণা প্রদান করত। 'জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হল ক্ষমতাবান দেবতা'- এ বিশ্বাস মেসোপটেমিয়ার মূল বিশ্বাস ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দিতে নক্ষত্ররূপী দেবতারা গ্রীসে পরিচিতি লাভ করলে এগুলো গ্রীসের গ্রহসংক্রান্ত গণনার উৎসে পরিণত হয়। ভবিষ্যত নির্ধারণের বিজ্ঞান হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্র শুধু গ্রীসের রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা ধন-সম্পদশালীদের নাগালেও চলে যায়।[২]

ধর্ম, দর্শন এবং সমসাময়িক সমগ্র ইউরোপের পৌত্তলিকতার বিজ্ঞানের উপরে জ্যোতিষশাস্ত্র দুই সহস্রাধিক বর্ষব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছে। ইউরোপের *'Dante'* এবং সেইন্ট *'Thomas Aquinant'* উভয়ে পৃথকভাবে তাদের নিজস্ব দর্শনে জ্যোতিষশাস্ত্রের 'কার্যকারণ' মতবাদের প্রয়োগ করেন খ্রিষ্ট্রীয় ১৩ শতাব্দিতে। ইব্রাহিম (আব্রাহাম) (আ:)-এর উম্মাত সাবীয়রাও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করত। এরা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে পূজা করত। তাছাড়া, এই সাবীয়রা

---

[১] *তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ*, ৪৪১ পৃ.।

[২] William D. Halsey (ed.), *Collier's Encyclopedia*, (USA: Crowell-Collier Educational Corporation, 1970) vol. 3, p. 103.

www.i-onlinemedia.net

গ্রহ-নক্ষত্র তথা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রতীক ছবি ও মূর্তি তৈরি করে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সেগুলোকে স্থাপন করত। তারা বিশ্বাস করত যে, এগুলো জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদাপদ দূরীভূত করে, দু'আ কবূল করে, প্রয়োজন পূরণ করে। তারা আরো বিশ্বাস করত যে, এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহ্ ও সৃষ্টি জগতের মাঝে মধ্যস্থতাকারী এবং তাদেরকে দেওয়া হয়েছে পৃথিবী পরিচালনার দায়-দায়িত্ব। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আত্মা নেমে এসে এ সব মূর্তির মধ্যে অবস্থান করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে মানুষের চাহিদা পূরণ করে। এ সব বিশ্বাসের ফলক্রমে তারা সে সব গ্রহ-নক্ষত্র, ফিরিশতা প্রভৃতির মূর্তির নিকটে গমন করে প্রার্থনা করত।[১] *তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ*-কে সমূলে ধ্বংস করার কারণে এ সকল জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চাকে শির্ক হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদিকে সিজদাহ করা কিংবা ছবি, মূর্তি ও প্রতিমা ইত্যাদির নিকট প্রার্থনা করা *তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ*-তে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যদি কেউ নক্ষত্রকে মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ ইত্যাদির পূর্বাভাষ বা প্রতীক ও আলামত হিসেবে বিশ্বাস করে, তাহলে তা হবে *আল-আসমা ওয়াস সিফাত*-তে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। মূলত, এ শাস্ত্রের চর্চাকারীরা একইসাথে শির্ক ও কুফর চর্চায় লিপ্ত। কারণ, এ সব জ্যোতিষীরা সাধারণত ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু সম্পর্কে জানাতে সক্ষম বলে দাবী করে থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ই রাখেন। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র কিছু গুণাবলীতে গুণান্বিত বলে মিথ্যা দাবী করে এবং যে ভাল-মন্দ ভাগ্য আল্লাহ্ তা'আলা সুনির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা পরিবর্তন করার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে। জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের ভিত্তিতে। উক্ত হাদীছে রাসূল (ﷺ) বলেন, 'জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হচ্ছে যাদুবিদ্যার জ্ঞান লাভ করা। সুতরাং এভাবে কেউ যত জ্ঞান অর্জন করল, ততই তার গুনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকল।'[২]

২. দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিষীদের দাবী এ রকম যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি এবং তাদের অবস্থানের ভিন্নতার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করবেন।'[৩] ব্যাবিলনের জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা ও চর্চাকারী মুসলিম জ্যোতিষীরা সাধারণত এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করত। জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার প্রচলন মুসলিম রাজ্যে রাজকীয়ভাবে শুরু হয় উমাইয়া খিলাফাতের শেষ প্রান্তে এবং আব্বাসীয়

[১] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ*, ৪৪১ পৃ.।

[২] আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, ৩য় খণ্ড, ১০৯৫ পৃ., হাদীস নং ৩৯৮৬ এবং ইবনু মাজাহ।

[৩] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ*, ৪৪২ পৃ.।

www.i-onlinemedia.net

খিলাফাতের সূচনাকালে খলিফার আসনে আসীন শাসকদের মাধ্যমে। একজন জ্যোতিষী নিয়োগ করা হতো এ জন্য যে, সে খলিফাকে দৈনন্দিন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ এবং আসন্ন বিপদ-আপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রদান করবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্গত মৌলিক বিষয়গুলোকে মুসলিম জনগণ যেহেতু কুফর বলে গণ্য করত, তাই মুসলিমদের মাঝে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করাকে তথাকথিত এ সব মুসলিম জ্যোতিষী ইসলামসম্মত বলে চালিয়ে দেয়ার নিমিত্তে একটা কৌশল প্রয়োগ করল। ফলে, জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভিন্ন আলামত ও প্রতীক আল্লাহ্‌র ইচ্ছাশক্তি বলে প্রচার করা হল। যা হোক, জ্যোতিষশাস্ত্রের এ ধরনের চর্চাও হারাম এবং এর চর্চাকারীকে কাফির বলে গণ্য করা উচিত। কারণ, এ বিশ্বাস এবং মুশরিকদের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা আরোপিত হয়েছে এবং এদের বিভিন্ন অবস্থান ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়ার দাবীদারেরা ভবিষ্যত জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে থাকে, অথচ ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্‌ই পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তবুও, পরবর্তীকালের কিছু সুবিধাবাদী মুসলিম পণ্ডিত আসমানী বিধানের যথাযথ প্রয়োগ সাধনে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে, জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়গুলো মুসলিমদের মাঝে বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হওয়ার কারণে তৎকালীন তথাকথিত মুসলিম পণ্ডিতেরা এ ধরনের জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চাকে অনুমোদন করেন।

৩. তৃতীয় ও শেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে সব বিষয় যা নক্ষত্রের বিভিন্ন অবস্থান ও এর গতিবিধির উপর ভিত্তি করা সম্পর্কিত। এর দ্বারা নাবিক বা মরূভূমির পথিকেরা তাদের দিক নির্ণয় এবং কৃষকেরা তাদের শস্য রোপনের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি করে থাকে।[১] জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কেবল এ রূপটিই অনুমোদনযোগ্য (হালাল)। কারণ, এটি হালাল হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

এ বিধানের মূল ভিত্তি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿٩٧﴾﴾ (سورة الأنعام: ٩٧)

'তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা সেগুলোর সাহায্যে জলে স্থলে অন্ধকারে পথের দিশা লাভ করতে পার।' [সূরা আল-আন'আম (৬): ৯৭]

[১] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ*, ৪৪৭-৪৪৮ পৃ.।

www.i-onlinemedia.net

ক্বাতাদাহ[১] থেকে বুখারী বর্ণনা করেন, 'দিক সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে এবং শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্রমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, নক্ষত্রমণ্ডলীকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যতিরেকে যদি অন্য কিছু প্রত্যাশা করা হয় এগুলোর নিকট থেকে, তাহলে এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা বড় ধরনের বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। ফলে, সে ব্যক্তি ভাগ্যহীন হয়ে পড়ে, কল্যাণের সঙ্গে তার জীবনের সাক্ষাত মেলে না এবং সে তার নিজের উপর এমন সব বিষয়কে আরোপ করে যে সম্পর্কে সে অজ্ঞ। নিশ্চয়ই এ কাজ যারা সম্পাদন করে তারা আল্লাহ্র আদেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তারা নক্ষত্র সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে। এ সব ব্যক্তি দাবী করে, এই এই নক্ষত্রের সময় বিয়ে করলে এটা ঘটবে, ওটা ঘটবে ইত্যাদি; এই এই নক্ষত্রের সময় কোন কাজ শুরু বা কোথাও যাত্রা বা ভ্রমণ করলে এটা-ওটার সম্মুখীন হবে ইত্যাদি। আমার জীবন অতিবাহিত হওয়ার সময়ে প্রতিটি নক্ষত্রের নীচে লাল, কাল, লম্বা, খাটো, কুৎসিত এবং সুদর্শন প্রাণীর জন্মলাভ হয়েছে। কিন্তু কোন নক্ষত্র, প্রাণী বা পাখি এরা কেউই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাউকে অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জনের কৌশল শিক্ষা দিতেন, তাহলে আদম (আ:)-কেই শিক্ষা দিতেন। কারণ, তিনিই তাঁর নিজ হাত দ্বারা আদম (আ:)-কে সৃষ্টি করেছেন, ফিরিশতাদেরকে দিয়ে তাকে সিজদা করিয়েছেন এবং তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।'

পূর্বে উল্লেখিত নক্ষত্র ব্যবহারের সীমারেখাকে ক্বাতাদাহ (রাহি.) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মূলত সূরা আল-আন'আমের ৯৭ নং আয়াতের ভিত্তিতে। এ সীমারেখা সম্পর্কে নিচের আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে:

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ... ۝﴾ (سورة الملك: ٥)

'আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি আর শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, এবং প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি...।' [সূরা আল-মুল্ক (৬৭): ৫]

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যে মানদণ্ড প্রদান করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করে বৈধ উপায়সমূহ ব্যতীত সকল প্রকার নক্ষত্র সংশ্লিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলিমের আবশ্যিক দায়িত্ব।

মুসলিম জ্যোতিষীর খোঁড়া যুক্তি

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিমরা তাদের এ চর্চাকে সমর্থন এবং এর বৈধতা প্রমাণের নিমিত্তে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অপব্যাখ্যা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

[১] আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত। (রাহিমাহুল্লাহ)

www.i-onlinemedia.net

উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-বুরূজকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে, 'রাশিচক্রের প্রতীক'-এর সূরা হিসেবে।[১] শুধু তাই নয়, এ সূরাটির প্রথম আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে 'রাশিচক্র প্রতীকের শপথ'। এটি নিশ্চয়ই *'বুরূজ'* শব্দের ভুল ও ভ্রান্ত অনুবাদ। শব্দটির সত্যিকার অর্থ হচ্ছে 'নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান'। 'রাশিচক্রের প্রতীক' নয়। নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান বুঝাতে প্রাচীন ব্যাবিলন এবং গ্রীকবাসীরা রাশিচক্রের প্রতীক হিসেবে কেবল কিছু প্রাণীর প্রতিরূপকে ব্যবহার করত। ফলে, নক্ষত্র পূজার পৌত্তলিক চর্চার সমর্থনে কোনক্রমেই এ সূরাকে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কল্পিত চিত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থানের কোন সম্পর্ক নেই। বরং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মহাশূন্যে নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তীকালে, জ্যোতিষশাস্ত্রকে সমর্থন করতে খলিফাদের দরবারে সূরা *আন-নাহ্‌লের* নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যবহৃত হতো:

﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾﴾ (سورة النحل: ١٦)

'আর দিক-দিশা প্রদানকারী চিহ্নসমূহ; আর তারকারাজির সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ লাভ করে।' [সূরা আন্-নাহল (১৬): ১৬]

মুসলিম জ্যোতিষীরা দাবী করে, 'এ আয়াতের অর্থ হল, নক্ষত্রমণ্ডলী অদৃশ্যকে প্রকাশ করার প্রতীক এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে ভবিষ্যত সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।'[২] যা হোক, *'তুরজুমান আল-কুরআন'* অর্থাৎ কুরআনের অর্থের অনুবাদক বলে ইবনে 'আব্বাস (রাঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ, এ আয়াতে উল্লেখিত 'প্রতীক' দ্বারা সূর্যালোকের 'পথচিহ্ন' বা 'বিশেষচিহ্ন' বুঝানো হয়েছে বলে ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ওগুলো কোনক্রমেই নক্ষত্রসম্বন্ধীয় নয়। তিনি আরও বলেন, *'তারকারাজির সাহায্যে তারা পথনির্দেশ লাভ করে।'*- এ শব্দসমষ্টির অর্থ হচ্ছে, সমুদ্র ও মরুভূমিতে রাত্রিকালে ভ্রমণাবস্থায় তারা নক্ষত্রমণ্ডলীর মাধ্যমে পথনির্দেশ প্রাপ্ত হয়।[৩] অন্যভাবে, এ আয়াতের অর্থ *সূরা আল-আন'আম*-এর ৯৮ নং আয়াতের অনুরূপ।

প্রকৃতপক্ষে, জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত অবাস্তব ও মিথ্যায় পরিপূর্ণ বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং এর প্রয়োগের সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতকে ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। *'একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভবিষ্যতের জ্ঞান সংরক্ষণ করেন'*, এ বিষয়টি কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, অথচ উপরোক্ত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এ

---

[১] আব্দুল্লাহ ইউসূফ 'আলী, *The Holy Quran,* (ইংরেজি অনুবাদ, বৈরুত: দার আল-কুরআন আল-কারীম), ১৭১৪ পৃ.।

[২] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* ১৪৪ পৃ.।

[৩] ইবনু জারীর আত্-ত্বাবারি তাঁর তাফসীর *'জামি' আল-বায়্যানা'ন তা'ভীল আল-কুরআন,* (মিশর: আল-হালাবি পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮), ১৪তম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

www.i-onlinemedia.net

মহাসত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং এ সংক্রান্ত সকল অবাস্তব ও মিথ্যা বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ ও বিশ্বাস করতে সুস্পষ্টভাবে অনেক হাদীছে কঠোরভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও উক্ত সহীহ হাদীসগুলোর বিরোধীরূপে দাঁড়িয়েছে তথাকথিত ভ্রান্ত তাফসীরটি।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্‌র রাসূলের ﷺ সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি শাখার জ্ঞান অর্জন করল, সে যাদুবিদ্যার একটি শাখার জ্ঞান লাভ করল।'[১]

আবু মাহযামও রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মতের জন্য আমি যা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে আশংকা করি তা হলঃ তাদের বিচারকদের নীতিহীনতা, নক্ষত্রের উপরে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক সুনির্ধারিত ভাগ্যকে অস্বীকার করা।'[২]

সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করা এবং এর চর্চা করার ভিত্তি ইসলামে নেই। যে ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত মতবাদকে নিজের স্বপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে বিকৃত করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে, সে-ই মূলত ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অনুসরণ করে। কারণ, ইয়াহুদীরা স্বজ্ঞানে তাওরাতের বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ বিকৃত করেছে।[৩]

---

[১] আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, ৩য় খণ্ড, ১০৯৫ পৃ., হাদীস নং ৩৯৮৬ এবং ইবনু মাজাহ।

[২] ইবনু 'আসাকির কর্তৃক সংগৃহীত। আছ্-ছুয়ূতী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (*তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ*, ৪৪৫ পৃ.।)

[৩] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে *সূরা আন-নিসা*, ৪:৪৭, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:১৩ এবং ৫:৪১ দেখা যেতে পারে।

www.i-onlinemedia.net

রাশিচক্র-ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদুমন্ত্রের ইসলামী বিধান
বিনষ্ট হবে না ঈমান থাকলে সাবধান

রাশিচক্র ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইসলামী হুকুমঃ

তাওহীদ বিরুদ্ধ শির্‌কী ও কুফরী বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভবিষ্যৎ গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যত গণনায় লিপ্তদেরকে এ নিষিদ্ধ চর্চা ত্যাগ করতে উপদেশ দান ছাড়াও ইসলাম তাদের সঙ্গে যেকোন ধরনের সম্পৃক্ততার বিরোধিতা করে। আর, জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা শুধু *হারামই* নয়, বরং জ্যোতিষীর নিকটে গমন করা, তার দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করা, এ সংক্রান্ত বইপত্র ক্রয় অথবা কারো ভাগ্য গণনা করাও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ! জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এ শাস্ত্রের চর্চাকারীরা জ্যোতিষী বলে বিবেচিত হয়। ফলস্বরূপ, কোন ব্যক্তি ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে সে রাসূল ﷺ ঘোষিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

গণকের নিকটে গমন করা

গণকের যেকোন ধরনের দর্শনের ব্যাপারে রাসূল ﷺ সুস্পষ্টভাবে নীতি নির্ধারণ করেছেন। হাফসা (রাঃ) থেকে সাফিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন,

'যদি কেউ কোন গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন ক'রে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহলে ৪০ দিন ও ৪০ রাত পর্যন্ত তার সলাত কবূল হবে না।'[১]

এ হাদীছে বর্ণিত শাস্তি শুধু গণকের নিকটে গমন করে কৌতুহলবশত তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। এ নিষিদ্ধতা আরও সমর্থিত হয়েছে মু'আবিয়া ইবনে আল-হাকাম আস-সালামী বর্ণিত হাদীস দ্বারা। এ হাদীছে মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা গণকের নিকটে যায়। রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, তাদের কাছে যাবে না।'[২]

গণকের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়ার পরেও কেউ তার নিকটে গমন করে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সেজন্য শাস্তির বিধান সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আবার, জ্যোতিষসংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা বা মিথ্যার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ থাকলে, তাহলে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্যরাও অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বলে

---

[১] হাফসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ৪, পৃ. ১২১১, হাদীস নং ৫৫৪০।
[২] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩২।

www.i-onlinemedia.net

সন্দিহান হয়। এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করাও এক প্রকার শির্ক। ফলে, এ ধরনের কঠিন শাস্তির বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে কেবল গণকের নিকট গমনের জন্য, কারণ ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এটাই প্রথম পর্যায়। যদি কেউ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গণকের নিকট গমন করে, আর গণকের কোন ভবিষ্যদ্বাণী সত্যরূপে পরিগণিত হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে গণকের গোঁড়া সমর্থক ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি উৎসাহী বিশ্বাসীতে পরিণত হবে।

গণকের প্রতি বিশ্বাস

অদৃশ্য ও ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে গণক ওয়াকিবহাল এ বিশ্বাসে যদি কেউ গণকের নিকটে গমন করা কুফরী (অবিশ্বাসীদের) কাজ। একইভাবে কোন জ্যোতিষী কর্তৃক প্রদানকৃত হোক অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন বই, পত্র-পত্রিকায় লিখিত হোক কেউ যদি তার জন্য প্রদত্ত রাশিচক্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এর ওপর নির্ভর করে বা এ বিষয়ে শংকাগ্রস্ত হয়, তবে সে সরাসরি কুফরীতে লিপ্ত। কারণ, এ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা এবং আল-হাছান উভয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন, 'যে কেউ গণকের নিকটে গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মাদের ﷺ উপর অবতীর্ণ বিষয়কে অবিশ্বাস করল।'[১]

এ হাদীসটিতে পূর্বে বর্ণিত হাদীছের মতো *গণক* শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, *গণক* ও *জ্যোতিষী* -এরা উভয়ই যেহেতু ভবিষ্যত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বলে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে, তাই উক্ত হাদীসদ্বয় জ্যোতিষীদের জন্য তো বটেই বরং ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবীদার সকল ব্যক্তির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাও সাধারণ গণকের মতো আল্লাহ্‌র তাওহীদকে অস্বীকার করে। জ্যোতিষীদের দাবী, নক্ষত্র দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয় অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের উপরে নক্ষত্রের বিশেষ প্রভাব রয়েছে এবং প্রত্যেকের জীবনে সংঘটিত বা সংঘটিতব্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নক্ষত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর সাধারণ গণকের দাবী এরূপ, কোন কাপের তলায় চায়ের পাতার গঠন অথবা হাতের তালুর রেখার মাধ্যমে অনুরূপ বিষয়াবলীর প্রকাশ ঘটে। মাধ্যম ব্যবহারের পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও উভয়ক্ষেত্রেই তারা সৃষ্ট বস্তুর বাহ্যিক গঠন-বিন্যাসের বিচিত্রতায় অদৃশ্য প্রকাশ করার দাবী করে থাকে।

ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষার সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস ও রাশিচক্র পরীক্ষা করার সুস্পষ্ট বিরোধিতা রয়েছে। এ সব পথ খুঁজে বেড়ানো আত্মা আদতে সেই শূন্য আত্মার মতো যা প্রকৃত ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত

---

[১] *আবূ দাঊদ* কর্তৃক সংগৃহীত, *সুনান আবি দাউদ*, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৫, হাদীস নং ৩৮৯৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ২/৪২৯; বায়হাক্বী; আলবানী, *সাহীহুত তারগীব*, ৩/৯৭-৯৮।

www.i-onlinemedia.net

ভাগ্য থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস বৈ এ সব পথ আর কিছু নয়। অজ্ঞ লোকদের বিশ্বাস এ রকম যে, আগামীকাল কী ঘটবে তা জানতে পারলে, আজকেই তার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সম্ভাব্য দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে কল্যাণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

এ ধরনের বিশ্বাস দ্বারা অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র জ্ঞান রাখার মতো গুণাবলীকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়। ফলস্বরূপ তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাওহীদের এ ক্ষেত্রে শির্কের সূচনা হয়। অর্থাৎ কেউ কোন জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, পীর, ফকীর, সাধু, দরবেশ ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবীদারকে সত্যই 'গাইবী' বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করলে শির্ক আকবার সংঘটিত হয়।

গণকদের লেখা বই, পত্র-পত্রিকা বা গবেষণা-পত্র পড়া এবং তাদের অনুষ্ঠান রেডিওতে শ্রবণ করা বা টিভিতে দেখা ইত্যাদির মধ্যে সাদৃশ্যতা বিরাজমান থাকায় এ সব কর্মকাণ্ড কুফরীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত[১]; কারণ ভবিষ্যৎবক্তারা তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচার ও প্রসারে বিংশ শতাব্দিতে এ মাধ্যমগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, এমনকি রাসূলও না।

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ... ﴿٥٩﴾﴾ (سورة المائدة: ٥٩)

'সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না...।'

[সূরা আল-মায়িদা (৬): ৫৯]

তারপর তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন,

﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ... ﴿١٨٨﴾﴾

(سورة الأعراف: ١٨٨)

---

[১] কেউ যদি গণকদের বিরোধিতা, মোকাবেলা তথা তাদের বিভ্রান্তিকে যথাযথভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এগুলোর কিছু পড়ে বা শোনে এবং সে নিজে যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, গোপন বা গাইবী জ্ঞান ও ভাগ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, অন্য কেউ তা জানে না বা জানতে পারে না অর্থাৎ সে যদি খাঁটি তাওহীদে অটল বিশ্বাসী হয়, তাহলে এমতাবস্থায় তা কুফরী বলে গণ্য হবে কি না- এ বিষয়ে সাল্‌ফে-সালেহীনদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশের মত হচ্ছে যে, একমাত্র মোকাবেলা ও প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নিতান্ত প্রয়োজনে ও প্রয়োজনানুপাতে তা পড়া বা জানা কুফরী বলে গণ্য হবে না, যদি সে নিজে খাঁটি তাওহীদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয় এবং তার এ যৎসামান্য জানা শোনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় দ্বীন ইসলামের সংরক্ষণ। তবে এ উদ্দেশ্য ব্যতীত কৌতুহলবশত প্রশ্ন করা কঠিন পাপ ও শির্ক আসগর।

www.i-onlinemedia.net

'বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে নিজের জন্য অনেক বেশি ফায়দা হাসিল করে নিতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না...।' [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৮৮]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন:

﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ...

﴿٦٥﴾ (سورة النمل: ٦٥)

'আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ্ ছাড়া...।' [সূরা আন্-নামাল (২৭): ৬৫]

অতএব, ভবিষ্যৎবক্তা, গণক এবং অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত নানা রকম পন্থা বা পদ্ধতিসমূহ মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। হস্তরেখা গণনা, ভাগ্য গণনার মাধ্যম আই চিং, সাফল্যের বিস্কুট বা কেক ও চায়ের পাতার পাশাপাশি রাশিচক্র ও *'Bio-rhythm'* নামক কম্পিউটার প্রোগ্রাম- এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকজনের দাবী অনুযায়ী, এ সব উপায়সমূহ তাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানাতে পারে। যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র তিনিই অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন:

﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾ (سورة لقمان: ٣٤)

'কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জরায়ুতে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন্ জায়গায় সে মরবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত।' [সূরা আল-লুকমান (৩১): ৩৪]

সে কারণেই সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার দাবীদারেরা এ সকল ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। অতএব, রাশিচক্রের প্রতি বিশ্বাস না থাকলেও, রাশিচক্রের চিহ্নবিশিষ্ট আংটি, গলার হার (চেইন) ইত্যাদি অলংকার বা অন্যান্য কিছু ব্যবহার করা উচিত নয়। কুফর আগমনের সকল পথের শাখা-প্রশাখাকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে হবে, যাতে ভ্রান্ত পথসমূহের কোন আলামতের লেশ মাত্র না থাকে।

www.i-onlinemedia.net

একমাত্র আল্লাহ্‌র তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিমের জন্য তার রাশিচক্রের প্রতীক সম্পর্কে অনুমান করা বা 'আমার রাশি কী?'- এ ধরনের প্রশ্ন করা কখনো উচিত হবে না। সংবাদপত্র বা পত্রিকা-সাময়িকীতে প্রকাশিত রাশিচক্রের কলাম পড়া বা কাউকে পড়তে শ্রবণ করা কোন নর-নারীর জন্য উচিত নয়। আর কোন ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে নির্ভরশীল হলে তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে ইসলামের মূল বিশ্বাসের দিকে ফিরে এসে নিজের বিশ্বাসকে নবায়ন করতে হবে।

ফলে, মুসলিমদের অবশ্যই বই-পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির পাশাপাশি সে সব লোকদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যারা বিভিন্ন উপায়ে দাবী করে যে তারা ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। উদাহরণস্বরূপ, কোন মুসলিম আবহাওয়াবিদ কর্তৃক আগামীকালের বৃষ্টি, তুষারপাত বা আবহাওয়ার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে প্রচার করার সময় *'ইনশাআল্লাহ্'* (আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন) শব্দসমষ্টি যোগ করা উচিত। অনুরূপভাবে, কোন মুসলিম ডাক্তার যখন তার কোন রোগীকে জানায় যে, সে নয় মাসের মধ্যে অমুক দিনে একটি সন্তান প্রসব করবে- এ ক্ষেত্রেও *'ইনশাআল্লাহ্'* বলতে সচেতন হওয়া উচিত। কারণ, এ ধরনের বর্ণনা শুধু ধারণাভিত্তিক পরিসংখ্যান বৈ আর কিছুই নয়।

যাদুমন্ত্র সম্পর্কে ইসলামী হুকুমঃ

যাদুমন্ত্র চর্চা এবং এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকে ইসলামে যেহেতু কুফর (অবিশ্বাস) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তাই যে ব্যক্তি যাদুমন্ত্র চর্চা করবে তার জন্য শারি'আতে (ইসলামী আইন) খুব কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। যাদুমন্ত্র চর্চাকারী ব্যক্তি আটক হওয়ার পর সে যদি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তা চর্চা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই তার জন্য একমাত্র শাস্তি। এ আইনটি মূলত যুনদুব ইবনু কা'ব (রাঃ) কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীছে রাসূল (ﷺ) বলেন,

«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»

'তরবারির আঘাতে হত্যা করাই যাদুকরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি।'[১]

---

[১] ইমাম *বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর,* ২/২২২; *দারাকুতনী; বায়হাক্বী,* ৮/১৩৬; ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* ৪/১৯/১,২; *তিরমিযি, 'দণ্ড' অধ্যায়, হা/১৩৮০*। তিনি হাদীসটিকে মারফূভাবে উল্লেখ করে মওকূফ হিসেবে বিশুদ্ধ বলেছেন। মূলত হাদীসটি যঈফ হলেও এ হাদীছের সমর্থনে আরও হাদীস থাকার কারণে এর সনদ *হাসান* (সহীহ হাদীছের কাছাকাছি) পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন: ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ উছায়মিন প্রণীত *কিতাবুত-তাওহীদের তাখরীজ 'আদ-দুররুন নাযীদ',* (দারু ইবনু খুযায়মাহ), পৃ. ৮৭) উঁচু পর্যায়ের চারজন আইনবিদের মধ্যে তিনজনই (আহমাদ, আবু হানীফা এবং মালিক) এ অনুসারেই আইন প্রণয়ন করেছেন। চতুর্থ আইনবিদ আশ-শাফী'-এর আইন অনুসারে, একজন যাদুকরকে শুধু তখনই হত্যা করতে হবে যদি তার যাদুমন্ত্র কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে। (*তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* ৩৯০-৩০১ পৃ. দেখুন)

www.i-onlinemedia.net

রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর মুসলিম জাতিকে পরিচালনাকারী খলিফাগণ ইসলামের এ বিধানকে খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন। বাজ্জালা ইবনু 'আবদাহ বর্ণনা করেন, 'মা, মেয়ে ও বোনদেরকে বিবাহকারী সকল জোরাষ্ট্রিয়ানদের বিবাহকে বাতিল করে দেয়ার আদেশসহ জায ইবনু মু'আবিয়া-এর নিকট প্রেরিত পত্রে খলীফা 'উমার ইবনু আল-খাত্তাব (রাঃ) রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় নিযুক্ত মুসলিম বাহিনীর নিকটে এই বলে আদেশ করেন যে, জোরাস্ট্রিয়ানদেরকে *আহ্ল আল-কিতাবদের*[১] অন্তর্ভুক্ত করতে মুসলিম বাহিনীরা যেন জোরাস্ট্রিয়ানদের দেয়া খাবার খায় এবং সমস্ত জ্যোতিষ ও যাদুকরদের খতম করে দেয়। বাজ্জালা (রাঃ) বলেন যে, উক্ত আদেশের ভিত্তিতে তিনি নিজেই একদিনে তিনটি যাদুকরকে হত্যা করেছিলেন।[২]

মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রাহমান বর্ণনা করেন, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাঃ)-কে তাঁর কৃতদাসী যাদু করলে তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[৩]

আজ অবধি তাওরাতে এ শাস্তির বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়, যা দ্বারা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের জন্য যাদুমন্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে: 'যেসব পুরুষ বা স্ত্রীলোক প্রেতাত্মার মাধ্যম বা যাদুকর হয়, তাদের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পাথর ছুঁড়ে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। নিজেদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।'[৪]

প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব যে, তারা যাদুর সকল প্রকার থেকে সাবধান থাকবে এবং এ বিধান প্রচারে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং এ গর্হিত কাজের বিরোধীতা করবে, যেমন ইমামগণ বলেছেন যে, যখনই কোন যাদুকর কোন নগরীতে প্রবেশ করবে তখনই সেখানে অশান্তি, অত্যাচার সীমলংঘন এবং সন্ত্রাস বিরাজ করবে।

অভ্রান্ত ও নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী খলিফাদের পর আইন-কানুন শিথিল হয়ে পড়ে। জ্যোতিষ ও যাদুকরদেরকে উমাইয়া খলিফারা তাদের এ সব নিষিদ্ধ কর্মের অনুমতি প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদেরকে রাজদরবারে সম্মানিত আসনে আসীন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ আইন প্রয়োগ স্থগিত করার ফলে সে সময় বেঁচে থাকা কতিপয় সাহাবী নিজেরাই এ আইন প্রয়োগের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। আবু 'উছমান ইবনু 'আব্দুল মালিক আন-নাহ্দি বর্ণনা করেন, একটি লোককে খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনু 'আবদিল-মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫) তাঁর দরবারে নিয়োগ করেন

---

[১] ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো যারা অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করে। বর্ণনাটির এ অংশটুকু *বুখারী, তিরমিযি* এবং *নাসাঈ* কর্তৃক সংগৃহীত।

[২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৫৬; সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ২৬৪৬, ৩০৪৩; মুসনাদ আহমাদ, ১/১৯০,১৯১; হা/১৫৬৯ এবং *আল-বায়হাক্বী*।

[৩] উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাঃ) ছিলেন 'রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী এবং 'উমার (রাঃ)-এর মেয়ে। *মাসায়েলে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ*, মাস'আলা নং ১৫৪৩; *মুওয়াত্তা ইমাম মালিক*, ৩৪৪-৩৪৫ পৃ., হাদীস নং ১৫১১, ৮৭২; *বায়হাক্বী*, ৮/১৩৬। আছারটি সহীহ্। বিস্তারিত দ্র: *আদ-দুররুন নাযীদ*, পৃ. ৮৬।

[৪] লেবীয়: ৪: ২০: ২৭

www.i-onlinemedia.net

যার কাজ ছিল যাদুর কৃতিত্ব প্রদর্শন করা। একদিন এ যাদুকরটি এক লোকের মাথা কেটে শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তার এ কৃতিত্বে দর্শকরা হঠাৎ চমকিত হয়ে পড়লে সে আবার মাথাটি যথাস্থানে পুনঃসংযোগ করে সবাইকে আরও হতচকিত করে ফেলল। তারপর যে লোকটির মাথা কাটা হয়েছিল তাকে এমন দেখা গেল যেন তার মাথা কখনো কাটাই হয়নি। লোকজন বিস্মিত হয়ে বলল, 'সুবহ্‌ানাল্লাহ (মহাপবিত্র আল্লাহ্)! সে মৃতদের জীবন দিতে সক্ষম।' আল-ওয়ালিদের দরবারে প্রচণ্ড হট্টগোল দেখে যুনদুব আল-আযদি নামে এক সাহাবী এগিয়ে এসে যাদুকরের কৃতিত্ব অবলোকন করলেন। তার পরদিন, আল-ওয়ালিদের দরবারে পিঠে তরবারি বেঁধে যুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার প্রবেশ করলেন। যাদু প্রদর্শনের জন্য যাদুকরটি এগিয়ে আসলে যুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর তরবারি খুলে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে যাদুকরের মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর বিস্ময়াহত দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, 'সে যদি সত্যিই মৃতব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়, তাহলে সে তার নিজের প্রাণ ফেরৎ আনুক।' আল-ওয়ালিদ তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[১]

একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলীকে জ্যোতিষী বা যাদুকরের উপর আরোপ করার মাধ্যমে মানুষ যেন *তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*-এ শির্‌ক না করে, সে কারণেই জ্যোতিষী বা যাদুকরদের উপর ইসলামের আইন প্রয়োগে এ কঠোরতা। অধিকন্তু, কেবল ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেই নয়, বরং ডাকিনীবিদ্যা বা যাদুবিদ্যা চর্চাকারীরা অপরিসীম খ্যাতি অর্জন ও সমর্থকদেরকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তারা প্রায়ই নিজেদেরকে অলৌকিক শক্তি ও স্রষ্টার গুণাবলীর অধিকারী বলে দাবী করে থাকে।

[১] ইমাম বুখারী তাঁর *ইতিহাস*গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন।

www.i-onlinemedia.net

করলে শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস বিধ্বংস হবে ঈমান, হবে সর্বনাশ

বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন বস্তু, স্থান, শব্দ বা সংকেতকে পছন্দ করা বা না করা মানুষের মানবীয় স্বভাব। এটা দোষের কিছু নয়, তবে ভালকে নিশ্চিতভাবে ভাল বা কল্যাণকর এবং মন্দ বা অকল্যাণকর বলে জানতে হলে কিংবা তাতে বিশ্বাস বা পছন্দ বা অপছন্দ করতে হলে শরী'য়াতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। যেমন, শরী'য়াত কর্তৃক যদি কোন কিছুর ভাল-মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন 'আলামত' বা 'সংকেত' বর্ণিত থাকে তাহলে অবশ্যই তা বিশ্বাস করতে হবে। তাওহীদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে শির্কের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ বিধানটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন, 'অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক।'[১]

পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে প্রাক-ইসলামি যুগে বসবাসকারী আরব দেশের লোকেরা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের আলামত বলে গণ্য করত এবং তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া এ সব আলামতকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শুভ বা অশুভ আলামত নির্ধারণের চর্চাকে আরবীতে *তিয়ারা'* (উড়াল দেয়া) বলা হতো। যেমন, কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যাত্রা শুরু করলে যদি একটি পাখি তার উপর দিয়ে উড়ে বামে চলে যেত, তাহলে সে ভাবত যে তার দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী; ফলে সে পুনরায় ঘরে ফিরে যেত। ইসলাম এ ধরনের সকল কুপ্রথাকে বাতিল করেছে, কারণ এগুলো তাওহীদ আল-'ইবাদাত ও তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত এর ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দেয়।

১.'নির্ভরশীলতা' (তাওয়াক্কুল) নামক 'ইবাদাতকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে।

২.আসন্ন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করার ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির উপরে আরোপ করে।

রাসূলের (ﷺ)-এর নাতি আল-হুসাইন (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উপর ভিত্তি করেই *তিয়ারা'*র নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

---

[১] *তিরমিযি, আস-সুনান, ৪/১৬০; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ১৩/৪৯১; হাকীম, আল-মুসতাদরাক, ১/৬৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৪/১৭; আবূ দাউদ, ৩/১০৯৬-১০৯৭; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ২/১১৭০। তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, ইমাম হাকিম প্রমুখ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

www.i-onlinemedia.net

'যে ব্যক্তি শুভাশুভ নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, সে আমাদের দলভুক্ত (আমার উম্মাত) নয়।'[১]

এখানে 'আমাদের' বলতে ইসলামের জাতি তথা মুসলিম জাতিকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং *'শুভাশুভ নির্ণয়'* এমন ধরনের কাজ যা কাউকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়। মু'আবিয়া ইবনে আল-হাকাম বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে রাসূল (ﷺ) *অশুভ আলামত*-এর প্রভাবকে বাতিল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

"রাসূল (ﷺ)-কে মু'আবিয়া বলেন, 'আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা পাখির শুভ-অশুভ আলামতকে অনুসরণ করে।' রাসূল (ﷺ) প্রত্যুত্তরে বললেন, 'এ সবই তোমাদের নিজেদের তৈরি, অতএব এগুলো যেন তোমাদেরকে না থামিয়ে দেয়।'[২]

অর্থাৎ এ শুভ-অশুভ আলামতগুলো যেহেতু মানুষের কল্পিত ও বানানো তথা অবাস্তব ধারণা, অতএব তোমরা যা করতে চাও তা করতে এটা যেন বাধা প্রদান না করে। এভাবেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহামান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা পাখিদের গতিপথকে কোনকিছুর আলামত হিসেবে তৈরি করেননি। এমনকি, পাখির উড্ডয়নের ফলেই ঘটনা সংঘটিত হয়, এ প্রাক-ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে কোন ঘটনার কিছু মিল বাহ্যিকভাবে দৃষ্টমান হলেও এদের উড্ডয়নের গতিপথের কারণে কোন প্রকার সফলতা বা দুর্দশার সৃষ্টি হয় না।

পাখির আলামতের উপরে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীরা (رضي الله عنهم) নিজেদের এবং তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে যখনই কেউ ইতিবাচক বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করেছেন, তৎক্ষণাৎই তা কঠোরভাবে বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে। যেমন, ইকরামাহ (رضي الله عنه) বলেন, 'একদিন আমরা যখন ইবনে 'আব্বাসের (رضي الله عنه) সাথে বসেছিলাম তখন একটি পাখি উগ্র শব্দ করতে করতে আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল। এ সময় দলের মধ্যে থেকে একজন অকস্মাৎ চিৎকার করে বলল, 'শুভ! শুভ!'। ইবনে 'আব্বাস (رضي الله عنه) তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বললেন, এটাতে শুভ বা অশুভ বলতে কিছুই নেই।"[৩] একইভাবে, তাবিঈরাও (সাহাবীদের অনুসারী বা ছাত্রগণ) তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিম ছাত্রগণ তথা তাঁদের নিজেদের কর্তৃক প্রকাশিত (কথায়, লেখায় ও আচরণে) শুভাশুভ সংক্রান্ত সকল ধরনের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাউছ যখন তাঁর এক বন্ধুর সাথে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন তখন একটি কাঁক উগ্র চিৎকার করে উড়ে গেলে তাঁর বন্ধু বলল, শুভ! তাউছ প্রত্যুত্তরে বলেন, এটার মধ্যে তুমি কী শুভ দেখলে? তুমি আর আমার সাথে ভ্রমণ করো না।'[৪]

---

[১] *তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত। হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫/১১৭। হাদীসটি সহীহ।*

[২] *মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩২।*

[৩] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪২৮।*

[৪] *প্রাগুক্ত।*

www.i-onlinemedia.net

প্রাচীনকালে আরবের জনগণ যেখানে পাখির গতিবিধি হতে শুভ-অশুভ আলামত গ্রহণ করেছে, সেখানে অন্যান্য জাতি এটা গ্রহণ করেছে ভিন্ন ধরনের উৎসমূল হতে। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে তারা সকলে অভিন্ন মূলনীতির অনুসারী। এ শুভ-অশুভ আলামতের উৎসমূলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শির্কই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।[১] নিম্নবর্ণিত শুভ-অশুভ আলামতগুলো আমাদের বর্তমান সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বিশুদ্ধ আক্বীদা বিরুদ্ধ অসংখ্য শুভ-অশুভ আলামত থেকে হাতেগোনা কয়েকটি। এগুলোকে শুনতে বাহ্যত কুসংস্কারের মতোই মনে হয়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও বস্তুর উপকার ও অপকারের ধারণা থাকায় মানুষের মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা শির্কে আকবার বা শির্কে আসগারে পরিণত হতে পারে।

ইসলাম ও কুসংস্কার:

ইসলাম এবং কুসংস্কার পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে যেখানে ইসলাম নেই, সেখানে অবশ্যই কুসংস্কার আছে। আর যেখানে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম আছে সেখানে কুসংস্কার নেই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবদের সংস্কারের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। বস্তুনিষ্ঠ-চিন্তা-চেতনা ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার বিস্তার করেছে ইসলাম। ইসলামের পরশ পেয়েই কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাহিলরা সংস্কৃত হয়ে বিশুদ্ধ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। ঘুচে গেছে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের যাবতীয় কুয়াশাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত অন্ধকার। তারা পথ দেখেছে সত্য ও বাস্তবের এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের। ইসলামের উজ্জ্বল আলোয় তারা নিজেরা যেমন আলোকিত হয়েছে তেমনি সারা জগতকেও আলোকিত করেছে। ইসলামের আলো এসে পড়েছে আমাদের বাংলাদেশেও। কিন্তু এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম জনগণ কুসংস্কার মুক্ত হতে পারেনি।[২] অজস্র কুসংস্কার নিয়েই বাংলাদেশী মুসলিমদের জীবন। কুসংস্কার ভিন্ন যেন তাদের কোন গতি নেই। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বাঙ্গালী মুসলিমদের জীবনাচরণ থেকে নেয়া কিছু শির্কযুক্ত কুসংস্কারের তালিকা দেয়া হল:

- *বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে রোগ-ব্যাধি নিয়ে নানা কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে। সব সমাজেই রোগ-শোক নিয়ে হয়তো কিছু না কিছু কুসংস্কার থাকে কিন্তু আমাদের দেশে এর প্রভাব যেন একটু বেশি রয়েছে। এখানকার মুসলিমরা রোগের কার্যকারণ বা রোগ উৎপত্তির মূল কারণ খুঁজতে যায় না। প্রকৃত বিষয়ের*

[১] *ড. আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স, 'তাওহীদের মূল নীতিমালা', ভাষান্তর: ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৯৪- ৯৫।*

[২] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে, দেখুন, ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী রচিত *'শির্ক কী ও কেন?'* গ্রন্থটির ২২৯-২২৭ পৃষ্ঠা। (পরিবেশনায়: তাওহীদ পাবলিকেশন্স)

www.i-onlinemedia.net

প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তারা সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে রোগের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে থাকে। স্বাভাবিক চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন তা না করে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আবর্তে থেকে তারা এমন সব আচরণ করে যা সত্যিই হাস্যকর বলেই প্রতীয়মান হয়। হাতে গোনা দু'-চারটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হল:

১. সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম হওয়ার ভয়ে স্ত্রী গর্ভবতী থাকাবস্থায় গরু বা ছাগল যবাই করা থেকে বিরত থাকা।

২. জমজ কলা খেলে জোড়া বাচ্চা হবে বলে ধারণা করা।

৩. পেট ব্যথা হলে তা নিবারিত হওয়ার আশায় বিরিয়ানী রান্না করে তিন রাস্তার মাথায় একটি পাত্রের মাঝে কিছু খাবার রেখে আসা।

- *বিবাহ মানব সমাজের একটি অতি প্রাচীনতম প্রথা প্রতিষ্ঠান। কালে কালে এ বিবাহকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানাবিধ ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি ও সংস্কার। আর মুসলিমদের পবিত্র বিয়ে আজ বিধর্মীদের নানা শিরকযুক্ত কুসংস্কারে ভরে গেছে। বিবাহ ও নারীদেরকে নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কারের কিছু নমুনা তুলে ধরা হল:*

১. বাংলা বর্ষ পঞ্জিকার বর্ণনানুযায়ী, সপ্তাহের শনিবার, মঙ্গলবার ও আমাবশ্যার দিনকে অশুভ মনে করে এ দিনগুলোতে কোন ভ্রমণ না করা এবং তাতে কোন বিবাহ অনুষ্ঠান না করা।

২. অনেকেই পৌষ মাসে বিয়ে করে না। এ মাসের বিয়েতে নাকি মা-বাবার অমঙ্গল হয়। পৌষ মাসকে মনে করা হয় পোড়া মাস। তাই এ মাসে বিয়ে হলে নাকি সুখ-সম্পদ সব পুড়ে যায়।

৩. অনেকেই জন্মগ্রহণের মাসে বিয়ে করে না, তাতে নাকি অমঙ্গল হয়।

৪. বিয়ের দিন বৃষ্টি হলে নাকি কনের বাবার অমঙ্গল হয় আর বরের বাবার মঙ্গল হয় এবং এটা নববধূর জন্য একটা সুলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিয়েতে বৃষ্টি হলে নাকি মেয়ে বাপের সব রস (ধন) নিয়ে যায় স্বামীর ঘরে। পোড়া খাবার খেলেই নাকি বিয়েতে বৃষ্টি হয়। সে কারণে কুমারী কন্যাকে বাবা-মা পোড়া খাবার খেতে দেন না।

৫. দাম্পত্য সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কেউ কেউ বরের বাড়ী প্রবেশ করার আগেই সেই বাড়ীর চৌকাঠে রশি বেঁধে দিয়ে আসে। এ কাজ করলে নাকি স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন দীর্ঘদীন অটুট থাকে।

৬. অনেকে গর্ভবতী নারীকে ভরদুপুরে ও সন্ধ্যায় ঘরের বের হতে দেয় না। তাদের মতে, ঐ সময়ে বাইরে গেলে অকল্যাণ হয়। গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিংবা হতে পারে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ। কিংবা ধরতে পারে জ্বিন-ভূতে।

৭. বন্ধ্যা মেয়েলোক দেখলে নানা অকল্যাণ হয়, এমন অদ্ভুত ধারণা আমাদের অনেকের আছে। আমরা মনে করি, তাতে আমাদের যাত্রা শুভ হয় না বা

www.i-onlinemedia.net

কার্যসিদ্ধি হয় না। অনেকে বন্ধ্যা মেয়েলোকের কোলে নিজের সন্তান দিতে চায় না। কারণ তাতে সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে, এ ধরনের আশংকা তারা করে। আবার বন্ধ্যা নারীকে অন্য কোন নারীর বিয়ের দিন দেখতে দেয় না এ ভয়ে যে, ঐ নারীটিও বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

৮. নবজাতকের সম্পর্কে মুসলিমদের কুসংস্কার রয়েছে। সন্তান গর্ভে এলে, জন্মকালীন সময়ে অথবা জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই যদি ঘটনাক্রমে কারও কোন রকম ধনপ্রাপ্তি ঘটে, তখন বলা হয়, 'এই মেয়ে বা ছেলে লক্ষ্মী।' লক্ষ্মী হল হিন্দুদের ধন বা সৌভাগ্যের দেবী। ধন দেখে মুসলিমগণ ভাবে হিন্দুদের দেবী লক্ষ্মী তাদের প্রিয় সন্তানের প্রতিমূর্তিতে এসে হাজির হয়েছে। আর এ সব অবস্থায় দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে বলা হয়, 'এই ছেলে বা মেয়ে অলক্ষ্মী।' এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা নতুন বউ নিয়েও হয়ে থাকে। 'স্ত্রী-ভাগ্যে ধন'- কথাটার প্রচলন এ কুসংস্কার থেকেই হয়েছে।

- *কোন শস্য বা ফলফলাদির গাছ রোপনের সাথে জড়িত রয়েছে নানা কুসংস্কার এবং এ সকল শির্কযুক্ত কুসংস্কারগুলো আমাদের গ্রামীণ জীবনের সাথে মিশে আছে। নিম্নে এ সবের কিছু নমুনা উল্লেখ করা হল:*

১. সোমবার ও শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিনসমূহে কৃষিকাজ আরম্ভ করলে ভাল ফলন হয় না বলে মনে করা।

২. কলার চারা রোপণের পূর্বে ঘরের আঙ্গিনা অতিক্রম করলে কলার ফলন ভাল হয় বলে মনে করা।

৩. কলার চারা রোপণের মুহূর্তে রোপণকারীর মাথায় বেশি ছেলে-মেয়ে হাত রাখলে কলার ফলন ভাল হয় অর্থাৎ কলার কাঁদিতে বেশি কলা হয় বলে ধারণা করা।

৪. কোন কলাগাছের কাঁদি সঠিকভাবে বের না হলে গর্ভবর্তী মহিলার সন্তান প্রসবের সময় সমস্যা হবার আশঙ্কায় তাকে সে কাঁদির কলা খেতে না দেয়া।

৫. কাঁচা মরিচের চারা লাগিয়ে হাতের দ্বারা আগুনের তাপ নেওয়া এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, এতে কাঁচা মরিচ অধিক ঝাল হবে।

৬. হালুয়া বা মিষ্টি খেয়ে কুমড়ার বীজ বপন করলে এতে কুমড়ায় মিষ্টি বেশি হয় বলে ধারণা করা।

- *অনেকে ঘর থেকে বাইরে যাত্রা করার সময় নানা ধরনের কুসংস্কার মেনে চলে। নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল:*

১. যাত্রা পথে পিছন থেকে কেউ ডাকলে খারাপ মনে করা।

২. যাত্রার সময় বিজাতি হিন্দু, খ্রিষ্টান ইত্যাদির মুখ দর্শন করলে অমঙ্গল হয়।

৩. যাত্রার সময় কারও বাসীমুখ দেখলে অযাত্রা লাগে।

www.i-onlinemedia.net

৪. যাত্রাকালে কিছুতে হোঁচট খেলে অমঙ্গল হয়। আপনজনেরা তখন যেতে দেয় না। একটু দাঁড়াতে বলে এবং তারপর কিছুক্ষণ বসে যেতে বলে।
৫. যাত্রা পথে ঝাঁড়ু দেখলে বা মেথর দেখলে, কাল বা খালি কলসি দেখলে, কাক বা অন্য কিছু ডাকলে, কিংবা বিড়াল দেখলে অশুভ আলামত বলে ধারণা করা।
৬. যাত্রার মুহূর্তে কেউ কারো সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না- এ ধরনের বিশ্বাস করা।
৭. ভ্রমণের সময় রাস্তায় কোন বিধবা মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলে বিপদের ভয়ে ভ্রমণ বাতিল করা।
৮. ভ্রমণের প্রাক্কালে গাভি বা কুকুর হাঁচি দিলে এতে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা করবা বা নির্ঘাত মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে বলে বিশ্বাস করা।
৯. যাত্রাকালে কুকুর ডানদিক দিয়ে গেলে মঙ্গল হয় এবং বাঁ-দিক দিয়ে গেলে অমঙ্গল হয়।
১০. ভ্রমণের প্রাক্কালে বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বের হওয়াকে অশুভ বলে মনে করা।
১১. কোন ভাল কাজের উদ্দেশ্যে বের হলে অকল্যাণ হতে পারে এ ভয়ে পিছনের দিকে ফিরে না তাকানো।
১২. কোথাও যাওয়ার সময় শিয়াল বা বনবিড়াল ডান দিক হতে বামে গেলে যাত্রা অশুভ, আর বাম দিক হতে ডান দিকে গেলে যাত্রা অশুভ বলে মনে করা।
১৩. ভ্রমণের সময়ে বা অন্য সময় পেঁচা দেখলে বা এর আওয়াজ শুনলে এটাকে অশুভ মনে করা, ঘর-বাড়ি বিরান হয়ে যাবে বলে ধারণা করা।

- *দিন ও রাতের বিভিন্ন মুহূর্ত বা সময় নিয়েও আমাদের সমাজ রয়েছে নানা বিভ্রান্তিতে, যার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হল:*

১. সুর্যোদয়ের পূর্বে গৃহবধু ঘুম থেকে উঠে ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিয়ে ও বাসি হাড়ি বাসন পরিষ্কার করে ঘরে পানি ছিটিয়ে দিলে ঘরে ভাগ্য লক্ষ্মীর আগমন ঘটে বলে বিশ্বাস করা।
২. সকাল বেলা দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকীতে কিছু বিক্রি করলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে বলে ধারণা করা।
৩. আসরের পর ঘর ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।
৪. সন্ধ্যার আগে উঠান ও ঘর ঝাড় না দিলে সংসারে সবসময় দেনা লেগেই থাকে বলে বিশ্বাস করা।
৫. সন্ধ্যার সময় ঢেকিতে ধান ভানলে গৃহের শান্তি চলে যায়, শিকায় ভাতের হাড়ি-পাতিল ঝুলিয়ে রাখলে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে বলে ধারণা করা।
৬. সন্ধ্যা বা রাত্রিতে লেন-দেন করলে অমঙ্গল হয়।
৭. সন্ধ্যার আগে উঠোন এবং ঘর ঝাড়ু দিলে সবসময় ঋণী থাকতে হয়।
৮. সন্ধ্যার আগে উঠোন এবং ঘর ঝাড়ু দিলে সবসময় ঋণী থাকতে হয়।

www.i-onlinemedia.net

৯. রাতের বেলা কাউকে টাকা দিলে এতে ভাগ্য খারাপ হবে বলে মনে করা।
১০. রাতের বেলা ঘরের চালে বসে পেঁচা ডাকলে এতে বিপদের আশঙ্কাবোধ করা।
১১. গভীর রাতে পেঁচা বা ভর দুপুরে কাক ডাকলে বিপদের আশংকা করা।
১২. রাতের বেলা ঘর হতে বাইরে কুলি ফেললে কিংবা কোন উচ্ছিষ্ট বা এঁটো পানি নিক্ষেপ করলে ঘর-ভিটা শূন্য হয়ে যাবে বলে মনে করা।
১৩. রাত্রিকালে একা একা ভ্রমণ করলে অন্তর কঠিন হয়ে যায়।
১৪. রাত্রে আয়না দেখলে রোগ (কঠিন পীড়া) হয়।
১৫. রাতের বেলা ঝাড়ু দিলে আয় উন্নতি হয় না।
১৬. রাতে নখ কাটা ঠিক নয়।
১৭. চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক কোন কিছু কাটাকাটি করে তাহলে তার সন্তানের অঙ্গহানি ঘটে।
১৮. রাতে হাত-পায়ের আঙ্গুল ফুটালে দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় বলে মনে করা।
১৯. খাওয়ার পর বাসনপত্র ইত্যাদি না ধুলে মানুষ ধন হারায়।

- *আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সময় ও দিনক্ষণের ভালমন্দে বিশ্বাসী। দিন ও মাস সংক্রান্ত কুসংস্কারগুলো হল:*

১. শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ক্ষতি হবে।
২. শনি ও মঙ্গলবার ঝাটা বাঁধলে সংসারে অকল্যাণ ঘটে।
৩. শনি ও মঙ্গলবারে বিয়ে করা বিয়ে করা অশুভ।
৪. রবিবার ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটলে তা বাঁশঝাড়ের জন্য অশুভ বলে বিশ্বাস করা।[১]
৫. সোমবার দিন কেউ মারা গেলে তার জোড়া মেলাবার জন্য একটি পশু জবাই করে দিতে হয়।
৬. সোম ও বুধবারে গোলা হতে ধান বের করা যায় না।
৭. জন্মদিনে বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর হয় না।
৮. মুহার্‌রম, কার্তিক প্রভৃতি মাসে বিয়েশাদী করা অশুভ।
৯. বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে দোকানে মাল বাকী বিক্রি করাকে অশুভ মনে করা।
১০. আষাঢ় মাসের সাড়ে সাত দিন হলে আমাবতী বলে মান্য করতে হয় ও চাষাবাদ করা যায় না।
১১. মুসলিম গৃহস্থগণের অনেকেই পৌষ মাসে তাদের ধানের গোলায় হাত দেয় না, কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ সময়ে গোলা থেকে ধান সরালে নাকি ধন-সম্পদ ফুরিয়ে যায়।

---

[১] *এ ধরণের বিশ্বাসের ফলস্বরূপ বাংলাদেশের অনেক এলাকা যেখানে বাঁশের হাট রয়েছে, সেসব হাটগুলো সাধারণত রবিবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনগুলোতে হয়।*

www.i-onlinemedia.net

১২. নতুন বউকে ভাদ্র মাসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হয় না (কারণ নতুন বছরের পা ভাদ্র মাসে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর জন্য দেখা অকল্যাণকর)।

১৩. ভাদ্র ও পৌষ মাসে মেয়ে লোকের সওয়ারী পাঠানো যায় না।

১৪. আশ্বিন মাস যাবার দিন মুটে বানিয়ে গরুকে গা ধৌত করা শুভ বলে মনে করা ও 'গো ফাল্গুন' বলে মান্য করা।

১৫. নববর্ষ এলে প্রথমদিন অনেকে ভাল খাবার খায়। তাদের ধারণা, পহেলা নববর্ষের প্রথম দিন যদি ভাল খাবার খায়, তাহলে সারা বৎসরই ভাল খেতে পারবে। অন্যথায় সারা বৎসরই খারাপ খেতে হবে।

- *পশু-পাখির সাথে সম্পৃক্ত কুসংস্কার:*

১. কুকুর কাঁদলে রোগ বা মাহামারী আসবে বলে মনে করা।

২. পৃথিবী একটা ষাড়ের শিং-এর উপর রয়েছে, যখনই এটা শিং নাড়া দেয় তখনই ভূমিকম্প হয় বলে বিশ্বাস করা।

৩. কোন বিশেষ পাখি বা কাক ডাকলে এটাকে কোন মেহমান আগমনের পূর্বাভাস বলে মনে করা।

৪. কাক ডাকলে কেউ মারা যাবে বলে বিশ্বাস করা।

৫. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে বলে মনে করা।

৬. কোন প্রাণী বা কোন প্রাণীর ডাককে শুভ বা অশুভ বলে ধারণা করা।

৭. শিয়াল বা বনবিড়ালের ডাক শুনে বাজারের দর কম-বেশি হয় বলে বিশ্বাস করা।

৮. টিকটিকি ডাকলে 'সত্য সত্য' বলে মাটিতে টোকা দেয়া।

৯. মাকড়সা গায়ে উঠলে নতুন পোশাক প্রাপ্তি ঘটে।

১০. পিঁপড়ার মাটি দ্বারা স্তনে প্রলেপ দিলে স্তনের বাত সেরে যায়।

১১. জোনাকী পোকা খাওয়ালে রাতকানা রোগ ভাল হয়।

১২. ঘরে মাকড়সার জাল থাকলে মানুষ গরীব হয়।

১৩. উকুন পেয়ে জীবিত ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

- *লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী সম্পর্কিত কুসংস্কার:*[১]

[১] শুধু হিন্দুদের মধ্যেই নয়, মুসলিমদের মধ্যেও লক্ষ্মী কেন্দ্রীক, লক্ষ্মী ভিত্তিক ও লক্ষ্মীযুক্ত সম্বোধন প্রায়ই শোনা যায়; এমনকি মুসলিমদের লেখায়ও দেখা যায়। হিন্দুরা লক্ষ্মী শব্দ ব্যবহার করেন সঙ্গত কারণে। কারণ, তাদের দেবীর নাম তারা উচ্চারণ করবেনই, এ নাম তাদের লেখালেখিতেও আসবে। লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী সোনা, লক্ষ্মী মেয়ে; এ সব সম্বোধন মুসলিম পরিবারে এত সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা শুনলে মনে হয় 'লক্ষ্মী' শব্দটি হিন্দু-মুসলিম এ দু'জাতির মধ্যে ব্যবহৃত সাধারণ একটি শব্দ। প্রকৃতপক্ষে, এ যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি মুসলিমদের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, মুসলিমদের সংস্কৃতি ভাণ্ডারে কি শব্দের এতই আকাল পড়েছে যে, লক্ষ্মীর বিকল্প কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? যদি না থাকে, তাহলে নাইবা উচ্চারণ করলাম। কিন্তু

www.i-onlinemedia.net

১. কোন মহিলার প্রথম সন্তান মারা গেলে ঐ মহিলাকে অলক্ষ্মী ভেবে অন্য কোন মহিলার বিয়ের আসর দেখতে যেতে না দেয়া এ কারণে যে, ঐ মহিলার কারণে এ নারীরও প্রথম সন্তান মারা যাবে।

২. লক্ষ্মী হারানোর আশংঙ্কায় বাসী (অর্থাৎ সকাল বেলা চুলা ঝাড়ু দেয়ার আগেই) চুলার ছাই কাউকে নিতে না দেওয়া।

৩. বাড়ির খাদ্যদ্রব্যের লক্ষ্মী চলে যাওয়া এবং মৃত আপনজনদের রূহের উপর পানি পড়ে যাওয়ার ভয়ে রাতের বেলা ঘরের অব্যবহৃত পানি বাইরে নিক্ষেপ না করা।

তাই বলে কি লক্ষ্মীর পিছনে ঘুরে জাত-ধর্ম হারাব? মেয়েটি কত ভাল বা ছেলেটি কত ভাল, এমন সম্বোধন করলে কি বাক্য ভুল হয়ে যায়? কি হীনমন্যতা রোগে আমরা ভুগছি!

হিন্দু ধর্ম মতে, লক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুপত্নী। তিনি ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি কমলা, রমা, সৌভাগ্য, শোভা, ইন্দিরা, পদ্মা, পদ্মালয়া প্রভৃতি নামেও হিন্দুরা লক্ষ্মীকে সম্বোধন করে থাকে। লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা। প্যাঁচা তো অশুভের প্রতীক। সমীকরণটা তাহলে কিভাবে হল?

হিন্দুদের মতে, লক্ষ্মীর সুনজরে যারা আছেন, তারা হয় সৎ, শান্ত, সুবোধ ও ধনবান। আর যাদের ওপর লক্ষ্মীর সুনজর নেই অথবা লক্ষ্মী যাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তারা হয় হতভাগা, দুষ্ট, দরিদ্র এবং অশান্ত। এ হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্রীয় বিশ্বাস। এবার বলুন তো, তাদের এ শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আমরা অর্থাৎ মুসলিমরা কি লক্ষ্মীকে দেবতা মেনে তার নাম সব সময় জপ করতে পারি? লক্ষ্মী নাম কি আমরা উপমায় টানতে পারি? যদি আনি, তাহলে আমাদের ঈমান থাকছে কোথায়?

হিন্দুরা লক্ষ্মীর পূজা করেন। দূর্গাপূজার অব্যবহিত পরের পূর্ণিমাকে হিন্দুরা লক্ষ্মী-পূর্ণিমা বলে থাকেন। মুসলিমরা লক্ষ্মী পূজা করেন না, লক্ষ্মী-পূর্ণিমার অনুষ্ঠানও করেন না, কিন্তু লক্ষ্মীর নাম প্রায়ই মুখে নিয়ে ঈমানের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখেন, তা বোধগম্য নয়।

একজন মুসলিমের স্ত্রী অবশ্যই মুসলিম, মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর সন্তানও মুসলিম। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের ছেলে-মেয়ে কেমন করে *'লক্ষ্মী ছেলে'* আর *'লক্ষ্মী মেয়ে'* হয়? মুসলিমের ছেলে-মেয়েরা তাদের মা-বাবাকে *'লক্ষ্মী মা'* বা *'লক্ষ্মী বাবা'* কেমন করে বলতে পারে? পরিবারে পারস্পরিক সম্বোধনের ভাষা যদি এই হয়, তাহলে তাদের ছেলে-মেয়ে কিভাবে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শের অনুসারী হবে? যেখানে লক্ষ্মী সেখানে হিন্দু ধর্ম, সেই সংস্কৃতি, সেই কৃষ্টি, সেই ধর্মের আমেজ ও মেজাজ থাকবেই। যেখানে লক্ষ্মী সেখানে আল্লাহর রহমত তো বর্ষণ হতে পারে না।

লক্ষ্মীর জায়গায় লক্ষ্মী আছেন এবং থাকবেনও তাদের জন্য, যাদের কাছে তিনি পূজিত। আমরা কেন তাকে নিয়ে টানাটানি করি? তিনি তো আমাদের নন। আমাদের ছেলে-মেয়েদের জীবন ও চরিত্র আর তাক্বদীরকে সুন্দর, বরকতময়, পবিত্র ও রহমতের বারিধারায় সিক্ত করার মতো সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন আছেন, তখন কেন বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হই? লক্ষ্মী তো নিজেই স্বাধীন নন, তিনি অন্যের স্ত্রী, তিনি কতটুকু আমাদের দিতে পারেন?

সর্বশক্তিমান আল্লাহ চান তাঁর স্মরণ, তাঁর ইবাদাত, তাঁর কাছে আত্মসমর্পিত বান্দাহ্‌র হৃদয়, তিনি চান করুণার কাঙালদের। তাকে ছেড়ে কেন আমরা বিষ্ণুর স্ত্রীকে সৌভাগ্যের মালিক মনে করি? কেন আমরা লক্ষ্মীর নাম জপ করি? এমন আত্মভোলা ও পরের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্তদের নাম যতই ইসলামী হোক না কেন, ইসলমের নজরে ওরা শুধু জাহেল মূর্খই নয়, ওরা মুনাফিক এবং ইসলামের দুশমন। ওরা লক্ষ্মীর অনুসারী, আল্লাহর রহমত পাবার অযোগ্য। যারা না জেনে, বেখেয়ালে *লক্ষ্মী*কে কথায় ও লেখায় আনেন, তাদের তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্মী পূজা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

www.i-onlinemedia.net

৪. গালে হাত দিয়ে বসলে ঘরে/পরিবারে অলক্ষ্মী আসে বলে ধারণা করা।
৫. বড় গ্রাসে খানা খেলে লক্ষ্মী ভয় পেয়ে যায় বলে মনে করা।
৬. ঘরের চালা হতে খড় নিয়ে খেলাল করলে অলক্ষ্মী আসে বলে ধারণা করা।
৭. অনেকেই হিন্দুদের মতো লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীতে বিশ্বাস করে, কোন ব্যক্তি বা তার কোন কাজের সাথে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা। এ জন্য বিয়ে বাড়িতে দেবী লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা আঁকে যেন এই পায়ের ছাপে পা ফেলে ঘরে লক্ষ্মী আসে।
৮. ভাঙা বাসনে খাওয়া-দাওয়া করলে অলক্ষ্মী ঘরে আসে।
৯. ভাঙ্গা হাড়িতে রান্না করলে এবং ভাঙ্গা বাসনে খেলে অলক্ষ্মী আসার কারণে তাড়াতাড়ি সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ধারণা করা।
১০. ঘরের বেড়ায়/দেয়ালে কিংবা দরজার সামনে পানের পিক ফেললে ঘরে অলক্ষ্মী এসে বাসা বাঁধে বলে ধারণা করা।
১১. ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘরের দরজায় ময়লা ফেললে, ঘরের দরজায় কুলি ফেললে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায় ও সংসারে বিশৃংখলা হয় বলে ধারণা করা।
১২. সরাসরি চুলার থেকে খেলে বা ঘরের দরজায় বসে খেলে লক্ষ্মী চলে যাবে বলে বিশ্বাস করা।

- *মানুষের অভাব-দারিদ্রতা বা সম্পদ, টাকা-পয়সা হারানোর কারণ সম্পর্কিত আরও কিছু কুসংস্কার:*

১. খাওয়ার পর মাথায় হাত ঘষলে আয় কমে যায়।
২. দাঁত দিয়ে নখ কাটলে উন্নতি করা যায় না।
৩. ছেঁড়া জামা-কাপড় গায়ে রেখে সেলাই করলে টাকা হারায়।
৪. খাওয়ার পর পরনের কাপড় দিয়ে মুখ মুছলে অভাব দূর হয় না।
৫. গবাদি পশুকে লাথি মারলে জীবনে অমঙ্গল হয়।
৬. রাতের বেলা এঁটো পানি বা উচ্ছিষ্ট বাইরে ফেললে দারিদ্রতা আসে।
৭. হেঁটে হেঁটে দাঁত মাজলে সম্পদ চলে যায়।
৮. গামছায় বেঁধে বাজারের সওদা আনলে অভাব চিরকাল থেকে যায়।
৯. ঘরের বেড়ায় কিংবা দরজার সামনে পানের পিক ফেললে অভাব দেখা দেয়।
১০. কুলায় লাথি মারলে ক্ষেতের ফসল কমে যায়।
১১. বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নতুন বউয়ের পিতার বাড়ী থেকে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে কিছু চাউল এনে তা স্বামীর বাড়ীর গুদামে ছিটিয়ে দেয়া।
১২. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে ঐ ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে বলে ধারণা করা।
১৩. ভোঁতা দা, কাস্তে ও যন্ত্রপাতি দ্বারা কাজ করলে সবসময় দেনা লেগে থাকে বলে মনে করা।

www.i-onlinemedia.net

১৪. জামা-কাপড় গায়ে পরা অবস্থায় সেলাই করলে টাকা খোয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা।
১৫. নাক ও কপালে ফোঁড়া হলে নাকি ধন আসে।
১৬. কপালের উপর হাত রেখে শুলে বা ঘুমালে নাকি অমঙ্গল হয়।
১৭. স্বামীর নাম মুখে নিলে অমঙ্গল হয়।
১৮. ছেঁড়া কাপড় ঘরে রাখলে সম্পদ হারিয়ে যায়।
১৯. ভাঙা পাতিলে রান্না করলে মানুষ গরীব হয়ে যায়।
২০. ঘরের সামনে কুলি ফেললে অমঙল হয়।
২১. ঘর ঝাড়ু দিয়ে আবর্জনা ঘরে রেখে দিলে সম্পদ হারায়।

- *গরীব হওয়ার আরও কিছু কারণ সম্পর্কিত কুসংস্কার:*

১. হাত না ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে।
২. ফুঁ দিয়ে বাতি নিভালে।
৩. ভাঙা চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়ালে।
৪. সন্ধ্যায় ঘরে আলো না জ্বালালে।
৫. ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে বসলে।
৬. হাঁটতে হাঁটতে দাঁত খেলাল করলে।
৭. হেঁটে হেঁটে খাদ্য খেলে মানুষ গরীব হয়।
৮. বুধবার ও রবিবার রাত্রে স্ত্রী সহবাস করলে।
৯. পুকুরে প্রস্রাব করলে।
১০. উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে।
১১. খালি মাথায় আহার করলে।
১২. বিনা দাওয়াতে কারও বাড়ীতে আহার করলে।
১৩. কাপড় দ্বারা দাঁত পরিস্কার করলে।
১৪. খারাপ কথা বলে সম্মানী লোকের মান নষ্ট করলে।
১৫. পরিবারের স্ত্রীলোককে বেপর্দায় রাখলে।
১৬. ফলবান বৃক্ষের নিচে পায়খানা-প্রস্রাব করলে।

- *আরও কিছু কুসংস্কার:*

১. নবজাতকের মুখে বা দেহের অন্যত্র চর্মরোগ জাতীয় গোটাগাটি হলে এ সবকে মানুষ মুখ দোষের গোটা বলে। আসলে বাচ্চাদের নানা রকম চর্মরোগ হয়। তবে এ সব কারও চোখের দৃষ্টি বা মুখদোষের কারণে হয় না। গ্রীষ্মকালে এ সব অসুখ বেশি দেখা দেয়। হাম ইত্যাদি জাতের অসুখ বাচ্চাদের হয়েই থাকে। টিকা দিলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আর সে-সব হয় না। যেসব বাচ্চার চেহারা সুন্দর ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে সে সব বাচ্চার মায়েরা মুখ দোষ বা অশুভদৃষ্টি থেকে বাচ্চা রক্ষা করার জন্য কপালের পাশে মাথায়

www.i-onlinemedia.net

একটি বড় কাজলের ফোঁটা দিয়ে রাখে। প্রশ্ন ওঠে, মুখদোষ বা দৃষ্টিদোষ কি কেবল ছোটদের লাগে? সেটা তো বড়দেরও লাগতে পারে। তাহলে বাচ্চার মা'কেই আগে লাগাতে হয় ফোঁটা। কারণ, তার দিকেই তো মানুষ বেশি আগ্রহ নিয়ে তাকাবে। আবার অনেকেই অন্যদের দৃষ্টির আড়াল করে রাখে বাচ্চাদের।

২. মাথা ব্যাথা হলে সূর্যকে সালাম জানালে নাকি তা সেরে যায়। সূর্যকে নমস্কার জানায় হিন্দুরা। তারা সূর্যকে দেবতা মনে করে এবং সূর্য দেবতা উদয়ের দিকে মুখ করে উপাসনা করে। এ কারণে সূর্যকে নমস্কার জানালে হয়ত হিন্দুদের মাথা ব্যাথা, পেট ব্যাথা, কোমর ব্যাথা প্রভৃতি ভাল হতে পারে। কিন্তু মুসলমানের তাতে কোনটাই হবে না।

৩. অনেকেই পেটের পীড়ায় অমলিশ সেবন করে। পেটে আম বেড়ে গেলে বা আমাশয় দেখা দিলে অমলিশ যায়। লতার নামে এবং অসুখের নামে কিছুটা মিল থাকায় এ ব্যবস্থা। আবার ফুলা রোগে অর্থাৎ শরীরে পানি জমে গেলে পানিতে জন্মানো ঠোঁয়াশ লতা সেবন করা হয়। ঠোঁয়াশ লতা বেশ ফোলা ফোলা। ভিতরটা ফাঁপা। এ জন্যই ফুলা রোগে ফুলা ঠোঁয়াশের ব্যবহার।

৪. কুকুরে কামড় দিলে কাঁসার থালা পড়া দেওয়া হয়। এটা মন্ত্র পড়ে আক্রান্ত রোগীর পিঠে ঘষা হয়। যদি থালা পিঠে আটকায় বুঝা যায় বিষ আছে আর যদি থালা গড়িয়ে পড়ে যায় তাহলে ধরা হয় আর বিষ নেই। পাগলা কুকুরের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয় আর এ ভয়ঙ্কর বিষয়টির এমন উদ্ভট চিকিৎসা সত্যিই বিপজ্জনক।

৫. অনেকেই গরু বা মহিষের মাথার খুলি কিংবা চোঁয়াল ঘরের কোণায় বা ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস, এর ফলে বাড়িতে জ্বিন, ভূত, পেত্নী প্রভৃতির আছর হবে না। মুসলিমদের মধ্যে এমন একটা ধারণা রয়েছে যে, ভূত-প্রেতের মধ্যে অনেকেই হিন্দু আর এ হিন্দু ভূতেরা মুসলিমদের ওপর আছর করে। তাই তারা হিন্দু ভূতগুলোকে বাড়ি থেকে দূরে রাখার জন্য ঘরের কোণে বা চালে গরুর হাড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখে। জ্বিনেরা গরু বা মহিষের হাড় দেখে পালাবে এ বিশ্বাস ঠিক নয়। কারণ, পশুর হাড় জ্বিন জাতির খাদ্যদ্রব্য হিসেবে নির্ধারিত। তাই মানুষের টাঙ্গানো হাড় জ্বিনদের খাবারের স্থায়ী উৎসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং জ্বিন তার খাবার সংগ্রহের জন্য ঐসব বাড়ি ঘরে আসবেই।

৬. হিন্দুধর্মে দেখা যায় যে, তারা দেবতার ভোগ দেয় আর মুসলিমরা দেয় পেত্নীর ভোগ। কোন মানত বা রোগমুক্তির প্রত্যাশায় মানুষ কিছু খাবার সাধারণত দু-তিন রকম খাবার একত্রে পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে দেয় অথবা কলাপাতায় করে তিনমুখো (তে-মাথা) পথের মোড়ে রেখে আসে

www.i-onlinemedia.net

সন্ধ্যাবেলায়। কারণ তাদের বিশ্বাস, পেত্নীরা রাতে আসে আর সেই খাদ্য যদি পেত্নী খায় তাহলে পেত্নীর দ্বারা যেসব অসুখ হয় ভোগ দেয়ার বদৌলতে সেসব অসুখ সেরে যাবে। অর্থাৎ পেত্নীকে ঘুষ। ঘুষ বাংলাদেশী মুসলিমরা খায়, তাহলে পেত্নীরা খাবে না কেন? ঘুষ তো মূলত পেত্নীর খাদ্য। ঘুষখোর মুসলিম এক ধরনের পেত্নী। যাহোক মুসলিমদের দেয়া ভোগ খেয়ে ফেলে কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ও অন্যান্য নিশাচর পাখিরা। এরাই তো মুসলিমদের না দেখা পেত্নী। কেউ কেউ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে ফুল, ঝাড়ুর শলা, ডিম, চাউল-ভাঁজা প্রভৃতি একত্র করে পুকুরে ফেলে দেয়।

৭. কেউ খাবার খেতে দেখলে পেটের পীড়া হয়- এ ধারণা যেমন অনেকের আছে, তেমনি অনেকের আবার এমন ধারণাও আছে যে, খাবার প্রস্তুতকালে বা মাছ-মাংস কাঁচা অবস্থায় অন্য কেউ দেখলে তার স্বাদ কমে যায়।[১]

৮. কারও কারও সন্তান হলে পরে মারা যায়। সন্তান হয়ে যাতে মারা না যায় সেজন্য জানের সদকা হিসেবে তারা অদ্ভুত ব্যবস্থা নেয়। যেমন- তারা ছেলে সন্তান হলে কান ফুঁড়িয়ে দেয়, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গরু ছেড়ে দেয়, সন্তানের বাজে নাম রাখে; যেমন- হেঁজা, মরা, হাঁইড়গা (ষাঁড় অর্থে) প্রভৃতি। তাদের ধারণা, এ সব করলে সন্তান আর ছোট বেলায় মারা যাবে না।[২]

৯. এ দেশের প্রায় সকল ব্যবসায়ীরাই দিনের প্রথম বিক্রিটা বাকিতে দেয় না। তাদের বিশ্বাস, এতে কুফা লাগে (বিপদ দেখা দেওয়া) অর্থাৎ সারাদিন আর নগদে বিক্রি হবে না কেবল বাকিই দিতে হবে। অনেকেই প্রথম বিক্রির নগদ টাকা কপালে ও বুকে ঠেকিয়ে তবেই ক্যাশ বাক্সে রাখে। হিন্দুরা এমনটা করে থাকে। তারা 'টাকা-দেবতা'-কে প্রণাম করে। টাকা-দেবতা বলে আলাদা কোন দেবতা নেই কিন্তু ধনের দেবী হল লক্ষ্মী। টাকাকে তারা লক্ষ্মী মনে করেই প্রণাম করে। আবার হিন্দুরা সকাল-সন্ধ্যা পূজা করে। সকালের পূজা হল 'প্রাতঃআহ্নিক' এবং সন্ধ্যার পূজা হল 'সান্ধ্য-আহ্নিক'। হিন্দু ব্যবসায়ীরা সকালে দোকান খুলতে গিয়ে পানি ছিটায়, ধূপ পোড়ায়, আগরবাতি জ্বালায়। সন্ধ্যায়ও সেসব করে। মুসলিমরাও এখন তাদের দেখাদেখি আগরবাতি পোড়ায় ও ধূপ জ্বালায়। কারণ তাদের ধারণা, এ সব করলে তাদের ব্যবসা ভাল হবে।

১০. এ দেশে কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা রাত্রে সূঁই বিক্রি করে না। আবার কিছু কিছু ব্যবসায়ী রাত্রে সূঁই বললে বিক্রি করে না কিন্তু 'বিন্দা' বা এ জাতীয় অন্য কিছু বলে সুঁইয়ের ইংগিত করলে তখন বিক্রি করে।

---

১. কারও নজরে খাদ্যের স্বাদ কমে না। দ্রব্যের গুণাগুণ এবং রান্নার প্রণালীর কারণেই মূলত খাবারে স্বাদ কম-বেশি হয়ে থাকে।

২. সন্তান হওয়া বা না হওয়া কিংবা বাঁচা মরার ব্যাপারটা মানুষের হাতে নয়।

www.i-onlinemedia.net

১১. এ দেশের অনেকেরই এমন ধারণা রয়েছে যে, চৈত্রমাসে শেষদিন পর্যন্ত আমের মধ্যে একপ্রকার বিষ থাকে। ঐ সময়ে আম খেলে পেটের পীড়া হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দুরা শেষ রজনীতে যে পূজা করে ও সংগীত গায় তাতে নাকি আমের ঐ বিষ কেটে যায় এবং পহেলা বৈশাখ থেকে তারা আম খেতে থাকে নির্ভয়ে।

১২. মালামাল চুরি গেলে লোকে চোর ধরার জন্য ও মালামাল উদ্ধারের জন্য নানারকম তদবীর করে। এর মধ্যে রয়েছে পান পড়া, চিনি পড়া, বাটি চালান, বাঁশ চালান প্রভৃতি। আর এগুলো করাতে হয় তুলা রাশির লোকদের দিয়ে অন্যথায় বাটি ঘুরবে না, বাঁশ ছুটবে না, আয়নায় চোর দেখা যাবে না। আসলে এ সবই ভণ্ড ওঝাদের ভেল্কিবাজি মাত্র। এর মতো মিথ্যে আর কিছু নেই।

১৩. কারও কারও এমন বিশ্বাস আছে যে, অমুক ব্যক্তি যদি ফলনশীল কোন ফলগাছ বা সব্জী বাগানের প্রতি নজর দেয় এবং বলে, 'গাছটা তো ভাল ফল দিয়েছে, কিংবা ফসল ভাল হয়েছে', তাহলে ঐ ফল বা ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কলাগাছ হলে সেটা ভেঙে যায়, নারিকেল গাছ হলে ডাব ঝরে যায় প্রভৃতি নানাভাবে চাষাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জাতীয় বিশ্বাস খুবই অবৈজ্ঞানিক ও শির্কযুক্ত। এটাকে বলা হয় নজর লাগা বা মুখ লাগা। এ আপদ থেকে রেহাই পেতে মানুষ ক্ষেতে বা গাছে ঝাড়ু বা চুন দেয়া কালো পাতিল ঝুলিয়ে দেয়। কাউকে অপমান করার জন্য আমরা বলি- 'তোর মুখে ঝাঁটা মারি অথবা তোর মুখে চুন-কালি দেব।' যে ব্যক্তির মুখ দোষ রয়েছে তাকে অপদস্ত করার জন্যই ঐসব ভাষার এমন প্রতীকী প্রয়োগ করা হয়। 'মুখ-দোষ' থাকা মানুষকে কোন কিছু ছুঁড়ে দিতে বলা হয়, কেননা মানুষের বিশ্বাস ছুঁড়ে দিলে আর ঐ বস্তু নষ্ট হবে না

১৪. আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের মওসুমে যদি কখনও একনাগাড়ে অনেকদিন বৃষ্টিপাত হতে থাকে তখন মানুষ বলে, 'গাজী মিয়ার বিয়া লাগছে।' এ প্রবাদ পুরুষ গাজী মিয়া তার মায়ের নির্দেশে বিয়ের জন্য যাত্রা করে কিন্তু বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়, ফলে তার আর বিয়ের জন্য যাত্রা করা হয় না। এভাবে তার বিয়ের আয়োজন ছলছে অনন্তকাল ধরে। বিয়ের পর্ব আর শেষ হয় না। আবার দেখা যায় কার্তিক মাসে যখন হিন্দুদের দূর্গা পূজা ইত্যাদি আরম্ভ হয় তখন পূজাকালীন বা পূজার আগে-পরে বৃষ্টি হলে মানুষ বলে, 'দূর্গাপূজা আসলে বৃষ্টি হয়।' অর্থাৎ গাজী মিয়ার বিয়ে এবং দূর্গাপূজা ইত্যাদি বৃষ্টির কারণ। বৃষ্টিপাত হওয়ার পর তাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর সাথে মিলালে মূলত শির্ক করা হয়।

১৫. কোন কোন মুসলিমের এমন ধারণা রয়েছে যে, দিঘী, ব্রীজ প্রভৃতি নাকি বলি চায়। কোন ব্রীজ তৈরির সময় কিংবা তৈরি করার পর যদি কেউ পড়ে মরে যায় বা কোন দুর্ঘটনার কারণে মারা যায় তখন আমরা বলি, 'এ ব্রীজ বলি

www.i-onlinemedia.net

চায়, দু'-চারজন মরবেই। প্রত্যেক বৎসর মারা যাবে।' আবার দিঘী কাটতে কেউ কোনভাবে মারা গেলে বা পানিতে ডুবে মরলে আমরা বলি, 'এ দিঘী বলি চায়।' এ বলীর ধারণাটি এসেছে হিন্দুদের থেকে। তাদের কালীদেবী প্রাণ বলী চায়। তাই হিন্দুরা প্রাণ বলি দেয়। বলীর ধারণা এ দেশের মুসলিমদের জন্য এক জঘন্য কুসংস্কার।

১৬. অনেকের ধারণা কানে কচু, নাভিতে তৈল আর পেটে তিতা দিলে রোগমুক্ত থাকা যায়। এটা একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা।

১৭. যাদের সন্তান হয় না তাদের বিশ্বাস, তাবিজ-কবজ বা পীরের দরগায় নিয়াত-মানত করলে সন্তান হবে।

১৮. কারও কারও মধ্যে এমন বিশ্বাস আছে যে, অমুকের কাছ থেকে কোন ফল বা সব্জীর বীজ নিলে তা থেকে ভাল ফলন হয় না। ঘরের কোণে চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করলে আমাদের ধারণা হয় যে, ধন-সম্পদ আগমনের আলামত দেখা যাচ্ছে। তাই এগুলোকে আমরা সুখের পায়রা বা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে থাকি।[১]

১৯. অনেকেই রাত্রি বেলায় বিল-ঝিলে আগুন দেখে মনে করে এগুলো পেত্নীর আগুন। তাদের ধারণা, পেত্নী মাছ শিকার করে। এরা রাত্রে বাড়ি আসতে ভয় পায়। তাদের ধারণা, পেত্নীরা মাছ-মাংসের লোভে তাদের পিছু নিবে। তাই তারা রাত্রে কোন জায়গা থেকে মাছ-মাংস নিয়ে বাড়ি এলেও তা আগুনে সেঁকিয়ে তবেই ঘরে তোলে। 'আলগা' বা ভূত-পেত্নীর আছর থেকে এভাবেই তারা মাছ-মাংস রক্ষা করে।[২]

২০. মানুষ নতুন বাড়ি করে কিংবা বাসা বদল করে। কেউ যদি কখনও নতুন বাসা বা বাড়িতে উঠে রোগাক্রান্ত হয় তখন দোষ হয় নতুন বাসা বা বাড়ীর মানুষ বলে ফেলে- এ বাসা বা বাড়িটা খারাপ অথবা এ বাড়িটা ভাল না। কিংবা বলে, 'জায়গাটা খারাপ।' যার যা মনে আসে বলে ফেলে। কেননা অসুখটা বাসা স্থানান্তরের পরে হয়েছে।[৩]

---

[১] যে মুসলিম চড়ুই পাখির বাসায় ধন খোঁজে তার তো গরীব হবারই কথা (!?), কেননা ধন রয়েছে ভূ-গর্ভের খনিতে, কল-কারখানায়, ভূপৃষ্ঠের মাটিতে, সাগর বক্ষে ইত্যাদিতে।

[২] রাত্রে বিলের পানিতে যে আগুন দেখা যায়, তা পেত্নীর আগুন নয়। পানির তলদেশে মাটিতে ফসফরাস থাকে, তা বুদবুদের আকারে বের হয়ে পানির ওপরে উঠে বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশ্রণের ফলে জ্বলে ওঠে। আর এটাকেই মানুষ মনে করে পেত্নীর আগুন।

[৩] মানুষের কিছু অসুখ বা রোগ আছে যা যেকোন স্থানেই হতে পারে; যেমন- বহুমূত্র, টিউমার, ক্যান্সার, প্রেসার, হৃদরোগ প্রভৃতি। আবার কিছু রোগ আছে যা মানুষের ত্রুটিপূর্ণ চলাফেরা এবং পারিপার্শ্বিকতার সংযোগে হয়ে থাকে; যেমন- সর্দি, কাশি, চুলকানি, ডায়রিয়া, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি। কিন্তু এ জাতীয় রোগ তো পুরনো বাসা-বাড়িতেও হতে পারে। এগুলো খাদ্য ও পরিবেশ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণেই হয়। নতুন বাড়ি বা বাসার দোষে হয় না।

www.i-onlinemedia.net

২১. ছেলে-মেয়েরা কোন রাস্তা অতিক্রম করে এসে যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে মানুষ বলে, 'ঐ পথটা খারাপ, রাস্তার মোড়টা খারাপ, অথবা, রাস্তার পাশের তালগাছ/বটগাছ/গাবগাছ বা তেঁতুলগাছটা খারাপ। এগুলোতে 'আলগা' থাকে। অর্থাৎ সে-সব জ্বিন-ভূতের বাসা-বাড়ী। বস্তুত, রোগের কারণ কিন্তু পথ বা গাছ নয়। অসুখের কারণ হল বাইরের আবহাওয়া, ভক্ষণ করা খাবার বা বাচ্চারা নানা কারণে ভয় পেয়ে থাকে এবং এরপর যদি জ্বর আসে তখন 'আলগা' ইত্যাদির দোষটা বেশি পড়ে। সন্তান এসে যদি ভয় পাওয়ার কথা বলে তখন বুকে থু-থু ছিটিয়ে দেয়া হয়, লবণ খাওয়ানো হয় কিংবা রসুন পুড়ে সেবন করানো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।[১]

২২. আঙ্গুল দ্বারা খেলা করলে স্মরণশক্তি কমে।

২৩. মৃত ব্যক্তির কবরের উপর লিখিত স্মৃতিফলকের প্রতি তাকালে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

২৪. গোসলখানায় বসে থাকলে মানুষ দুর্বল হয়।

২৫. পশমী কাপড় পরিধান করলে মানুষ মোটা হয়।

২৬. গোলাপ পানি দ্বারা চুল ধৌত করলে বার্ধক্য বাড়ে।

২৭. পাথর দ্বারা খেলা করলে মানুষ নির্মম হয়।

২৮. দাঁড়িয়ে পায়জামা পরলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়।

২৯. বৈশাখ মাসে বিয়ে হারাম বা দোষণীয় বা অমঙ্গলজনক।

৩০. চৈত্রমাসে ঝাঁটা বাঁধা হয় না, কেননা তাতে অমঙ্গল হয়।

৩১. খাটো, চুলছোট, মোটা এবং হাতলম্বা মেয়ে বিয়ে করলে অমঙ্গল হয়।

৩২. আকীকার গোশত সন্তানের পিতা-মাতা খেলে অমঙ্গল হয়।

৩৩. মেয়েদের কালো কাপড়ের পায়জামা ও ছায়া পরা ভাল নয়।

৩৪. কোবানীর পশুর রক্ত গায়ে মাখা এবং কাপড়ে মেখে দরজায় দরজায় ছোপ দেওয়া আর এটা দিয়ে তাবিজ দেয়া মঙ্গলজনক।

৩৫. মেয়েরা মাথার মাঝামাঝি না করে ডানে বা বামে সিঁথি করলে তাদের স্বামীরা পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারবে না।

৩৬. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪০দি যাবৎ রান্না করে না, কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ সময় রান্না করলে স্বামীর কবরে আযাব হবে।

৩৭. হাতের তালু চুলকালে অর্থ-কড়ি আসবে বলে মনে করা।

---

[১] এ প্রসঙ্গে এক গল্প বলা যায়- এক ছেলে পথে ভয় পেয়ে সে কথা বাড়ী এসে তার মা'কে বলল। মা তার সন্তানের ভয় পাওয়ার কথা শুনেই কুরআন ও সহীহ হাদীসের দু'আ ব্যবহার করা ছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক তদবীর শেষে রসুন পোড়া দিল। চুলার আগুনে রসুন বেশ আওয়াজে ফেটে উঠল। ছেলেটি কাছেই বসা ছিল। রসুন কাটার আওয়াজ শুনে সে তার মা'কে বলল, 'মা আমি আবার ডরাইছি।' ভয় সারানোর জন্য রসুন পোড়া দেয়া হল, সেটাই ফেটে আবার ভয় লাগল। এখন কিসে এ ভয়ের চিকিৎসা হবে মা পড়ে গেল সেই ভাবনায়।

www.i-onlinemedia.net

৩৮. চোখ লাফালে বিপদ আসবে বলে ধারণা করা।
৩৯. বাম চক্ষু ফরকিলে বা স্পন্দিত হলে সেটা দুর্ভাগ্য ডেকে আনে আর ডান চক্ষু স্পন্দিত হলে সৌভাগ্য দেখা দেয়।
৪০. এক চিরুনীতে দু'জন চুল আঁচড়ালে ঐ দু'জনের মধে ঝগড়া লাগবে বলে বিশ্বাস করা।
৪১. ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার ভয়ে বেলা ডুবার পর চিটাগুড়, সুঁই ও হলুদ বিক্রি থেকে বিরত থাকা।
৪২. পৃথিবীকে একটা ব্যক্তি বা ফেরেশতা কাঁধের উপর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যখনই সে কাঁধ পরিবর্তন করে তখনই ভূমিকম্প হয় বলে ধারণা করা।
৪৩. নতুন পোশাক পরিধান করার পর হাঁচি আসলে এটাকে অশুভ বলে মনে করা।
৪৪. জিহ্বায় বা ঠোঁটে কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে বা স্মরণ করছে বলে বিশ্বাস করা।
৪৫. কোন লোকের আলোচনা চলছে, ইতোমধ্যে বা কিছুক্ষণ পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবী হওয়ার আলামত বলে মনে করা।
৪৬. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চাও মারা যাবে বলে বিশ্বাস করা।
৪৭. পরীক্ষায় শূন্য পাওয়ার ভয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকা।
৪৮. ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে বা জ্বর আসবে বলে মনে করা।
৪৯. চিরুনী মাটিতে পড়লে বা বিড়ালের মুখ মোছা দেখলে অতিথি আসবে বলে মনে করা।
৫০. ঝাড়ু উল্টো করে রাখা ঠিক নয় বলে ধারণা করা।
৫১. ভাঙা চিরুনী দ্বারা মাথা আঁচরালে বুদ্ধি লোপ পায়।
৫২. ভাঙা আয়না দিয়ে মুখ দেখলে খারাপ হয়।
৫৩. ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে মনে শয়তানী বুদ্ধির উদ্রেক হয় বলে মনে করা।
৫৪. ভাঙ্গা চিরুনী দ্বারা মাথা আঁচড়ালে বুদ্ধি লোপ পায় বলে ধারণা করা।
৫৫. ভাঙ্গা ছাতা ব্যবহার করলে বিবেক লোপ পায়, গামছা বা গেঞ্জি সেলাই করে ব্যবহার করলে সম্মান নষ্ট হবে বলে ধারণা করা।
৫৬. ঘরের বেড়া ও খুটিতে কিংবা কোন গাছে পান খাওয়া চুন মুছলে ঘরে অশান্তি আসবে বলে বিশ্বাস করা।
৫৭. গোসল করে ভিজা কাপড় নিংড়ানো পানি পায়ে ফেললে স্ত্রী মারা যাবে বলে ধারণা করা।
৫৮. মাথার বালিশ পা দিয়ে সরালে বুদ্ধি বিগড়ে যায় বলে মনে করা।
৫৯. পানির কলসী ঢেকে না রাখলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মুহাব্বত চলে যায় বলে বিশ্বাস করা।

www.i-onlinemedia.net

৬০. মাতা-পিতা ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের বিছানায় বসে খাদ্য খেলে সন্তানের অমঙ্গল হয় বলে মনে করা।

৬১. ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ে কোলে নিয়ে খানা খেলে অকালে সন্তান মারা যায় বলে বিশ্বাস করা।

৬২. মেয়েদের নাকফুল হারালে স্বামীর অকল্যাণ হয় বলে বিশ্বাস করা।

৬৩. বিবাহিত নারী তার নাকফুল এমনিতেই খুলে রাখলে স্বামীর হায়াত কমে যায় বলে ধারণা করা।

৬৪. ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে কোমরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অকালে স্বামী মারা যায়।

৬৫. গোসল করে ভিজা কাপড় নিংড়ানো পানি পায়ে ফেললে স্ত্রী হারাতে হয়।

৬৬. পায়খানায় বসে ঘন ঘন থুথু ফেললে দাঁতে অসুখ হয় এবং অকালে দাঁত পড়ে যায়।

৬৭. জোনাকি পোকা হাতে নিলে পেটের পীড়া হয়।

৬৮. জামা উল্টা গায়ে দিলে ফিরনী খাওয়ার ভাগ্য হয়।

৬৯. ঝাটা জোরে মাটিতে পিটালে বংশের ক্ষতি হয়।

৭০. বাড়ির প্রবেশ পথে পা ধুলে সংসার ধ্বংস হয়ে যায়

অতএব, সকল মুসলিমকে এ ধরনের বিশ্বাস হতে উদ্ভূত অনুভূতিকে পরিহার করতে বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে যদি কেউ কোন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যা এ প্রকৃতির বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকটে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে নিম্নের দু'আ দ্বারা আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত:

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ

আল্লাহুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা ওয়া লা ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুক ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ্, আপনার কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই এবং আপনার দেয়া শুভাশুভত্ব ব্যতীত কোন শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।[১]

শুভ-অশুভ আলামত বিষয়ে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করা নিরর্থক। বৃহৎ শির্‌কের উৎসমূলে পরিণত হওয়ার আশংকায় ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মূর্তি, মানুষ, তারা, সূর্য ইত্যাদি পূজার উৎপত্তি হঠাৎ করে হয়নি। এ ধরনের পৌত্তলিকতার চর্চা দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমান্বয়ে বিকাশমান হয়েছে। বৃহৎ শির্‌কের শিকড় যত বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। এভাবে, শয়ত্বানের কুমন্ত্রণার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার পূর্বেই তা সমূলে উৎখাত করতে ইসলাম সর্বদা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়।

---

[১] *আহমাদ, ২/২২০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫/১০৫; আলবানী, সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদীস নং ১০৬৫; আত্-ত্বাবারানী । হাদীসটির সনদ সহীহ।*

www.i-onlinemedia.net

প্যাঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয় এ বিশ্বাসেও ক্ষতি অতিশয়

দেখতে ছোটখাট। ড্যাবডেবে চোখ দুটো রাতে জ্বলজ্বল করে জ্বলে। হালকা ছাই রঙের পালক গায়ে। দেখলে একটু ভয়ভয়ই লাগে। এমন একটি পাখির নাম প্যাঁচা। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান তথা ভারতীয় উপমহাদেশসহ এ পৃথিবীর অনেক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, প্যাঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়। অর্থাৎ যে গাছে বসে প্যাঁচা ডাকবে তার আশেপাশের বাড়ির লোকজনের ক্ষয়ক্ষতি রয়েছে সামনে। শুধু প্যাঁচাই কিন্তু নয়, আরও অনেক প্রাণীর ব্যাপারেও এ রকম ধারণা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। যেমন- কাকের ডাক, কুকুর বা বিড়ালের কান্না ইত্যাদি।

এ বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক:

সাধারণভাবে একটা জিনিস বোঝা যায় যে, যার গলা খনখনে, কণ্ঠ কর্কশ তাকেই আমরা অশুভ বলে ধরে নেই। যে সকল প্রাণীর ডাক শুনতে ভাল লাগে না, বিরক্তি সৃষ্টি করে সেগুলোকে অমঙ্গলজনক [অকল্যাণকর] ডাক বলে ধরে নিই। আর, এ ডাক-হাঁক যদি গভীর ও নিস্তব্ধ রাতে শোনা যায় তা আরও ভয়াবহ বলে মনে হয়। নিরিবিলি ঘুমেরও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আসলে কর্কশ কণ্ঠে ভয়ভয় ভাব জাগানো এবং ঘুম ভাঙানো- এ দুই কারণে প্যাঁচার ডাককে অকল্যাণকর বা অশুভ বলা হয়। এ পাখিটি কিন্তু দিনে বেরোয় না। বেরোয় রাতে। তাই এর দিনে ডাকার প্রশ্নই ওঠে না। বেরোয়, বেড়ায় এবং ডাকেও রাতে। এমন একটি প্রাণী খুঁজে পাওয়া যাবে না যার ডাক সুন্দর, আকর্ষণীয় কিন্তু মঙ্গলজনক [কল্যাণকর] বা শুভ। কোকিলের কথাই ধরা যায়। কোকিল পাখি দেখতে খুব সুন্দর নয়, রঙ কালো। কিন্তু ডাকটি বড়ই মধুর। তাই বলে ওর ডাক কোন শুভ বা কল্যাণের বার্তা বয়ে আনে, এমন কথা কেউই বলবেন না।

প্যাঁচা রাতে হঠাৎ করে ডেকে উঠে সুখের ঘুম নষ্ট করে এটুকুই ওর দোষ। কিন্তু ওর ডাকে কোন অশুভ বা অকল্যাণকর কিছু নেই। একটা ব্যাপারে প্যাঁচা কিন্তু আমাদের উপকারই করে। ধান পাকলে ধান ক্ষেতে বা বাড়িতে কত দুষ্ট প্রাণীর উপদ্রব শুরু হয়। মেঠো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, চড়ুই পাখি, চামচিকা ইত্যাদি প্রাণীর উৎপাতে কৃষককে দিশেহারা হতে হয়। এগুলো ধান বা অন্যান্য ফসলের খুব ক্ষতি করে। ওদিকে প্যাঁচার প্রিয় খাবার হল ইঁদুর, চড়ুই ও চামচিকা। রাত জেগে প্যাঁচা ক্ষেতে বা বাড়িতে চরে বেড়িয়ে ইঁদুর ধরে ধরে খায়। ফসলকে বলা হয় বরকতময়। প্যাঁচা যেহেতু এ ফসলের সংরক্ষণে সহায়তা করে, তাই প্যাঁচা তো আসলে কৃষকের বন্ধু।

www.i-onlinemedia.net

সাত-তেইশ-তেরো
লাগায় শুধু গেরো

Unlucky 13 বলে একটি কথা ভদ্র এবং শিক্ষিত সমাজে খুব চলে। কথাটির বাংলা হয় দুর্ভাগ্যের ১৩ অথবা ১৩-এর দুর্গতি। যেকোন জিনিস গণনায় ১৩-তে পৌঁছলে আর রক্ষা নেই। গোলমাল লেগে যাবার সম্ভাবনা সামনে। হতে পারে ভণ্ডুলও। ১৩-তে সব ভেস্তে যাবার পূর্বাভাস রয়েছে। কারণ তেরো মানেই হল অপয়া, অমঙ্গলজনক, অকল্যাণকর, অশুভ। তাই Unlucky 13। এ রকম ধারণা আমাদের দেশে অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। তবে এ ধারণার উৎপত্তি কিন্তু আমাদের দেশে নয়। সেটা চালু হয়েছে দু'-একশ' বছরে নয়, কয়েকশ' বছর আগে। পশ্চিমের দেশ থেকে ব্যবহারিক জীবনের অনেক উপাদান এসেছে আমাদের দেশে। আমাদের দেশ তো এক সময় ব্রিটিশ বা ইংরেজরা শাসন করেছে। শাসনের মাধ্যমে ওরা চালিয়েছে শোষণ-লুণ্ঠন। এ দেশের সরল মানুষকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা অশিক্ষা-কুশিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। এ জন্যই ওরা ওদের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস বয়ে এনে আমাদের সমাজে চালু করেছে। মানুষ যাতে এসবে ডুবে থেকে সুশিক্ষিত ও সচেতন হতে না পারে। Unlucky 13 হয়ত এ পথ ধরেই সচল হয়েছে আমাদের মধ্যে।

আসল কথা হচ্ছে, কোন সংখ্যাই Lucky (সৌভাগ্যের) নয়। আবার Unlucky (দুর্ভাগ্যের)-ও নয় কোন সংখ্যাই। সংখ্যার আবার Lucky-Unlucky কী? সংখ্যার কোন শক্তি নেই। কোন ক্ষমতাও নেই সংখ্যার। কেবল পরিমাণ বা আয়তন জানার জন্য সংখ্যার দরকার হয়। অংকের সংখ্যাগুলো সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলো সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ হবে- এ ধারণা কিন্তু নেহায়েতই ভুল। এর কোন মানে নেই, ভিত্তিও নেই। তাহলে Unlucky 13-এর এ ধারণাটি এলো কোত্থেকে? হ্যাঁ, অন্য অনেক কুসংস্কারের মতো Unlucky 13-এর এ ধারণাটিও এসেছে এক ভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্র থেকে। বাইবেল নামক খ্রিস্টানদের যে তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, সেই বিকৃত বাইবেলেই এর কথা রয়েছে। বাইবেলে এক কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। কাহিনীটি 'Last Supper' বা *'শেষ নৈশভোজ'* নামে পরিচিত। মূলত বিকৃত বাইবেলে বর্ণিত যিশুর *'শেষ নৈশভোজ'*-এর ঘটনা থেকেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটেছে। এ নিয়ে সারা পৃথিবীতে অনেক লেখালেখি হয়েছে, ছবি আঁকা হয়েছে, গানও গাওয়া হয়েছে। সুতরাং খুবই বিখ্যাত 'শেষ নৈশভোজ' নামক সেই গল্পটি। তো গল্পটি এ রকম- 'শেষ ওই ভোজসভায় যীশুখ্রীষ্ট উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে ছিল তার বারোজন অনুগামী/সহচর বা শিষ্য। অর্থাৎ যীশুকে নিয়ে মোট তেরো জন। ভোজসভার ওই আসরে শেষ যে ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত হন তিনি হলেন জুডাস।' এই জুডাস নামক এ ব্যক্তিটি

www.i-onlinemedia.net

যীশুর সাথে প্রতারণা করেছিল বলে ধারণা করা হয়। এই জুডাসের কারণেই নাকি যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু হয়। আর এ ঘটনার পর থেকে যীশুর ভক্তকুল ১৩-কে অকল্যাণ ও বিপদের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যা যুগ যুগ ধরে চলে এসে আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

দুর্ভাগ্যের প্রতীক ১৩-সংখ্যাটি সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাসটি অনেক প্রাচীন। রোমানরা বিশ্বাস করত যে, ১৩ সংখ্যাটি মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতীক। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার (নরওয়েরর) প্রাচীন অধিবাসীদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে দাবী করা হয় যে, কোথাও ১৩ জনের অতিথি সমৃদ্ধ কোন ভোজসভা হচ্ছে মূলত শয়তানের আত্মার সম্মিলন। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, ১৩ জন ব্যক্তি যেখানে কোন ভোজসভা করছে, সেখান থেকে যে ব্যক্তি প্রথমে উঠে যাবে সে ওই বছরের মধ্যেই মারা যাবে।

বাড়ি করতে ১৩ সংখ্যা পরিহার করে বারো বা চৌদ্দ তলা করা হয়। হোটেলে কামরার নম্বর তেরোর (১৩) বদলে হয় ১২ক। তেরো তারিখে দূরের যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। সহজে তেরো নম্বর জার্সি পরা খেলোয়াড়কে মাঠে নামানো হয় না। কোন ব্যাপারেই সহজে কেউ ১৩ সংখ্যার ধারকাছ মাড়াতে চান না। খুব শিক্ষিত লোকও সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেন তেরকে।

প্যারিসে ১৩ তলা কোন বিল্ডিং নেই। জাতীয় পর্যায়ের লটারি থেকে ইতালি সম্পূর্ণরূপে ১৩ সংখ্যাটিকে বাদ দিয়ে থাকে। আমেরিকার লোকজন সংখ্যা ১৩-কে অশুভ বলে মনে করে। আর এ কারণেই অধিকাংশ বহুতল বিল্ডিংয়ের ১৩ তলাকে ১৪ তলা বলা হয়। কোন শুক্রবার ১৩ তারিখ হলে এ দিনটিকে যেহেতু বিশেষভাবে অশুভ মনে করা হয়, তাই অধিকাংশ লোক এই শুক্রবারে কোথাও ভ্রমণ করা বা কারো সাথে সাক্ষাত করা থেকে বিরত থাকে। আবার এই শুক্রবারে ক্ষতিকর কোনকিছু ঘটলে তৎক্ষণাৎ তারা শুধু এ দিনটিকেই দায়ী করে থাকে। যদি কেউ মনে করে যে, এ কুসংস্কারটি শুধু সাধারণ জনগণের মধ্যেই প্রচলিত তাহলে সে ভুল করবে। কারণ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

- ১৯৭০ সালে এ্যাপোলো চন্দ্র অভিযান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ওই মহাকাশযানটিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটে এবং অক্সিজেন বের হয়ে যেতে থাকে। পৃথিবীতে অবতরণের পর নভোযানটির ফ্লাইট কমান্ডার বলেন, তার এ বিষয়টি জানা ছিল যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, এপ্রিলের ১৩ তারিখ শুক্রবার ১৩.১৩ ঘটিকায় (অর্থাৎ ১:১৩ টায়) আকাশে উড্ডয়ন করা হয়েছিল এবং ফ্লাইট নম্বরও ছিল এ্যাপোলো ১৩।[১]

[১] World of Facts, p. 165

www.i-onlinemedia.net

- ১৯২৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিন আমেরিকার ফ্লোরিডা স্টেইটের Puerto Rico এলাকায় প্রলংকারী এক হারিকেনে ২০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে।
- প্রতি মাসের ১৩ তারিখ সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন এবং ট্রেন ও বিমান চলাচল বন্ধ রেখে আমেরিকা প্রতি বছর প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি গুণছে।

১৩ তারিখের শুক্রবারকে অশুভ মনে করার পিছনে কমের পক্ষে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, যিশুকে ক্রশবিদ্ধ করে হত্যা করার কথা ছিল এ শুক্রবারেই। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ডাইনিরা সাধারণত শুক্রবারে তাদের আলোচনা সভায় মিলিত হতো।

এ ১৩-সংখ্যাটিই আবার অনেকের জন্য সৌভাগ্যের প্রতীকও বটে! যেমন-

- কেন্দ্রীয় আমেরিকার অ্যাজটেক[১] ও মায়িআ[২] জাতির লোকদের নিকট ১৩ সংখ্যাটি একটি পবিত্র সংখ্যা হিসেবে গণ্য।
- ঐতিহ্যগতভাবে চীনে ১৩ সংখ্যাটি একটি সৌভাগ্য আনয়নকারী সংখ্যা।
- বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ১৩ সংখ্যাটিকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে।
- গোঁড়া ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ ১৩ টি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৩-কে নিয়ে এ ধরনের আশঙ্কা ও বিভ্রান্তির কোন কারণই নেই, থাকতে পারে না। অন্য সকল সংখ্যার মতো তেরোও একটা নিরীহ সংখ্যা। এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হবার ভয় অমূলক, অযৌক্তিক, বিজ্ঞান ও আল্লাহ্‌র বিধান বিরোধী। নানা কুসংস্কারের অন্যতম একটি কুসংস্কার। মানুষই এ কুসংস্কার তৈরি করে তার বিপদ বহন করছে। আর ১৩-এর মতো কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে বিপদ মুক্ত করতে হবে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সচেতন মানুষকেই।

---

[১] স্পেন কর্তৃক মেক্সিকো জয়ের (১৫১৯ খ্রি.) আগে যে জাতি সেখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, সেই জাতির লোকজন।

[২] পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুয়াটেমালা এবং মেক্সিকোতে বসবাসকারী রেড ইন্ডিয়ান জাতির মানুষ।

www.i-onlinemedia.net

হাঁচি-চুলকানি-কাঁপা
কিচ্ছু নয় ফাঁপা

একটি স্কুল। স্কুলটির চতুর্থ শ্রেণীতে একদিন পঞ্চম ঘন্টায় সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস চলছিল। পুস্তকের পাঠ্যসূচীর ফাঁকে শিক্ষক পাঠ্যবহির্ভূত আরো কিছু কথা ছাত্র-ছাত্রীদের জানানোর প্রয়াস পাচ্ছিলেন। কিছু কথাকে সাধারণ জ্ঞানের আওতাভুক্ত করে উপস্থাপন করছিলেন তিনি। এগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে মেনে চলার পরামর্শও যথারীতি দান করছিলেন। বলছিলেন, ভাত খেতে খেতে হাঁচি উঠলে মনে করতে হবে দূর থেকে কেউ মনে করছে। অথবা খেতে খেতে বা কথা বলার সময় জিভে কামড় খেলে ধরে নিতে হয় কেউ বকাবকি করছে। আবার বলছিলেন, বামচোখের পাতা কাঁপলে অমঙ্গল এবং ডানচোখের পাতা কাঁপলে মঙ্গল বয়ে আনে।

এ সব কথা বলার সময় ক্লাসের ফার্স্ট বয় পাপ্পু বাম হাতের নখ দিয়ে ডান হাতের তালু চুলকাচ্ছিল। ও সামনের বেঞ্চিতে বসেছিল। বরাবর তাই বসে। জাদীদার হাত চুলকানোর ব্যাপারটা শিক্ষকের নজর এড়ায়নি। জিজ্ঞেস করলেন তিনি পাপ্পুকে-

-পাপ্পু দাড়াও। তুমি তোমার হাত চুলকাচ্ছিলে না!

-জ্বী স্যার। হঠাৎ ডান হাতটায় সুড়সুড়ি এল। না চুলকে পারলাম না।

স্যারের দাঁড়াতে বলা এবং ওই বেমক্কা প্রশ্নে পাপ্পু ধরে নিয়েছে যে, সে মস্ত এক অপরাধ করে ফেলেছে। ভয়ে ভয়ে নিজের কৃত অপরাধের পক্ষে সাফাই গাইতে চাইল।

-না, হাত চুলকে তুমি কোন অন্যায় করনি। চুলকানি লাগলে তুমি কী আর করবে! তবে কথা হচ্ছে, এ ডান হাত চুলকানোর একটা মানে আছে। সেটাই এখন বলছি শোনো। শিক্ষক এবার পাপ্পুর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ক্লাসের সবার দিকে তাকালেন। বললেন তিনি আবার, কখনো কারো ডানহাতের তালু চুলকালে মনে করতে হয় তার ভাগ্য ভাল। শিগ্‌গির তার ভাগ্যে টাক-পয়সা জুটবে। বুঝেছ তোমরা! সবাই সমস্বরে জবাব দেয়, জ্বী স্যার। ক্লাসের দুষ্টোমিতে ওস্তাদ মেয়েটির নাম জাদীদা। সবাই যখন জ্বী স্যার বলছিল ও তখন চুপচাপ। হয়ত ওর মাথায় তখন অন্যকিছু খেলছিল। হয়ত ফন্দিই আঁটছিল সে। আচমকা বলে বসল জাদীদা-

-স্যার, আমার হাত না পায়ের তালু চুলকাচ্ছে। এর কোন অর্থ আছে নাকি স্যার! থাকলে বলেন না স্যার।

জাদীদার দুষ্টোমিটা স্যার হজম করলেন নীরবে, নিছক এটা যে জাদীদার পাকামী তা বুঝেও। তিনি এবার বললেন, জাদীদা আরেকটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিয়েছ। হ্যাঁ, পায়ের তালু চুলকানোরও একটা মানে আছে বৈকি! সেটা হল কারো কখনো পায়ের তালু চুলকালে ধরে নিতে হবে তার সামনে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ভাগ্য ভাল হলে বিদেশে বেড়ানোও হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের এ সব জ্ঞানের কথাগুলো বলে শিক্ষক একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, বুঝলে তো সবাই এতক্ষণ ধরে যা বলছিলাম আমি! এগুলো সাধারণ জ্ঞানের কথা। এগুলো সবাই মনে রাখবে এবং মেনে চলবে।

www.i-onlinemedia.net

চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাসে শিক্ষক সাধারণ জ্ঞান বলে যে জ্ঞানদান করলেন তা কী আদৌ জ্ঞানের কিংবা সাধারণ জ্ঞানের কথা! তবে বলা যায়, এগুলো আসলে ধারণার কথা। সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মত বা ধারণা। এগুলোর কোন ভিত্তিও নেই, সত্যতাও নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত নয় এগুলো। যার ভিত্তি নেই, সত্যতা নেই এবং পরীক্ষিত নয় তা জ্ঞান হয় কী করে! আদৌ জ্ঞানই নয় এগুলো আসলে। তবে যে শিক্ষক এগুলো উল্লেখ করলেন তার কারণ হল, উনিও ওভাবে জেনেছেন। তার কথিত জ্ঞানগুলো তো আর তিনি যাচাই করতে যাননি। এগুলো যে যাচাই করা দরকার, তাই তো কখনো মনে করেননি তিনি। সেটাই বস্তুত তার জন্য স্বাভাবিক। শুধু তার জন্য কেন, এদেশের অধিকাংশ শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষের জন্য স্বাভাবিক। যাচাই বা পরীক্ষার ব্যাপারটা এ বিষয়ে খুব প্রয়োজনীয় একটা প্রশ্ন। যেটা ছাড়া কোন ধারণাই জ্ঞান নয়। কোন মতই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মত নয়।

শিক্ষকের কথিত এ ধারণাগুলো আমরা প্রাথমিকভাবে একটু যুক্তির নিরিখে বিচার করতে পারি। যেমন, হাঁচি উঠলে ভাবা হয় কেউ মনে করছে দূর থেকে। হাঁচির সাথে মনে করার কী সম্পর্ক থাকতে পারে! তাড়াহুড়ো বা অমনোযোগিতায় খেলে খাদ্য প্রবাহের শিরায় খাবার আটকে গিয়ে কিছুটা পেছন দিকে ফিরে আসে। এতে হাঁচি ওঠে। সুতরাং হাঁচির কারণটি হল শারীরিক। অন্য কিছু নয়। মনে টনে করা তো দূরে থাক। ঘুম কম হলে বা চোখে কোন অসুখ দেখা দিলে চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। কাঁপাকাঁপির সঙ্গে মঙ্গল-অমঙ্গলের কী সম্পর্ক। তেমনি ডান-বাম অথবা হাত-পা চুলকানোর সঙ্গেও ভ্রমণ এবং অর্থপ্রাপ্তির কোনই সম্পর্ক থাকতে পারে না। এগুলো সবই শারীরিক ব্যাপার। শরীরের ভেতরের কোন কারণ থেকে এগুলো হয়। এর সঙ্গে অন্য কারণ যোগ করা একেবারেই অর্থহীন।

এগুলো সবই আসলে কুসংস্কার। অতীত কালের এমনই সব হাজারো রকমের ধ্যান-ধারণা, মতামত, মূল্যবোধ প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে এ অন্ধধারণাগুলো চালু হয়েছে এবং এখনো টিকে আছে বহাল তবিয়তে। যে ধারণা বা মতগুলোর কোন ভিত্তি নেই, যুক্তিও নেই সেগুলোই হল অন্ধধারণা। কুসংস্কার বলা হয় সেগুলোকেই। এ সব কুসংস্কার, অর্থহীন কারণ বা ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তিতা দূর করার জন্য প্রকৃত জ্ঞান আমাদের আয়ত্ব করতে হবে। সে জন্য সত্য খোঁজার তাড়না থাকতে হবে। সত্যটা মিলবে ওহীর কাছ থেকে। ওহীর জ্ঞানই আমাদের ভুল ধারণাগুলো দূর করে সত্য ও যুক্তিসম্মত ধারণার নিকট পৌঁছাতে সহায়তা করে। তাওহীদের জ্ঞান দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুকে যাচাই করতে হবে। যাচাই-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই তা গ্রহণ করা যাবে। বাদবাকি মত-পথকে বর্জন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারলে, করতে শিখলে তবেই আমরা সামনে এগুবো। আমাদের এগুনো মানে সমাজটারও এগুনো। দেশটারও।

অতএব, আসুন ওহীর পথ বেয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের চর্চা করে ভুলগুলোকে ভুল বলি আর সত্যকে আলিঙ্গন করে প্রতিষ্ঠিত করি আমাদের সকলের জীবনে।

www.i-onlinemedia.net

হাতের রেখায় ভাগ্য দেখতে চায় অজ্ঞ

আমাদের দু'খানি হাত দিয়ে আমরা প্রতিদিন কত রকম কাজই না করি। আমাদের হাত দু'টোর তালু মেলে ধরলে দেখা যাবে তালুতে অনেকগুলো রেখা বা টান। টানগুলো কিন্তু একেবারে সোজা নয় কোনটাই। এঁকেবেঁকে, একটার ওপর দিয়ে আরেকটা বা জড়াজড়ি করে রেখাগুলো এগিয়েছে। সবগুলো যে তালুর প্রান্ত ছুঁয়েছে তাও নয়। সামান্য কিছুটা বা মাঝামাঝি গিয়ে শেষ হয়েছে। ছোট, বড় বা মাঝারি সাইজের কত রেখা রয়েছে! কোনটা মোটা বা কোনটা সরু। এভাবে জাল ফেলে যেন অসংখ্য রেখার সমাহার ঘটেছে আমাদের হাতের তালুতে। হাতের তালুর এ রেখাকে বলা হয় হস্তরেখা।

হাতের রেখাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মোটা রেখাকে বলা হয় ভাঁজ। যার মধ্যে রয়েছে *কর রেখা, হৃদয় রেখা, শির রেখা* ও *আয়ু রেখা*। ভাঁজ বাদে বাকী সব রেখাকে বলা হয় *সূক্ষ্ম রেখা*। এ পৃথিবীতে হাতের রেখা দেখে ভাগ্য বলে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। রেখা দেখে ভাগ্য গোণে বা গণনা করেন যারা তাদের বলা হয় গণক বা হস্তরেখাবিদ।

উপরোক্ত দু'ধরনের রেখা তৈরি হয় একইভাবে। এগুলো মূলত দেহ গঠনিক খাঁজ ছাড়া আর কিছুই ন । মায়ের গর্ভে শিশুর ভ্রূণ তৈরি হলে হাতের হাড়গুলোর সন্ধিস্থলে তালু ও আঙুলের চামড়ায় ভাঁজ থাকে। অনেকদিন এভাবে থাকাতে একসময় ভাঁজ পড়ে যায়। পরে তা স্থায়ী হয়ে যায়। শিশু মায়ের গর্ভে তার হাত দুটো মুঠো করে রাখে। ভাঁজের রেখা তৈরি হয় এতেই। হাত মুঠো করে থাকার কারণ হিসেবে আন্দাজ-অনুমান ও প্রমাণহীনভাবে অনেকে অনেক কথা বলেন। কেউ বলেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা আগে থাকত গাছে, গাছের ডাল ধরার অভ্যাস থেকে মুঠো করার ব্যাপারটা এসেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, 'মানুষ কোনকিছু আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। গর্ভের শিশু কিছু ধরে বা ধরতে চেয়ে হাতের মুঠ ভাঁজ করে রাখে। এ ভাঁজগুলো ধীরে ধীরে দাগ বা রেখায় পরিণত হয়।'

সুতরাং হাতের রেখার সাথে আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ, আয়ু কমবেশি হওয়া বা কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা জড়িত নেই। কোন কোন আঙুল থাকা-না-থাকার ওপর কোন রেখা থাকা-না-থাকা নির্ভর করে। যেমন, জন্ম থেকে যদি বুড়ো আঙুল না থাকে তাহলে আয়ু রেখাও থাকবে না। তার মানে, যে বুড়ো আঙুল ছাড়া জন্ম নিল, সে কি একদিনও বাঁচবে না!? আর রেখাগুলো যে বাড়ে-কমে বা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় তারও কিন্তু কারণ আছে। হাতের তালুর ভেতরে যে মাংসপেশী আছে তা নড়াচড়ার ওপর রেখা বড় হওয়া বা মিশে যাওয়া নির্ভর করে। পরিশ্রমের কাজ করলে তাতে বেশি নড়াচড়া হয়। এতে রেখা তাড়াতাড়ি বাড়ে বা মিশে যায়।

www.i-onlinemedia.net

একটি গল্প বলে নেই শেষে। এ গল্প থেকেও হস্তরেখার ভাগ্য গণনার অসারতা বোঝা যাবে। আমাদের এ পৃথিবীতে সংঘটিত হওয়া গল্প এটি। আগে রাজা-বাদশাহরা রাজপ্রাসাদে জ্যোতিষী রেখে দিতেন। এদের বলা হতো রাজ-জ্যোতিষী। জ্যোতিষীরা রাজা বা রাজ্যের ভূত-ভবিষ্যত আগাম বলে দিতেন। রাজা মশাই সেভাবে আগেভাগে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। একজন রাজার ছিল এমন একজন রাজ-জ্যোতিষী। তার গণনায় প্রায়ই ভুলভাল হতো বা ফলতো না তার কথা। একদিন রাজা বিরক্ত হয়ে জ্যোতিষীকে বললেন, বলুন তো আপনার আয়ু আর কতদিন! জ্যোতিষী উত্তর দিলেন, আরও বছর বিশেক তো বটেই। রাজা তখুনি কোতোয়ালকে ডেকে আদেশ দিলেন, জ্যোতিষীর গর্দান কাটতে। আদেশ পালনও করা হল। রাজা জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা প্রমাণ করলেন। আর জ্যোতিষের গণনায় যেকোনই সত্যতা নেই তা জ্যোতিষী মহাশয় নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ করলেন।

www.i-onlinemedia.net

রাশি চক্র
হাসি বক্র

দৈনিক পত্রিকার এক কলামে একটা বিষয় লেখা থাকে। লেখার শিরোনাম দেয়া থাকে আজকের দিনটি কেমন যাবে, আজকের রাশি বিচার বা রাশিচক্র ইত্যাদি। এক একটি দৈনিকে এক একটি নাম। দু'-একটা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায়ই এ বিষয়টি দেখা যায়। রাশিচক্রের রাশি গণনা হচ্ছে এ কলামের বিষয়বস্তু। এগুলো যারা লেখেন তারা লেখক নন। লেখেন নামকরা সব জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদরা। যাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর রয়েছে বড় বড় ডিগ্রী (!)। নামের সাথে ঐ ডিগ্রী, পুরস্কার ইত্যাদি সব লেখা থাকে। স্বর্ণ বা রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত- লেখা থাকে সে কথাও। একটা পদবীও তারা লাগিয়ে নেন নিজের নামের সাথে। সে যাক। দৈনিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণ সকালে কাগজ খুলে প্রতিদিনের খবরাখবর পড়েন। একই সাথে রাশিফলেও একবার নজর বুলিয়ে নেন। তিনি হয়ত ভাবেন, দিনের ঘটনাগুলোর কিছু যদি আগাম জেনে নেয়া যায়, সে অনুযায়ী কাজকর্ম ঠিক করা যাবে। আসলে দেখা গেছে, এমন মানুষরা হতাশাগ্রস্ত, জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত, ভাগ্যের ওপর জীবনের হাল ছেড়ে দেয়া মানুষ।

অথবা এদের মন দুর্বল, শিক্ষাদীক্ষা কুসংস্কারে ঠাসা। এমন মানুষরাই রাশিফলে বিশ্বাস রাখেন বা ভরসা করেন। রাশিফলের কী আল্লাহ প্রেরিত ওহী কুরআন ও সহীহ হাদীস সম্মত কোন ভিত্তি আছে? অথবা এটার পিছনে কি কোন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তি কার্যকর রয়েছে? গ্রহ-নক্ষত্র-চক্র কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর সত্যিসত্যিই কোন প্রভাব ফেলে? আমাদের সমাজে পুরনো একটি প্রবাদ আছে- 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। সুতরাং 'বিশ্বাস আনুন, ফল পাবেন'- এই হল জ্যোতিষীদের প্রধান পুঁজি।

আমরা কুরআন, সহীহ হাদীস, বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য বা যুক্তি-তর্কে বহুদূর না গিয়েও একটি সাধারণ পদ্ধতিতে রাশিচক্রের সত্যতা যাচাই করতে পারি। এ ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা দরকার। সেটা হল- বলা হয়, জ্যোতিষ শাস্ত্রের মাধ্যমে রাশিফল গণনা করা হয়। অর্থাৎ একই শাস্ত্রের দ্বারা বিভিন্ন জ্যোতিষীরা দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় রাশিফল গণনা করেন। কিন্তু বিভিন্ন দৈনিক বা সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন রাশির যে ফলাফল বলা হয় তা কি এক রকম হয় কখনো? হয় না। যাচাই করলে দেখা যাবে একটি পত্রিকার সাথে আরেকটি পত্রিকার একই রাশির ফলাফল একরকম নয়। সবগুলোই আলাদা আলাদা। যেমন, একটি পত্রিকার মেষ রাশিতে যে কথা বলা হয়েছে আরেকটি পত্রিকায় এই মেষ রাশির গণনা কিন্তু মেলে না। হয়ত একটায় বলা হয়েছে- 'আজ আপনার শরীর ও মন ভাল যাবে। হঠাৎ করে অর্থ পাবার সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রেও উন্নতি যোগ আছে। কোন সুসংবাদ আপনাকে আনন্দ দেবে।' অন্য এক পত্রিকায় মেষ রাশিতে লেখা হয়েছে- 'আপনি আজ দুঃশ্চিন্তায়

www.i-onlinemedia.net

ভুগবেন। আর্থিক দিক থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে কৌশলী না হলে বিপদ হতে পারে। আচমকা কোন দুঃসংবাদে আপনি মুষড়ে পড়তে পারেন। ইত্যাদি।'

একদিন বা এক সপ্তাহের বা এক মাসের কয়েকটি পত্রিকা মিলিয়ে পরীক্ষা করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অধিকাংশই অমিলে ভরা। তবে ১০টির মধ্যে একটি-দু'টি হয়ত কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়। এ পর্যন্তই। যেগুলো মিলে যায় সেগুলো সাধারণ কিছু বক্তব্য। যার বেশিরভাগই অসার, ভিত্তিহীন মন্তব্য এবং নির্দিষ্ট করে না বলা বাণী। যেমন, মানসিক দুঃশ্চিন্তা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য মোটামুটি চলবে। শারীরিক অবস্থা এক রকম থাকবে। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে কৌশল অবলম্বন করুন। রাস্তা চলাচলে সতর্ক না হলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। বাকীতে ব্যবসা বিপজ্জনক হতে পারে। ভবিষ্যতের ভাবনায় চিন্তিত হবেন। শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন হলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া এড়িয়ে চললে ভাল করবেন। দিনটি মোটামুটি ভালই যাবে। মনটিকে সারাদিন প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করুন। এই সব আর কি!

অনুমানে এ সকল অতি সাধারণ উপদেশ বা ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষ কেন, যে কেউই দিতে পারেন। এর জন্য পদবী-পদকধারী জ্যোতিষীর বালখিল্য বাণীর প্রয়োজন কী?

নিম্নে একই দিনের ৩টি পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফল দেয়া হল:

রাশি	প্রথম আলো	ইত্তেফাক	জনকণ্ঠ
মেষ (Aries)	অংশীদারী কাজে কুশলী হোন। অধীনস্থদের ওপর নির্ভর করবেন না। কোন আত্মীয় উপকারে আসবে।	দূরত্ব বজায় রেখে বন্ধুত্ব করুন। ব্যবসায় বিনিয়োগ সুবিধা বাড়তে পারে। রোমান্স ও বিনোদন শুভ।	ঝুঁকির কাজ পরিত্যাগ করুন। সম্পত্তি বিষয়ক ও চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। গুরুজনের ভ্রমণযোগ আছে। ব্যবসা ক্ষেত্র শুভ নয়।
বৃষ (Taurus)	অধীনস্থদের জন্য ঝামেলা বাড়বে। প্রিয়জন বা সন্তানের কোন বিষয় চিন্তার কারণ হতে পারে। পারিবারিক কাজে বয়স্ক কারো সহায়তা পাবেন।	পারিবারিক ঝামেলা বেড়ে যেতে পারে। সতর্ক হোন। ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদন শুভ। যাত্রা শুভ।	গৃহ, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত শুভ ফল। গুরুজনের কারণে দু:শ্চিন্তা। যোগাযোগ, চুক্তি ও প্রণয় শুভ। উপার্জন.বৃদ্ধি।
মিথুন (Gemini)	পদস্থদের মন রক্ষা করে চলুন। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হতে পারে। দূর থেকে কোন অনুকূল তথ্য পেতে পারেন। যানবাহনে সতর্ক থাকুন।	সৃজনশীল কাজ শুভ। ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদন শুভ। দূরের যাত্রা শুভ।	ব্যবসা যোগাযোগ শুভ। আর্থিক ও পারিবারিক কারণে দু:শ্চিন্তা। বিদ্যাগত শুভ ফল। ভ্রমণে সাবধান। প্রণয় শুভ নয়। মেহমান আসতে পারে।

www.i-onlinemedia.net

কর্কট (Cancer)	পদস্থ প্রভাবশালীদের মন রক্ষা করে চলুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। কোন আত্মীয় মানসিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে। যানবাহনে সতর্ক থাকুন।	দূরের যাত্রা স্থগিত রাখাই ভাল। ব্যবসায় নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। যোগাযোগ শুভ।	পারিবারিক ও ব্যবসায়িক সমস্য বাড়বে। স্বামী-স্ত্রীর শরীর ভাল যাবে না। ভ্রমণ, পরিবর্তন, গৃহ-সম্পত্তি ও যানবাহন বিষয়ক শুভ ফল।
সিংহ (Leo)	যোগাযোগ ও প্রচারমূলক কাজে সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক লেনদেন ও কেনাকাটায় সতর্ক থাকুন। অধীনস্থদের কাজে লাগানো সহজ হবে। কোন বন্ধু উপকারে আসবে।	মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি সাধন করতে পারে। সতর্ক হোন। কেনাকাটায় লাভবান হতে পারেন। যাত্রা শুভ।	শরীরের যত্ন নিন, অংশীদারী কাজে ঝামেলা। ব্যবসায়ী বিনিয়োগে সাবধান। দাম্পত্য বিরোধ এড়িয়ে চলুন। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি হতে পারে। স্থান পরিবর্তন অশুভ।
কন্যা (Virgo)	ব্যস্ততা বাড়বে। যৌথ ও অংশীদারী কাজে মতবিরোধ বাড়তে পারে। যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কোন আত্মীয় অস্থিরতার কারণ হতে পারে। দূর থেকে কোন অনুকূল তথ্য পাবেন। রোমান্স শুভ।	গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হতে পারে। ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদন শুভ। রোমান্স ও বিনোদন শুভ।	ঝুঁকির কাজে সাবধান। অভিসারে সতর্ক থাকুন। সন্তান নিয়ে সমস্যা থাকবে। বর্ণচোরা বন্ধুদের থেকে সজাগ থাকুন। দূর থেকে শুভ ফল লাভে বাধা।
তুলা (Libra)	ব্যস্ততা বাড়বে। প্রয়োজনে পরিকল্পনা পরিবর্তন করুন। কোন ঘটনা আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। কোন প্রভাবশালী বন্ধু আপনার উপকারে আসবে। অসুস্থদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। রোমান্স শুভ।	পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতে পারেন। রোমান্স ও বিনোদন শুভ। যাত্রা শুভ।	গৃহসম্পত্তি ও জন্মস্থান বিষয়ক কাজে সফল হবেন। সন্তানের কারণে দুর্ভাবনা বাড়বে। প্রতিপক্ষ সক্রিয়। ঝুঁকির কাজ শুভ নয়। ব্যবসায়ে সুনাম বৃদ্ধি।
বৃশ্চিক (Scorpio)	পুরনো কোন সমস্যা মানসিক অস্থিরতার কারণ হবে। কোন আত্মীয় আপনার উপকারে আসবে। যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। অন্যের জন্য ব্যয় বাড়বে।	বন্ধুর পরামর্শ কাজে আসতে পারে। দূরের যাত্রায় সাফল্য আসতে পারে। যোগাযোগ শুভ।	পেশাগত যোগাযোগ শুভ। গুরুজন ও গৃহসম্পত্তি বিষয়ক দুর্ভাবনা বাড়বে। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। প্রণয় শুভ। ব্যবসা মন্দা।

www.i-onlinemedia.net

ধনু (Sagittarius)	অধীনস্থদের ওপর কোন দায়িত্ব দিয়ে নির্ভর করবেন না। কোন আত্মীয় মানসিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে। নতুন তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। জুয়া ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অর্থ নাশ হতে পারে। রোমান্স শুভ।	পারিবারিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রগতি হতে পারে। ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদন শুভ। যাত্রা শুভ।	গুরুজন দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যয় বাড়বে যোগাযোগ ও ভ্রমণ শুভ নয়। ব্যবসায় মুনাফা বাড়বে। ঝুঁকির কাজে সাবধান।
মকর (Capricorn)	যৌথ ও অংশীদারী কাজে কুশলী হোন। পদস্থদের মন রক্ষা করে চলুন। কোন আত্মীয় আপনার উপকারে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। অন্যের জন্য ব্যয় বাড়বে। রোমান্স ও বিনোদন শুভ।	পুরনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে। ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদন শুভ। রোমান্স শুভ।	শরীরের যত্ন নিন। পারিবারিক ও অর্থিক কাজে সঙ্কট। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত দুঃশ্চিন্তা বাড়বে। ব্যবসায়ী কাজে উপার্জন বাড়বে।
কুম্ভ (Aquarius)	যৌথ ও অংশীদারী কাজে বয়স্ক কারো সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক লেনদেনে কোন প্রকার ঝুঁকি নেবেন না। যানবাহনে সতর্ক থাকুন। রোমান্স, বিনোদন ও সৃজনশীল কাজ শুভ।	দূর থেকে নতুন কোন শুভ তথ্য পেতে পারেন। ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিতে হতে পারে। রোমান্স শুভ।	ব্যবসায়ী বিনিয়োগে সাবধান। শরীরের যত্ন নিন। চাকরিজীবীদের দিনটি শুভ। অফিস থেকে ছুটি নিতে হতে পারে।
মীন (Pisces)	ব্যস্ততা বাড়বে। প্রয়োজনে পরিকল্পনা পরিবর্তন করুন। বয়স্ক কেউ মানসিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে। পদস্থদের কাজে লাগানো সহজ হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন।	পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতে পারেন। কেনাকাটা শুভ। যোগাযোগ শুভ।	শরীরের যত্ন নিন। ঋণবিষয়ক দুর্ভাবনা বৃদ্ধি। সন্তানের কারণে শান্তি বিঘ্নিত। প্রণয় শুভ। প্রতিপক্ষীয় ঝামেলা বাড়বে।

রাশি বলা হয় সৌরজগতের কতকগুলো গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীককে। কল্পিত এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয়। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology)-এর ধারণা অনুযায়ী সব গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। Numerology বা সংখ্যা জ্যোতিষের ওপর ভিত্তি করে এ শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

www.i-onlinemedia.net

এ শাস্ত্রের সবকিছুই যে কাল্পনিক, যুক্তি বা বিজ্ঞান নির্ভর নয়, বরং দলীল প্রমাণ বিহীন; তার কিছুটা ব্যাখ্যা নিম্নে করা হলঃ

প্রথমত, ধরা যাক রাশির কথা। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, রাশি হল বারটি, যথা- মেশ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। সূর্য বার মাসে বারটা রাশিতে অবস্থান করে বিধায় রাশির সংখ্যা বারটা। আর সূর্যের যে রাশিতে অবস্থানকালে কারও জন্ম হয় তাকে সেই রাশির জাতক/জাতিকা বলা হয়। কিন্তু রাশি সূর্যের অবস্থানের প্রেক্ষিতে কেন হবে, চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের প্রেক্ষিতে কেন হবে না, তার কোন বৈজ্ঞানিক বা দলীল সাপেক্ষ ব্যাখ্যা নেই। রাশির এ নামগুলো পুরোটাই কাল্পনিক, এ সব রাশির যে প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে তাও কাল্পনিক। এক এক রাশির নম্বর এবং তার যে মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরে নেয়া হয়েছে তাও কাল্পনিক। এ সব সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে কোন দলীল তো নেই-ই, কোন ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকভাবেও এগুলো প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয়ত, ধরা যাক, সংখ্যা তত্ত্বের কথা। জ্যোতিষীগণ নিউমারোলজি বা সংখ্যা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করে থাকেন। সংখ্যা জ্যোতিষের মূল কথা হল, ১ থেকে ৯-এই নয়টি সংখ্যাই হল মৌলিক এবং এক এক সংখ্যার এক এক ধরনের প্রভাব রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ এ নয় সংখ্যার যেকোন এক সংখ্যার জাতক/জাতিকা হবে এবং যিনি যে সংখ্যার জাতক/জাতিকা হবে তার জীবনে ঐ সংখ্যার প্রভাব এবং ঐ সংখ্যার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। যেমন, বলা হয়, ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা অগ্রপথিক এবং অভিযাত্রিক হবে, তাদের মধ্যে একটা সহজাত সৃজনশীলতা প্রচ্ছন্ন থাকবে ইত্যাদি। ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা ভদ্র ও বিনয়ী, তারা কল্পনা প্রবণ, রোমান্টিক ও শিল্পানুরাগী হবে ইত্যাদি। এখন কথা হল, এক এক সংখ্যার যে এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হল, তা কাল্পনিক ছাড়া আর কি? আর মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে এই নয়-এর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করার কোন যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি শুধু কল্পনার অন্ধ অনুসরণ ছাড়া?

তৃতীয়ত, জাতক/জাতিকা নির্ধারণের পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা যাক। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, কে কোন সংখ্যার জাতক/জাতিকা তা নির্ধারণ করা হয় তার জন্ম তারিখ (ইংরেজি তারিখ) দেখে। জন্ম তারিখ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত যেটা হবে সেটাই হল তার জন্ম সংখ্যা। আর ৯-এর উপরের যৌগিক সংখ্যা হলে সেই যৌগিক সংখ্যাকে পারস্পরিক যোগ দিতে দিতে যে মৌলিক সংখ্যা বের হবে সেটাই হবে তার জন্মসংখ্যা এবং সে হবে ঐ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। যেমন, ১৮ তারিখে কারও জন্ম হলে সে হবে (১+৮=৯) ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। ২১ তারিখে জন্ম হলে সে হবে (২+১=৩) ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। ২৯ তারিখে জন্ম হলে সে হবে (২+৯=১১-১+১=২)২ সংখ্যার জাতক/জাতিকা।

www.i-onlinemedia.net

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, জাতক/জাতিকাদের আরও দু'ধরনের সংখ্যা আছে। তা হচ্ছে কর্ম সংখ্যা ও নাম সংখ্যা। জন্ম সংখ্যা হচ্ছে জন্ম তারিখ/তারিখের যোগফল, আর কর্ম সংখ্যা হচ্ছে জন্ম বছর, জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ-এ সব কয়টার যোগফল। যেমন, কেউ জন্ম গ্রহণ করল ১লা নভেম্বর ১৯৪৮ সালে, তাহলে নভেম্বর যেহেতু ১১তম মাস তাই কর্মসংখ্যা বের হবে এভাবে ১+১+১+১+৯+৪+৮=২৫ আবার ২+৫=৭, অতএব ১-১১-১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণকারীর জন্মসংখ্যা ১ আর কর্মসংখ্যা হল ৭।

এখন, জ্যোতিষীদের ধারণা হল জন্মসংখ্যা নির্দেশ করে জাতক/জাতিকার সহজাত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। আর কর্মসংখ্যা থেকে জানা যায়, জাতক/জাতিকার জীবনে কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, কোন পেশায় তার অগ্রগতি নিহিত। কোন্ পথে অগ্রসর হয়ে সে সাফল্য লাভ করতে পারবে ইত্যাদি। জন্মসংখ্যার কর্মসংখ্যাও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ৯টি।

এখন কথা হল, জন্মসংখ্যা দ্বারা যে জাতক/জাতিকা নির্ধারণ হবে তার কি প্রমাণ? আর কর্মসংখ্যার জন্য জন্মের তারিখ, মাস ও সন সবটা যোগ করতে হবে এবং জন্মসংখ্যার জন্য শুধু জন্মের তারিখ দেখা হবে সন-মাস যোগ করা হবে না- এ সবের ভিত্তি কি? প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা সম্ভব নয়। কারণ, এটা কোন পদার্থগত বিষয় নয়। থাকলে কোন ইলাহী দলীল থাকতে পারত, তাও অনুপস্থিত। তাহলে, কল্পনা ব্যতীত আর কি ভিত্তি রয়ে গেল? আর একটা কথা চিন্তা করা যায়। তা হল, জন্মসংখ্যা ও কর্মসংখ্যা- এ সবই বের করা হয় ইংরেজী তারিখ ও ইংরেজী সন ও মাস থেকে। ইংরেজী সন গণনা করা হয় ঈসা (আ:)-এর জন্ম থেকে। তাহলে ঈসা (আ:)-এর জন্মের ভিত্তিতে শুরু করা হিসাবের সাথে পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্মসংখ্যা, কর্মসংখ্যা তথা চরিত্র ভাগ্য সবকিছুর সম্পর্ক, এরই বা কি প্রমাণ?

জ্যোতিষীদের ধারণা মতে, জন্মসংখ্যা ও কর্মসংখ্যার মতো মানুষের রয়েছে একটি নামসংখ্যা। প্রত্যেকের নামের ইংরেজি অক্ষরগুলোর মান (সংখ্যা) থেকে বের করা হয় নামসংখ্যা। ইংরেজীতে হরফের মানসংখ্যা নিম্নরূপ:

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	U	O	F
I	K	L	M	H	V	Z	P
J	R	S	T	M	N	W	
Q		G			X		
Y							

জ্যোতিষীদের ধারণা হচ্ছে প্রত্যেকের নামের মধ্যে তার জীবনের লক্ষ্য ও মিশন সম্পর্কে নির্দেশনা লুকিয়ে থাকে। কি কি গুণাবলী অর্জন করতে হবে, কি কি বর্জন করতে হবে, কোন্ কোন্ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে নামের সংখ্যার মধ্যে এ সব

www.i-onlinemedia.net

কিছুরই দিক নির্দেশনা থাকে। এ ক্ষেত্রেও জ্যোতিষীগণ ১ থেকে ৯ মোট ৯টি সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যেক সংখ্যার জন্য এক এক ধরনের দিক নির্দেশনা করে রেখেছেন।

আসলে, জ্যোতিষীগণ কি এর কোন জবাব দিতে পারবেন যে, ইংরেজী এক এক অক্ষরের এক এক মান দেয়া হয়েছে, এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি? কিংবা এর স্বপক্ষে কোন ইলাহী প্রমাণ আছে কি? আর নামসংখ্যার মধ্যে যদি কোন জীবনের দিক নির্দেশনা লুকিয়ে থাকেও তবে তা বের করতে ইংরেজী অক্ষরের আশ্রয় নেয়া হবে কেন? অন্য কোন ভাষার অক্ষর গ্রহণ করা যাবে না তার কি প্রমাণ? অন্য ভাষার অক্ষরে গেলে যে নামসংখ্যায় পার্থক্য দেখা দেবে তার সমাধান কি?

আবার কেউ কেউ কুরআন-হাদীসের ভাষা আরবী অক্ষরের মান থেকে মানসংখ্যা বের করে থাকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আরবী অক্ষরের যে মান ধরা হয়, তাও কুরআন-হাদীস বা বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাছাড়া আরবী অক্ষর অনুযায়ী নামসংখ্যা বের করার পর ঐ সংখ্যার যে প্রভাব বা দিক নির্দেশনা সাব্যস্ত করা হচ্ছে, তা তো জ্যোতিষীদেরই সাব্যস্ত করা কাল্পনিক ব্যাপার।

প্রকৃতপক্ষে, জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রত্যেকটা উপাত্ত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলেই প্রতিভাত হবে যে, তা একান্তই কল্পনা প্রসূত এবং দলীলবিহীন আন্দাজ মাত্র।

অধুনা জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ সর্বশেষ পন্থা হিসেবে জ্যোতিষীদের দারস্থ হচ্ছেন এবং তাদের দেয়া পাথর বা অন্য কোন পরামর্শকে ভাগ্য ফেরানোর নিয়ামক ভেবে শেষ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। অনেকে বিবাহ-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখা-পড়া, বিদেশ গমন, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি জীবনের অনেক ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ জানার জন্য জ্যোতিষীদের আগাম ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং সাফল্য লাভ করবেন বলে আত্মস্থ থাকছেন। এভাবে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে তারা জীবন পরিচালনার গাইড বানিয়ে চলছেন। জ্যোতিষীদের ব্যবসাও ভাল চলছে। জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার ব্যবসা ভাল দেখে এ বিদ্যা শিক্ষার হারও তাই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এ শাস্ত্রের হিসাব-নিকাশ ও তার ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন বা এ শাস্ত্র চর্চা ইসলামে কতটুকু অনুমোদিত তা ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণে প্রয়াসী এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী একজন সচেতন মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক জ্যোতির্বিদ রয়েছেন যারা তারকার গতিবিধি লক্ষ্য করে এর ফলাফল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকেন। এর দ্বারা তারা জনগণকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে আগাম সতর্ক করেন। রাশিফলের এ জাতীয় প্রচারণা আমাদের দেশে এখন একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকাতে তাদের অনেকের চেম্বার রয়েছে। সাধারণ লোকেরা তাদের

www.i-onlinemedia.net

নিকট নিজ নিজ ভাগ্যে ভাল বা মন্দ কী অপেক্ষা করছে, তা আগাম জানার জন্য গমন করে। যারা ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে, তারা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গমন করে। অথচ তারা জানে না যে, ইসলাম জ্যোতির্বিদদের মানুষের ভাগ্য সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীকে স্বীকার করে না এবং নিম্ন জগতের প্রাণীর ভাগ্যে উর্ধ্ব জগতের গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকার প্রভাব আছে বলে দীর্ঘকাল থেকে মানুষের মাঝে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, সেটাকে ইসলাম শির্কী চিন্তাধারা হিসেবে গণ্য করে; কেননা, বিশ্বজগত এককভাবে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। আমাদের ন্যায় সকল গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজী আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। এগুলোকে আমাদের ভাগ্যের ভাল বা মন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। এ সব একান্তই আবহমান কালের মানুষের কল্পনা ও ধারণাপ্রসূত কথা বৈ আর কিছুই নয়। এ সব বিশ্বাসের ফলেই একদা মানুষ তারকার কাল্পনিক মূর্তি বানিয়ে এর পূজা করতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

www.i-onlinemedia.net

শনির দশা
ধোঁকা খাসা

আমাদের সমাজে শনি বলে একটি শব্দ বেশ প্রচলিত। শব্দটির ব্যবহার হয় এভাবে- শনির দশা, শনির দৃষ্টি, শনির শুভ দৃষ্টি, শনির অশুভ দৃষ্টি, শনির ভর ইত্যাদি। আবার যারা জ্যোতিষী, হাতের রেখা দেখে ভাগ্য গণনা করেন অথবা রাশিফল বলে দেন; তারা বলেন, 'শনির প্রভাব, শনির কুদৃষ্টি ও শনির বলয়।' দিনকাল খারাপ যাচ্ছে- শনির আছর। অসুখ-বিসুখ লেগে আছে, শনির নজর পড়েছে। আয়-উন্নতি হচ্ছে না- শনি ভর করেছে। অর্থাৎ শনি যত নষ্টের মূল। খারাপ, অনিষ্ট ও অকল্যাণের প্রতীক হল এ শনি। শনির নজরে পড়লে আর কারো রক্ষা নেই; ক্ষতি মেনে নিতেই হবে। সমাজের বেশিরভাগ মানুষের ধারণা এ রকমই। আর এটা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

সকল অনিষ্টের হোতা এ শনিটি আসলে কী কিংবা শনি সম্পর্কে এমন ধারণা কিভাবে গড়ে উঠল, সে সম্পর্কে আমরা একটু খোঁজ-খবর করতে পারি।

হিন্দু ধর্মের পুরনো কাহিনীতে এক দেবতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি হলেন শনি দেবতা। সূর্যদেবের স্ত্রী ছায়ারাণীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিল দুই পুত্র সন্তান। এদের একজন মনু ও অন্যজন শনি। শনিদেবের স্ত্রীর নাম পার্বতী। তিনি চিত্ররথের কন্যা। শনিদেব ছিলেন অত্যন্ত দুরাচারী। সকলের ক্ষতি ও অকল্যাণ কামনা করাই ছিল তার প্রধান কাজ। চিত্ররথ একদিন দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে কন্যার সামনে শনির নিন্দা করেন। এতে পার্বতী লজ্জায় ক্ষোভে মৃত্যু আলিঙ্গন করে এবং পরে পুনরায় জন্ম নেন। এবার তার জন্ম হয় হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার গর্ভে। বিয়ে হয় মহাদেবের সাথে। বিয়ের পর অনেক সাধ্য সাধনা করে অবশেষে সন্তান হয় পার্বতীর। দেবতারা একে একে নবজাতককে দেখে আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করলেন শনিদেবও। সকলে চোখ মেলে দেখে ধন্য ধন্য করলেও শনিদেব কিন্তু নবজাতকের দিকে দৃষ্টি দিলেন না। পার্বতী খুব রেগেমেগে এর কারণ জানতে চাইলেন। শনি বললেন, "চিত্ররথের কন্যা পার্বতী ছিল আমার স্ত্রী। আমি তার প্রতি অবিচার করেছি। নির্যাতন করেছি। একদিন তার অতি সামান্য ইচ্ছাকেও অপূর্ণ রেখেছি। এ জন্য সে আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলে, 'তুমি একবার আমার দিকে চেয়ে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলে না। আমার আবদার না হয় না-ই রাখলে! ঠিক আছে, এখন থেকে তুমি যার দিকে তাকাবে, তার তৎক্ষণাৎ ধ্বংস অনিবার্য।' সেই থেকে আমি মাটির দিকে চোখ রেখে মাথা নিচু করে থাকি।"

www.i-onlinemedia.net

পার্বতী কিন্তু শনিদেবের এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। সে বলে, 'আপনার এ কথা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। আপনি আমার সাথে ছলনা করছেন। আমার ছেলেকে দেখে আশীর্বাদ করতে চাইছেন না বলে এ কথা বলছেন। ছেলে দেখে আশীর্বাদ না করা পর্যন্ত ছাড়ছি না আপনাকে।' শনিদেব মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। তিনি অন্য কোন উপায় না দেখে অবশেষে পার্বতীর পুত্র গণেশের দিকে দৃষ্টি দিলেন। আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল ঘটনা। ধড় থেকে গণেশের মুণ্ডু খসে পড়ে গেল মাটিতে। নিজ পুত্রের এ অবস্থায় পার্বতী তো অগ্নিশর্মা। অগ্নিদৃষ্টিতে তিনি আরও একবার অভিশাপ দিলেন শনিকে- 'আমার সন্তানের এ অবস্থার জন্য আপনি বাকী জীবন খোঁড়া হয়ে থাকবেন।' একদিকে মন্দ দৃষ্টি এবং সে সঙ্গে খোঁড়া হয়ে পরবর্তী বছরগুলো পাড়ি দিয়েছিলেন বেচারা শনিদেব।

এ হল শনির উৎস-কাহিনী। জানা যায়, হিন্দুশাস্ত্রের এ কাহিনীর ওপর ভর করে পুরনো আমলের চতুর জ্যোতিষীরা শনি-ভীতি ছড়িয়ে দেন মনুষ্য সমাজে। সেই থেকে আরো কয়েকগুণ ভয়াল-দর্শন করে তোলা হয়েছে শনিকে, শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। জ্যোতিষ মানেই সমাজের পরগাছা, অলস, প্রতারক একদল চতুর মানুষ। শনিকে এরা প্রতারণার অন্যতম বাহন হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। আসলে শনি মানেই অনিষ্ট- এ ভাবনা ভাবাটাই হল একটা বড় অনিষ্ট। শনির কোন দশাও নেই, দৃষ্টিও নেই। এর কোন সত্যতা নেই কিছুমাত্র। এ সব গল্প ফেঁদে সরল, ধর্মভীরু, অন্ধবিশ্বাসী, অশিক্ষিত মানুষকে বোকা বানিয়ে স্বার্থোদ্ধার করা হয় মাত্র। যুগ পরম্পরায় চলে আসা এ সকল কাল্পনিক, অসত্য কাহিনীতে মানুষ অজান্তেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং করছে প্রতিনিয়ত। কারণ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে এগুলো শুনতে শুনতে প্রথমে বিশ্বাস ও পরে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে। অনেকে জ্যোতিষের কথায় গলে গিয়ে শনির দশা এড়াতে নগদ মূল্যে ক্রয় করেন নীলা (নীলকান্তমনি) পাথর। জ্যোতিষীরা বলেন, 'নীলা পাথরের আংটি পরলে শরীরের রং উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শনির দৃষ্টি ঘুঁচিয়ে দিয়ে দুঃখ, অভাব, রোগ, ব্যাধি ও কষ্ট দূর করে দেয়।' এ সকল দাবীকে সত্য প্রমাণ করার জন্য জ্যোতিষীরা কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। বরং বলা যায়, জ্যোতিষদের এ সব কথা একেবারে মিথ্যা, অবৈজ্ঞানিক ও প্রতারণাপূর্ণ। সুতরাং শনির দশা-দৃষ্টিও বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি এর প্রভাব প্রতিরোধে রত্ন-পাথর ধারণ করারও কোন যুক্তি নেই। পুরো ব্যাপারটিই আসলে অসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এতক্ষণ তো আমরা কল্প শনির কাহিনী বললাম। এবার আসল শনির কাহিনী না বললে তো খুব অন্যায় হবে। আসল শনি হল শনিগ্রহ। অনেক অজানা, অনেক রহস্যময়তায় ঢাকা এ শনিগ্রহ। পৃথিবীর অনেক কিছুই তো অজ্ঞাত রয়েছে আমাদের। অর্থাৎ আমরা যেখানে এখনও পৌঁছাতে পারিনি, ভেতরের সত্যকে উদ্ঘাটন করতে

www.i-onlinemedia.net

পারিনি; সেটাই হল রহস্য। এ রহস্যগুলো নিয়ে নানা কল্পকথা তৈরি হয়। সে যাক, আমরা এখন আসল শনি অর্থাৎ শনিগ্রহ সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিই।

সূর্য থেকে শনিগ্রহের দূরত্ব গড়ে ৮৮ হাজার ৬৭ লক্ষ মাইল। এ অকল্পনীয় দূরত্ব পেরিয়ে শনিগ্রহে সূর্যের আলো পৌঁছাতে সময় লাগে ৭৯ মিনিট। শনি সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এতে সময় লাগে প্রায় ৩০ বছর। শনির পরিমণ্ডলে নানা প্রকার গ্যাস আছে। এর মধ্যে রয়েছে- হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন, অ্যামোনিয়া, পানি, ইথেন, অ্যাসিটিলিন, ফসফিন, কার্বন-মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড। সূর্যের আলো শনিগ্রহে পৌঁছায় সবচেয়ে কম। শনির বলয় মানুষের নিকট এক পরম বিস্ময়। গ্যালিলিও প্রথম তার দূরবীন দিয়ে শনির বলয় আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি এর প্রকৃত রূপ ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। পরে হেউগেন্স শনির বলয় আবিষ্কার করেন। এখন ৩টি মহাকাশযান পাঠিয়ে মানুষ শনিসহ অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনেছে। ভয়েজার ১, ২ ও ৩ নামক নভোযান এ তথ্যগুলো আমাদের অবহিত করেছে। শেষ কথা হল, শনি সম্পর্কে এত তথ্য জানতে গিয়ে মহাকাশযানগুলোকে কিন্তু একবারও শনির দশায় পতিত হতে হয়নি।

www.i-onlinemedia.net

ভয়-ভীতি ও জণ্ডিসের মালা দূর করে না রোগ-বালা

রোগ হলে গলায় মালা পরিয়ে দেয়া হয়। সুতা ও শেকড়ের তৈরি মালা। কেবল সুতা নয়। সুতার এক বা দেড় ইঞ্চি তফাতে গাছের কয়েকটি শেকড় বা চিকন ডাল গোছা করে বাঁধা থাকে। রোগীর গলায় পরিয়ে দেবার পর মালাটি বড় হতে থাকে। বড় হতে হতে এক সময় বেশ বড় হয়। তারপর এক শুভদিনে রোগটিও সেরে যায়! এ রোগের নাম সকলের জানা। এ রোগ আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। জণ্ডিস। আজকাল এ রোগের প্রকোপ বেশি। কেউ কেউ এটাকে *'হলদে পালং'* বলে থাকে। জণ্ডিস হলে চোখ, হাত প্রভৃতি হলদে বর্ণ হয়ে যায় বলে এ নামকরণ। অনেকের ধারণা হলদে পাখি জণ্ডিস রোগীকে খাওয়ালে এ রোগের উপশম হয়। বলা হয়, পাখির হলুদ বর্ণ দেহের মধ্যে রোগের কারণে সৃষ্ট হলুদ বর্ণকে নষ্ট করে দেয়। আবার অনেকে জণ্ডিস রোগীকে হলুদ কম খেতে দেয়। কারণ তাতে নাকি হলদে পালং বেড়ে যায়। জন্ডিস নামের এ রোগ হলে চোখের কর্ণিয়া হলুদ হয়ে যায়। প্রায় সময় শরীরে একটু করে জ্বর থাকে। খাবারে রুচি থাকে না। শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

জণ্ডিস রোগের উৎপত্তি কিভাবে হয় বা কেন মানবদেহের রং হলদে হয়ে যায় তার ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত হল- বিলিরুবিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থের কারণে শরীরে হলুদ রং দেখা দেয়। কোন কারণে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর দেহকে বিশেষ করে, চোখের সাদা অংশ, জিহ্বা, হাতের তালু প্রভৃতি হলুদ রঙের হয়ে যায়। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যকৃত বা লিভারের গোলমাল থেকে জন্ডিস রোগের সৃষ্টি হয়। আর হেপাটাইটিস নামের এক প্রকার ভাইরাস এ গোলযোগের মূল হোতা। শরীরের যে পদার্থগুলো যকৃতের মধ্য দিয়ে অন্য অংশে যাতায়াত করে, যকৃতের গোলমালের দরুন তা পারে না। যকৃতে গিয়ে সেগুলো জমে যায়। এতেই হয় জন্ডিস। বারবার বদহজম, পেটের বিভিন্ন অসুখ, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস এবং নানা ওষুধের প্রতিক্রিয়া- এগুলো থেকেই লিভারের ক্ষতি সাধিত হয়। আর লিভারের গোলযোগ থেকেই হয় জন্ডিস। জন্ডিস ভালো করতে হলে নিয়ম করে ৩টি কাজ করতে হয়। কোনপ্রকার পরিশ্রম না করে কেবলই বিশ্রাম নিতে হবে। প্রচুর বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। পানির সাথে গ্লুকোজ মিশিয়ে পান করলে খুব ভাল হয়। কারণ, এ রোগে শরীরে অনেক গ্লুকোজ দরকার হয়। এ ছাড়া ডাব বা আখের রস খেলেও উপকার হয়। আর ঠিক ঠিক মতো খেতে হবে পথ্য। তেল-চর্বি জাতীয় খাবার সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। কড়া ঝাল বা জ্বালের খাবারও খাওয়া অনুচিত। এটুকু একটানা কয়েকদিন মেনে চলতে পারলেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জন্ডিস সেরে যায়। কারণ, এতে স্বাভাবিক নিয়মেই দেহে এন্টিবডি তৈরি হয়ে যায় এবং লিভার ফাংশনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। এ জন্য তেমন ওষুধ কিংবা মালা নেয়ার দরকার নেই।

www.i-onlinemedia.net

কিছু ভণ্ড কবিরাজ জণ্ডিসের চিকিৎসার নামে নানা কায়দায় এ হলুদ রংটাকে ব্যবহার করছে। স্বাভাবিক বিষয়টাকেই তারা অস্বাভাবিক করে তোলে। ওঝা বা কবিরাজ মশাইরা চালাকির আশ্রয় নেয়। আমগাছের ছাল বাটা রস এ কাজে ব্যবহার করে। আমগাছের এ রস তারা রোগীর হাতে মেখে দেয়, তারপর চুনগোলা পানিতে সেই রস মাখা হাত চুবাতে বলে। মুহূর্তে চুন মেশানো পানি হলুদ হয়ে যায়। আমগাছের রস চুনগোলা পানিতে মেশালেই সেই পানি হলুদ হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো কবিরাজ মশাই তার নিজ হাতে আমের রস মেখে নেয়। তারপর সেই হাত রোগীর গায়ে বুলিয়ে চুন মেশানো পানিতে চুবিয়ে নেয় আর তাতে পানির রং হলুদ হয়ে যায়।

এভাবে তারা রোগীকে বুঝিয়ে দেন যে, তার শরীর থেকে সকল হলুদ রং বের হয়েছে এবং সে এখন সুস্থ হয়ে গেছে। আসলে এর দ্বারা রোগের কিছুই হয় না।

আমাদের গ্রাম বা প্রায় শহর এলাকায় কারো জন্ডিস হলেই একমাত্র চিকিৎসা হিসেবে গলায় মালা পরানো হয়। অধিকাংশ কবিরাজ মালা পরানোর মাধ্যমে জণ্ডিসের চিকিৎসা করে থাকে। এটা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। এ ক্ষেত্রে তারা এমন কিছু গাছের ডাল ব্যবহার করে যার মধ্যখানে মূলত ফাঁকা থাকে অর্থাৎ ডালের ভিতরে সার পদার্থ থাকে না। এরই সূত্র ধরে সাধারণত বামনহাটি, আপাং ও ভৃঙ্গরাজের চিকন ডাল দিয়ে মালা বানানো হয়। এর মধ্যে বামনহাটিই বেশি ব্যবহার হয়। এ গাছগুলোর ডাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এতে যকৃতের রোগ কমে না। বামনহাটির শেকড়ে (ডাল নয়) জ্বর, কাশি, হাঁপানি ও গলগণ্ড রোগ সারে। জন্ডিস সারার কোন কারণ দেখা যায়নি। কবিরাজি চিকিৎসায় পিত্ত ঠাণ্ডা করে এমন গাছের পাতা বা ডালের রস খেতে বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে তুলসি, কাঁচা হলুদ, হরিতকি, কালোমেঘ ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বামনহাটি, আপাং বা ভৃঙ্গরাজের ডালে জন্ডিস সারতে পারে না। আর এ ডাল তো মালায় গাঁথা অবস্থায় শরীরের বাইরে থাকে। শরীরের ভেতরে গিয়ে সরাসরি কাজ করবার সুযোগ পায় না। তাই মালা ব্যবহারে রোগ সারবে কেন?

এ সব গাছের ডাল ছোট ছোট টুকরা করে তা সুতায় বেঁধে মালা তৈরি করে রোগীর মাথায় বেঁধে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, গলায় পরার পর মালাটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং রোগ শুষে নেয়। তাছাড়া, কথা থাকে যে, এ মালা মাথা থেকে যখন গলায় পড়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে, রোগ ভাল হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মানুষের মাথায় বা গলায় না পরিয়ে এমনি যেকোন জায়গায় রাখলেও মালাটি বড় হয়েছে। অতএব জন্ডিস রোগ সারার জন্য যে মালা দেয়া হয় তা বাড়ে আপনাতেই। মালা বড় হয় রোগের জন্য নয়, অন্য কারণে। বামনহাটি, আপাং বা ভৃঙ্গরাজের ডাল কেটে ছোট ছোট টুকরো করা হয়। কয়েকটি টুকরো একসাথে কিছু দূর দূর গিট দিয়ে বাঁধা হয়। কাঁচা ডালগুলো টান টান সুতার বেড় দিয়ে বেঁধে মালা বানানো হয়। প্রথমে কাঁচা অবস্থায় ডালগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকে। কিন্তু যত দিন

www.i-onlinemedia.net

যায়, ততোই ডালগুলো শুকোতে থাকে আর সুতার গিরাগুলো আলগা হতে থাকে। এটা তো হবেই। শুকানোর সাথে সাথে সুতার পাক ঢিল হয়ে ডালের মধ্যে ফাঁক বাড়তে থাকে। এতে মালাও লম্বা হতে থাকে। এভাবে প্রথম দেয়া মালাখানি কয়েকদিন পর দেখা যায় বেশ বড় হয়ে গেছে।

জন্ডিসের মালার এটাই হল রহস্য। মানুষ বা জন্ডিস ছাড়াই গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুরের গলায় বা এমনকি টেবিলে ফেলে রাখলেও মালা বাড়বেই। দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেও মালা বড় হতেই থাকবে। মালা বাড়ার চমকে গ্রামের সহজ-সরল মানুষ আকৃষ্ট হন অতি সহজে। এ সুযোগটাই নেয় প্রতারক কবিরাজরা। মালা দেয়া ও মালা পরানোর পর অনেক রোগী ভালও হয়ে যায়- এর কারণ কি!? কারণ হল, এ সব ভণ্ড, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক ওঝা-কবিরাজরা মালা দেবার সময় তারা রোগীকে পূর্বোক্ত পথ্যসমূহ খেতে দেয়। যেমন- রোগীকে বলা হয়, কোন কাজকর্ম না করে বিশ্রামে থাকতে। যথাসম্ভব বেশি বেশি ডাবের পানি খেতে বলা হয়। আবার, দুয়েক দিন গোসল করতেও নিষেধ করা হয়। কয়েকদিন কাজ ও নড়াচড়া না করে বিশ্রাম নিলে তো এমনিই জন্ডিস সেরে যায়। আর এর সাথে মনের জোরও কাজ করে। মালা পরানোর পর স্বাভাবিকভাবে রোগীর মনের জোর বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তাতেও কাজ হয়। মালা কিন্তু সত্যিকারভাবে কোনই কাজে আসে না।

জণ্ডিস রোগের চিকিৎসায় 'কলা পড়া' প্রথাও চালু রয়েছে আমাদের সমাজে। যে ওঝা বা কবিরাজ সাহেব কলা পড়া দিয়ে থাকে, তার কাছে ৭টি কলা নিয়ে যেতে হয়, তিনি ৩টি রেখে বাকি ৪টি কলা পড়ে দেয় রোগীর জন্য। আর, এ কলা পড়ায় রোগীর কোন লাভ হয় না। তবে, লাভ হয় একটি বিষয়ে, তা হচ্ছে, এ সুযোগে রোগী ও ওঝা বা কবিরাজ সাহেব এক সাথে কয়েকটি কলা পেট পুরে খেতে পারে।

জণ্ডিস রোগে আরেকটি চিকিৎসা পদ্ধতি দেখা যায় কিছু এলাকাতে। এ পদ্ধতিতে রোগীর মাথার তালু থেকে চুল সরিয়ে লতা-পাতা বাটা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে তার ওপর পদ্ম পাতা বা অন্য কোন পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এতে রোগীর উপকার তো হয়ই না, বরং কিছু ক্ষতি ও কষ্ট বাড়ে।

অন্যদিকে হাম, বসন্ত ইত্যাদির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য হিন্দুরা শীতলা দেবীর পূজা করে আর মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে সেসব বিশ্বাস করে। হিন্দু সাধুরা কুলা নিয়ে বের হলে মুসলিমরা তাতে দান-খয়রাত করে এবং ঠাকুরের কাছ থেকে পানি পড়া, ডাব পড়া ইত্যাদি নেয়। হাম চিকিৎসা আরেক অদ্ভুত ব্যাপার। কোন কোন এলাকায় হাম রোগটি লতি বা লুনতি নামে পরিচিত। হয়ত এ দেশের গোটা এলাকাতেই হামের এ বন্য পরিচিতি থাকতে পারে। হাম দেখা দিলে মানুষ পানি পড়া, ডোর পড়া, নানা রকম ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির সাথে সাথে আরেকটি অদ্ভুত চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারা নানারকম পাতা যেমন- নিমপাতা, আমপাতা প্রভৃতি এবং বিভিন্ন রকম দুর্বা পানিতে ভিজিয়ে রোগীকে সেবন করায়। সোনা-রূপার অলংকার ওই

www.i-onlinemedia.net

পানিতে ভিজিয়ে রোগীকে সেবন করায় এবং রোগীর দেহে ওই পানির ছিঁটা দেয়। রোগীকে বেশিরভাগ সময়ে বদ্ধ ঘরে রাখা হয়। মাছ, গোশ্ত ইত্যাদি জাতীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার রোগীকে খেতে দেয়া হয় না। তদুপরি, পলি মাছ ধোয়া পানিতে রোগীকে সপ্তাহান্তে গোছল করানো হয়। এতে রোগমুক্তি না ঘটে রোগীর নানা বিপত্তি ঘটতে থাকে। অনেক সময় নানা রকম লতা-পাতা বেটে রোগীর শরীরে মেখে দেয়া হয়। আবার অনেক কবিরাজ রোগীকে কলা পাতায় বসিয়ে বাসী মুখে রোগীর পিঠে ঝাড়া হয়। ঝাড়া শেষে দেখা যায় কলা পাতার ওপর সরিষার দানার মতো অসংখ্য আমলকি বর্ণের বিন্দু বিন্দু দানা জমা হয়ে যায়। এ সব দানা দেখে সবাই ভাবে যে, লুতির (হাম রোগের) সমস্ত পোকা বের হয়ে গেছে। আসলে এ সব ক্রিয়াকাণ্ড পুরোটাই মস্তবড় ভাঁওতাবাজি। কারণ, সজিনা পাতার অপর পিঠে ঐ ছোট ছোট দানাগুলো থাকে আর পিঠে ঝাড়ার সময় দানাগুলো পাতা থেকে ঝড়ে পড়ে যায়।

কলেরা একটি মারাত্মক রোগ। মানুষের ধারণা ওলাউঠা বা গলাকাটাভূত এ রোগ গভীররাতে ছড়িয়ে যায়। ওলা বিবি হল সাদা বা কালো কাপড় পরা কাল্পনিক ছায়ামূর্তি। এ ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী মূলত হিন্দু সমাজে পূজ্য পিসূচিকা রোগের দেবী। সাধারণ শ্রেণীর মুসলিমরা ওলাইচণ্ডীকে ওলাবিবি বলে থাকে। তারা তাকে খুব ভয় পায়, কেননা তাদের বিশ্বাস ঐ দেবীর মাধ্যমেই কলেরা (এ কালে ডায়রিয়াও) রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কলেরার জীবাণুকে খালি চোখে দেখতে পায় না বলেই হয়ত তাদের এ ধারণা।

আর এভাবে আমরা দেখি যে, নানা রোগের নানা রকম উদ্ভট, অবৈজ্ঞানিক ও শির্ক ও কুফরযুক্ত কতকর চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা এ সব করে। অধিকাংশ সময়ই রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে অর্থহীন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

www.i-onlinemedia.net

চিকিৎসায় তামার বালা
যারা করে তারা শয়তানের চেলা

শরীরে বাত ও অন্যান্য ব্যাথা-বেদনার জন্য অনেককে হাতে তামার বালা পরতে দেখা যায়। তামার বালায় যেকোন ব্যাথা সারে, এমন বিশ্বাস চালু রয়েছে আমাদের সমাজে। তাই ব্যাথায় কাতর রোগী ওষুধপত্র না খেয়ে হাতে বালা পরেন। যারা এটা বিক্রি করেন, তারা রোগীকে পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিয়ে বালা ধরিয়ে দেন। তামার বালা যারা বিক্রি করেন তারা বলেন, 'উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে বালা তৈরি করা হয়েছে। তাই এ উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহের বালা হাতে পরলে তা শরীরের ছোঁয়াতে যে ক্রিয়া করে তাতে বাত সেরে যায়।' আরও বলা হয়, 'ধাতু হিসেবে তামার কিছু নিজস্ব গুণাগুণ আছে। তামার এ নিজস্ব গুণও বাত সারাতে কাজে লাগে।' এখন কথা হচ্ছে, তামার তারে খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ চলাচল করে সেটা সত্যি। কিন্তু তারটি থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সরিয়ে নেয়ার পর কি এতে বিদ্যুৎ থাকে? নিশ্চয়ই থাকে না। তারে উচ্চ বা নিচ যেমন বিদ্যুতের প্রবাহই দেয়া হোক, পরে তো আর তাতে বিদ্যুতের ছিঁটেফোটাও থাকে না। এ অবস্থায় তারটি শরীরের মধ্যে কী কাজ করবে! তামার যে গুণ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাত-বেদনার ব্যাপারে তামার সেই গুণটি কাজে লাগে কিনা তাও কেউ হলফ করে বলতে পারেননি। অর্থাৎ বাত-ব্যাথা বিরোধী গুণ তামার মধ্যে আছে কিনা তা নিশ্চিত করে কেউ জানে না।

তারপরেও একটি প্রশ্ন থাকে। রোগীর শরীরে কী পরিমাণ বাত, ব্যাথা কতটা বেশি বা কম এবং সে অনুসারে কি পরিমাণ তামা দরকার, সেটা কি ঠিক করা হয়! এক এক রকম বাতে এক এক রকম তামা দরকার। সব বাতে নিশ্চয়ই একই বালা ব্যবহার করলে চলবে না। অথচ তামার বালা যারা বিক্রি করেন তাদের সবগুলো বালা একই ওজনের এবং একই মাপের। কোন হেরফের নাই একটির থেকে আরেকটির।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, বাত-ব্যাথায় তামার বালা ব্যবহারের কোন মানে নেই। বালায় বাত রোগী সারবেই এমন কথার অর্থ মানুষকে ঠকানো। অনেকদিন ধরে চলে আসা একটা অন্ধবিশ্বাস থেকে তামার বালা ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ বাত ব্যাথা-বেদনার যন্ত্রণা সইতে না পেরে অন্ধবিশ্বাসে বালা গ্রহণ করছে। আর এর সাথে বালাওয়ালারা অবৈধ রুজি কামিয়ে নিচ্ছে এবং এ উভয়পক্ষই জাহান্নামে তাদের শক্ত অবস্থান গড়ে নিচ্ছে, এই আর কি।

www.i-onlinemedia.net

অষ্ট ধাতুর আংটি-চুড়ি
ভাঁওতাবাজীর জারিজুরি

গ্রামের হাট-ঘাট-বাজার কিংবা রাজধানী ঢাকাসহ কোন কোন শহরের ফুটপাত অথবা রেল, লঞ্চ বা বাসে এক ধরনের ফেরিওয়ালা দেখা যায়। বগলে ব্যাগ একখানা। ব্যাগ থেকে হঠাৎ বের করে ধরে পোড়া লাল রঙের চওড়া চুড়ি। আঙুলের আংটিও কখনো সখনো। চুড়ি ও আংটি দুইই ধাতুর তৈরি। চওড়া চুড়ি বা বালা তৈরি হয় একটি ধাতু দিয়ে। নাম তার তামা। তবে আংটির মধ্যে রয়েছে অষ্টধাতু। অর্থাৎ আট রকম ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়া ওই আংটি। বালা এবং আংটি ফেরি করে বিক্রি করা হয় পথ-ঘাটে। সরাসরি মুখে মুখে বা টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে বলা হয়, 'অষ্টধাতুর আংটিতে এ রোগ, সে রোগ সারবে। অনেক রোগ-বালাই দূর হবে চিরতরে। বাসা বাঁধবে না সেগুলো শরীরে আর কখনো। যেকোন রোগ সারানোর উদ্দেশ্যে [নিয়তে] ব্যবহার করা যাবে এ বালা।' আট-আটটি ধাতুর মিশ্রণ! কম তো নয়!

ফেরি করে যে বালাটা বিক্রি হয়, বলা হয় তা তামার বালা। তামার বালায়ও এটা সেটা নানা রোগ দূর হয়। হাতে পরে নিলে ওই বালা, আর রোগ ঢুকবে না কখনো শরীরে। বিশেষ কয়েকটি রোগ। এমনই বলা হয়। আমাদের শরীরের জটিল কয়েকটি রোগব্যাধি সারাবার দাওয়াই হিসেবে বালা বা আংটি বিক্রি করা হয়। অনেকের ধারণা ধাতু আমাদের শরীরে নানা রোগের উপকার করে। তাই তারা ধাতব আংটি বা চেইন ব্যবহার করে। অনেকে বাত রোগ থেকে রেহাই পাবার জন্য তামার আংটি ব্যবহার করে থাকেন। আবার এগুলো বিক্রির সময় এমনও বলা হয় যে, এক সপ্তাহ, পনর দিন, একুশ দিন, এক মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যাবে। উপকার হবেই। বিফলে মূল্য ফেরত। সুতরাং লোকসান নেই।

অষ্টধাতুর ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখা যাক।

আটটি ধাতু একত্র করে মিশিয়ে যে নতুন একটি ধাতু বানানো হয় তা-ই হল অষ্টধাতু। ধাতু আটটি হচ্ছে- তামা, সোনা, লোহা, রূপা, দস্তা, সীসা, পারদ ও পিতল।

এখানে যে আটটি ধাতুর কথা বলা হল, এগুলোর সাথে রোগের বা ভাগ্যের কোন সম্পর্ক আছে কি? কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্যও এর কিছুই করার নেই। উপরন্তু, বাস, ট্রেন, বিমান বা নৌযান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এ সব ধাতুর সমন্বয়ে গড়া যানের যন্ত্রাংশের আঘাতেই মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আর অসুখ-বিসুখ! ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ খেলেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতে রোগ সারে। অন্য কিছুতে নয়। অষ্টধাতুতে তো নয়ই।

মানব শরীরের উপর এ সব ধাতুর কোন প্রভাব নেই। এটা মূলত একটা অলীক ধারণা। ধাতব পদার্থের তৈরি আংটি কখনও মানব শরীরের ভিতরে যায় না। অষ্টধাতুকে শরীর শুষে দিতে পারে না। অতএব ধাতুর দ্বারা কোন উপকার হয় না। আবার অনেকে বাণ মারার থেকে হেফাজত করার জন্য কোমরে তামার পয়সা, লোহা-সিসা প্রভৃতি ধাতু বাহুতে বা গলায় পরে থাকেন। আসলে, এ সব ধাতুর কার্যকারিতা ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই না।

www.i-onlinemedia.net

অবুঝ হতে বলে কবজ[১] নয় জীবনের রক্ষাকবচ

ইতিহাস পড়ুয়া ব্যক্তিমাত্রই জানে যে, ইতিহাসের একটা বড় জায়গা জুড়ে কয়েকটি চরিত্রের ভূমিকা রয়েছে খুব বেশি। এ চরিত্রগুলো হচ্ছে- ধর্মযাজক, পুরোহিত, যাদুকর, ওঝা, দরবেশ, ডাইনি, জ্যোতিষী ও পীর-ফক্বীর। এদের সকলের কর্মপদ্ধতি ও ধরন প্রায় একরকম। লোক ঠকানো, ধোঁকা দেয়া, বিচিত্র কথা বলে তাক লাগিয়ে দেয়া বা মোহাচ্ছন্ন করে ফেলা- এগুলোই হচ্ছে ইতিহাসের এ চরিত্রদের কর্মকুশলতা। এ সকল হাতিয়ার প্রয়োগ করে এরা অতীতে যেমন আয়-উপার্জন করেছে, তেমনি করছে বর্তমানেও। শহর ও গ্রামে ওঝা, দরবেশ, পীর, ফক্বীর, কবিরাজ, গণক, যাদুকর ও জ্যোতিষীরা এখন খুব জনপ্রিয়।

এক সময় ওঝা, দরবেশ, পীর, ফক্বীর, যাদুকর ও জ্যোতিষীদের সম্পর্কে মানুষের যে ভয়-ভীতি ছিল এখনো তা বহাল তবিয়তে বর্তমান রয়েছে, এতে কোন ভাটা পড়েনি আজও। পুরনো দিনে তন্ত্র-মন্ত্র, ভেলকিবাজী ও যাদুর কলাকৌশল দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণা করা হতো। ঠকিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিত। এখন কিন্তু যাদু একটা শিল্প হিসেবে সম্মানিত মর্যাদা পেয়েছে। যাদু আর ভীতিকর কিছু নয়। বরং আনন্দদায়ক বিনোদনের অন্যতম এক মাধ্যম (!?) কেবল বিনোদনই-বা বলি কেন, শিক্ষামূলক মাধ্যমও বটে (!?) আনন্দ লাভের পাশাপাশি শেখা-জানাও যায় অনেক কিছু! যেমন, আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যাদুকর জুয়েল আইচের কথাই ধরা যাক। জুয়েল আইচের মোহনীয় হাসির পাশাপাশি তাঁর যাদুগুলো কত আনন্দেরই না যোগান দেয়! আবার তার সাথে শিক্ষণীয়ও কত ব্যাপার থাকে! সুতরাং যাদু বা যাদুকরদের নাম শুনলে আগেকার মতো আঁতকে ওঠার দরকার হয় না। তবে অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজে এখনও অনেক ভণ্ড যাদুকর রয়েছে। যারা যাদুর ভেল্কিবাজীতে শিকার খুঁজে বেড়ায়। মানুষের মন ও চোখ দুটোকে ধোঁকা দিয়ে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করে। হয়ত দেখা গেল, একজন তাবিজ বা কবচ বিক্রি করছে। সে এমন সব কাণ্ড ক'রে তার তাবিজের মাহাত্ম্য দেখিয়ে দিল যে, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের তাতে বশীভূত না হয়ে বা ঠকে উপায় থাকে না।

এ বিষয়ে একটা গল্প বলে নিই। একবার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এক সাধু বাবাজীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি নাকি অনেক আশ্চর্য কাণ্ডের সঙ্গে এক আশ্চর্য কবচও বিক্রি

---

[১] যে পত্রে বা কাগজে মাদুলি ইত্যাদির মন্ত্র লেখা হয় তা হচ্ছে ***কবজ বা কবচ***। ***রক্ষাকবচ*** হচ্ছে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধারণীয় মন্ত্রপূত কবচ। ***কবচকালী*** হচ্ছে রোগ, মহামারী প্রভৃতি থেকে পরিত্রাণকারী হিন্দু দেবী। ***কবচমন্ত্র*** হচ্ছে যে মন্ত্র জপ করলে বিপদ স্পর্শ করে না বা বিপদ ত্রাণকারী মন্ত্র।

www.i-onlinemedia.net

করছিলেন। সারা ভারত জুড়ে তার নামধাম ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার একজন সাংবাদিক এটা জানতে পেরে এ বিষয়ে বেশ কৌতূহলী হয়ে তিনি আন্দামান গিয়ে পৌঁছান। নাজমুল নামে এই সাংবাদিক ভদ্রলোক নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দেখেন প্রচণ্ড ভীড়। উপচেপড়া ভীড়। ভীড় ঠেলে অবশেষে তিনি সাধু বাবাজীর কাছাকাছি পৌঁছলেন। সেখানে দেখতে পেলেন, সাধু আগ্রহী মানুষের হাতে একটি করে কবচ ধরিয়ে দিচ্ছেন। কিছু সময় পর কবচগুলো এত গরম হয়ে উঠছিল যে, তা আর হাতে ধরে রাখা যাচ্ছে না। সবাই কবচ মাটিতে ফেলে দিচ্ছিল। গরম হওয়াটাই নাকি কবচের তেজের প্রমাণ। সাধু তাই জানালেন। এর কিছু সময় পর কবচ থেকে 'বিভূতি' বা 'পবিত্র ছাই' (!?) বেরোতে লাগল। আর অমনি সেই বিভূতি নেবার জন্য মানুষের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এ ছাই তো জবরদস্ত ছাই না হয়েই পারে না।

ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা, কুরআন, হাদীস ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা রাখা নাজমুল সাহেবও প্রথমে কবচের গরম হওয়া দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার চমক কেটে যায় সেই বিভূতি দেখে। কারণ, এ বিভূতিটা তার পূর্ব পরিচিত। অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম মেশানো যেকোন ধাতু মারকিউরাস ক্লোরাইডের সংস্পর্শে এলে প্রথমে খুব গরম হয় এবং পুড়ে হয় ছাই। ঠিক এখানেই সাধুর ভেল্কিবাজী। সাধু বাবাজী অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কবচ মানুষের হাতে তুলে দেবার আগে মারকিউরাস ক্লোরাইডে মাখিয়ে নিয়েছেন। এতে তাপ ও ছাই দুইই সৃষ্টি হয়েছে।

আর, এভাবেই অনেক ঠগ, প্রতারক বিভিন্ন আশ্চর্য কলাকৌশল দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণা করে। পথে-ঘাটে চলতে ফিরতে এমন অনেক ঘটনাই আমাদের নজরে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাগুলো অসম্ভব বা অলৌকিক মনে হলেও আসলে সেগুলো যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়। মানুষের মনে সর্বদাই দুর্বল একটা কোণ থাকেই। আর সাধারণ, অসচেতন ও প্রকৃত ঈমানের স্বাদবঞ্চিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের তো কথাই নেই। তাদের মন সর্বদাই দুর্বল। এ মানসিক দুর্বলতার সুযোগে তথাকথিত ওঝা, দরবেশ, পীর, ফক্বীর, কবিরাজ, গণক, যাদুকর ও জ্যোতিষীরা নিজেদেরকে অলৌকিক ক্ষমতার (কারামত) অধিকারী বলে ঘোষণা করে। যা খুব চরম গর্হিত অন্যায় বলেই প্রতীয়মান হয়।

www.i-onlinemedia.net

কবচ-মাদুলি-তাবিজ
হতাশ হয় মফিজ!

পাতলা ফিনফিনে কাগজ। সাদা রং। দুই বা তিন রঙ্গে লেখা। আরবী হরফ। বৃত্তাকার লেখা কোনটি। কোনটি আয়তাকার বর্গক্ষেত্রের মতো। ত্রিকোণাকার লেখাও রয়েছে। কাগজের ছোট ছোট টুকরো। সব মিলিয়ে বৈচিত্রের একটা আয়োজন আছে বৈকি! এমনই প্রকৃতির এক একটি কাগজ এক মুখবন্ধ তামার নলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ঢোকানোর পর অন্যমুখে মোম লাগিয়ে সেদিকটাও বন্ধ করা হয়। এবার এটা হয়ে যায় নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ থেকে শুরু করে মানবজীবনের যত বালা-মুসীবত আছে সব আসান করে দেবার মহৌষধ।

কোথায় মেলে এ মহৌষধ? রাস্তার ফুটপাত ঘেঁষে তিনদিক এক হাত উঁচু লালসালু দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে দু'দিক থেকে কিছুটা কাপড় এসে থেমে গেছে। একটুখানি জায়গা একটা গেইটের মতো রেখে ঘেরাও সম্পন্ন হয়েছে। এর মাঝে একজন সফেদ পোশাক-আশাক পরা, নাদুস-নুদুস শরীরের এক বা একাধিক মানুষ। এক ধরনের গাম্ভীর্য তাদের চোখে-মুখে। মুখের অনেকটাই দাড়িতে ঢাকা বলে পুরো মুখ দেখার উপায় নেই। আগত মানুষজনদের নিকট সমস্যার বিবরণ শুনে নেন। তারপর এক মহৌষধ যা তাবিজ বা মাদুলি নামে পরিচিত তার একটা করে টুকরো হাতে ধরিয়ে দেন। এটা দেবার সময় ক্ষণকালের জন্য চোখ জোড়া মুদে বিড়বিড় করে কী উচ্চারণ ক'রে তারপর তুলে দেন হাতে। সে সঙ্গে বলে দেন, কালো সুতায় পরিয়ে মাদুলিটি কোথায়, কতদিন বেঁধে রাখতে হবে। কারো হাতে, কারো গলায়, আবার কারো কোমড়ে। গ্রহীতা তখন পরম বিশ্বাসে মাদুলিদাতার চাহিদা মিটিয়ে দিয়ে মাদুলিখানা নিয়ে নির্দেশ মতো ব্যবহার করতে শুরু করে। কেবল যে ফুটপাথ তা তো নয়। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পীর, হুজুর, সূফী ও দরবেশ বাবারা তাবিজ ও মাদুলি দিয়ে মানুষের মহাউপকার (!) করার আখড়া গেড়ে বসেছে। তাছাড়া, ট্রেন, বাস, স্টিমারেও মাদুলি বিক্রেতা নজরে পড়ে হরহামেশাই। প্রথমে নানাভাবে লোকজন আকর্ষণ করে গোলাকার বৃত্ত তৈরি করা হয়। এরপর মাদুলির কার্যকারিতা বয়ান করা হয় কিছুটা সময় নিয়ে। তারপর বিক্রির পালা। অবশ্য এটা বিক্রির সময় কেনাবেচা বা দাম বলতে নারাজ তারা!? স্রষ্টার নামে, স্রষ্টার কালামে সমস্যার সমাধান এবং এ জন্য দাম নয় হাদিয়া গ্রহণ করেন বলে জানান তারা।

মফিজ মিয়া এক হাটবারে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার ফাঁকে তাবিজওয়ালার নাগালে আসে। সে দাঁড়িয়ে তার কথা শোনে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে। শুনতে শুনতে সে উপলব্ধি করে, যেসব সমস্যার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো তো তারও রয়েছে। যেমন তার রয়েছে দীর্ঘদিনের বাতের বেদনা। তার বউয়ের রয়েছে নারীরোগ। আর সাড়ে চার বছরের মেয়েটি প্রতিদিন বিছানা ভিজিয়ে সপসপ করে

www.i-onlinemedia.net

প্রস্রাব করে দেয়। এ তিন সমস্যার নাকি সমাধান দেবে মাদুলি। সুতরাং না নিয়ে উপায় কী? হাদিয়া পরিশোধ করে তিনটি মাদুলি গ্রহণ করে সে। দোকান থেকে কালো সুতা কিনে নেয় দরকার মতো। তিনজন ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্থানে বেঁধে রাখে। মেয়াদ পূর্ণও হয়। এক মাস। কারোরই কোন উপকারের আলামত দেখা যায় না। আরো এক মাস। এভাবে তিন মাস বেঁধে রাখার পরও কারো কিছু হল না। বরং ওদের স্বামী-স্ত্রীর রোগটা আরো বেড়েছে বলেই মনে হয়। এরপর আরো মাস খানেক রেখেও কোন ফল না পেয়ে খুলে ফেলেছে ধাতব মাদুলিগুলো সবার শরীর থেকেই। বিরক্ত ও অবিশ্বাস জন্মে গেছে ততদিন মফিজ মিয়ার।

ব্যাপারটা কিন্তু অবিশ্বাসেরই। কেন? তামার মুখ আঁটা নলের মধ্যে আরবী অক্ষরে লেখা কিছু শব্দ পুরে দেয়া হয়। এর কি কোন ওষুধী গুণ আছে? না, নেই। তাহলে রোগ নিরাময় হবে কীভাবে? একই আয়াতে শরীরের সব রোগ-শোক দূর করা যদি যেত, তাহলে কী আর এ নশ্বর পৃথিবীতে ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল- এগুলোর দরকার পড়ত! এগুলোর পেছনে যে এত এত কাড়িকাড়ি টাকা ব্যয় করা হয় সেগুলো তো তাহলে অর্থহীন বলে মনে করা যেত। অর্থহীন নয় বলেই তো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য মানুষের এত আয়োজন, এত শ্রম, এত অর্থ বিনিয়োগ। আসলে এ সব শব্দ, কাগজ, তাবিজ, তোকমা ও মাদুলির কোন গুণ নেই। যদি কিছুটা থাকে তা ওই ধাতুটির। তামার। যা দিয়ে মাদুলি বানানো হয়েছে। কোন কোন ধাতু শরীরের সংস্পর্শে এসে শরীরে কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তবে কোন রোগের জন্য কোন ধাতু উপকার করে এবং তার প্রয়োজনীয় পরিমাণই বা কতটুকু তা ওই মাদুলিওয়ালা কখনো নির্ণয় করেন না। তিনি একই আয়তনের মাদুলির মধ্যে একই কাগজ এবং একই শব্দ লেখা কাগজ ঠেসে দেন। সব রোগ বা সমস্যার জন্য একই মাদুলিই তুলে দেন কাঙ্ক্ষিত হাদিয়া নিয়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাদুলিতে অসুখও সারে না, সমস্যাও দূর হয় না। সাধারণ এবং অন্ধ-অচেতন মানুষ কেন তবে মাদুলি ব্যবহার করে? এর নিশ্চয়ই কিছু কার্যকারণ আছে। মানুষ যখন অসুখ-বিসুখে কাতর হয়ে ডাক্তার-ওষুধ হাতের নাগালে পায়নি তখন একশ্রেণীর অসাধু লোক ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে মাদুলি ব্যবসাটা ফেঁদে বসে। এটাই চলছে যুগ যুগ ধরে। এ ছাড়া, এ ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীরা লালসালু, পাতলা কাগজ, রঙচঙে বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে ছাপা ইত্যাদি প্রদর্শন এবং মুখ ভঙ্গিমায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য উপস্থাপন করে একটা ঐন্দ্রজালিক আবহ তৈরি করেন। এতে সরল-সাধারণ মানুষ তো বটেই, সেখানে চেতনাহীন আধুনিক মানুষও মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। এ সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আয়-উপার্জনের পথ করে নেন মাদুলি ব্যবসায়ীরা। আমাদের আসলে কোন কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণও নয়, বর্জনও করা উচিত নয়। ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গ্রহণ-বর্জন করতে শেখা

www.i-onlinemedia.net

দরকার। সে জন্য নিজের ভেতর সত্যসন্ধানী, অনুসন্ধিৎসু মন গড়ে তুলতে হবে। সত্য খুঁজতে শিখলে অন্ধধারণা দূর করা যাবে। অকারণে মোহাবিষ্টও হতে হবে না তখন।

প্রকৃতপক্ষে, সকল প্রকার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক এবং নির্ধারকও একমাত্র আল্লাহ্। তবুও যুগে যুগে মানুষের মনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, কাঙ্ক্ষিত সুসময় বা অনাকাঙ্ক্ষিত মন্দসময় আসার পূর্বেই কি মানুষ তা কোন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে জানতে পারে? কারণ, এটা যদি সম্ভব হতো, তাহলে দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে সাফল্য নিশ্চিত করা যেত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই কিছু কিছু মানুষ এ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করেছে। ফলে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক অর্থকড়ি খরচের মাধ্যমে তাদের জন্য নির্ধারিত ভাগ্যের লিখনের অদৃশ্য তথা সংঘটিতব্য বিষয়াবলী জানতে তথাকথিত ভবিষ্যৎবক্তার পিছনে ঘুরঘুর করেছে। তাই সৌভাগ্য আনয়নে বিভিন্ন প্রকার তা'বিজ, কবজের ছড়াছড়ি অধিকাংশ সমাজে প্রায়ই দৃষ্টমান হয়। কিছু কল্পিত গোপনীয় পথ ও পদ্ধতি রয়েছে যেগুলোকে সাধারণত বিশেষ জ্ঞান বলে গণ্য করা হয়; ফলে বিভিন্ন প্রকার শুভ-অশুভ আলামত ও এগুলোর ব্যাখ্যা বিভিন্ন সভ্যতায় বিদ্যমান রয়েছে। এ সব জ্ঞানের যৎসামান্য গোপন অংশটি অবশ্য যাদুমন্ত্র ও ভাগ্যগণনার বিভিন্ন প্রকার জ্যোতিষশাস্ত্র রূপে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়েছে।

মানব সমাজে এ সব চর্চা করার ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করার কারণে এ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে প্রকাশ করা অতি জরুরী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, এ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে, ঐসব চর্চার অভ্যন্তরে বিদ্যমান শির্কে যেকোন মুসলিম খুব সহজেই লিপ্ত হতে পারে। ঐ সব কথিত দাবী যা আল্লাহ্র একক গুণাবলীর (সিফাত) বিরুদ্ধে সর্বদা ক্রিয়াশীল এবং সৃষ্টির উপাসনার ('ইবাদাত) ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কিংবা সৃষ্টির উপাসনার দিকে মানুষকে তাড়িত করে- এর সাথে ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা এখানে আলোচনা করা হবে। কুরআন ও রাসূলের বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে প্রতিটি দাবী বিশ্লেষণ করা হবে এবং প্রতিটি দাবী সম্পর্কে তাঁদের জন্য নির্দেশনা আকারে ইসলামি বিধানাবলী জানানো হবে যাঁরা আন্তরিকভাবে প্রকৃত তাওহীদের বাস্তবতাকে খুঁজছেন।

শয়তান তাড়িয়ে সৌভাগ্য আনয়ন করতে কঙ্কন/বালা, চুড়ি, পুঁতির মালা, ঝিনুক ইত্যাদি কবচ হিসেবে পরার রেওয়াজ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমকালীন আরবের জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এছাড়া সৌভাগ্য বহনকারী বিভিন্ন প্রকার তাবিজ ও মন্ত্রপূত কবচ পৃথিবীর প্রায় সব এলাকায় পাওয়া যেত। মূলত যাদু, মন্ত্রপূত কবচ ও তাবিজের মত সৃষ্ট বস্তুকে শয়তান দূরীকরণ ও সৌভাগ্য আনয়নকারী হিসেবে বিশ্বাস করা মানে আল্লাহ্র উপর সত্যিকারের বিশ্বাসের বিরোধিতা করা। শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময়ে বিদ্যমান এ সকল বিশ্বাসের বিরোধিতায় ইসলাম এ কারণে সদা সক্রিয় ছিল যাতে এমন একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হয় যাতে যখনই বা যেখানেই অনুরূপ বিশ্বাসের আত্মপ্রকাশ লাভ করুক না কেন তৎক্ষণাৎই যেন তা

www.i-onlinemedia.net

বাতিল ও নিষিদ্ধ করা যায়। এ ধরনের বিশ্বাস মূলত মূর্তিপূজকদের সমাজে পৌত্তলিকতার ভিত্তি দৃঢ়তর করে তোলে এবং যাদুমন্ত্র স্বয়ং মূর্তিপূজারই একটি অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ সকল বিশ্বাসের সাথে খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়; কারণ নাবী যিশুকে [ঈসা (আ:)] এরা শুধু প্রভুত্বের আসনেই উন্নীত করেনি, বরং তাঁর মাতা মেরিসহ (মারইয়াম) বিভিন্ন সাধুদের উপাসনা করে। অধিকন্তু তারা সৌভাগ্য আনয়নের উদ্দেশ্যে তাঁদের কল্পিত আকৃতি সম্বলিত ছবি, মূর্তি ও পদককে সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করে।

নাবী ﷺ-এর সময় নবদীক্ষিত মুসলমানগণ প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করত যা আরবীতে তামা'ইম (একবচনে 'তামীমাহ') বলা হয়। এর ফলে, রাসূল ﷺ-এর অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে তিনি জোরালোভাবে এ ধরনের সকল চর্চাকে নিষিদ্ধ করেছেন। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল:

'ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন, 'একটি লোকের হাতের বাহুতে বালা দেখে রাসূল ﷺ লোকটিকে বললেন, লা'নত পড়ুক তোমার উপর! এটা কী? লোকটি উত্তর দিল যে, *আল-ওয়াহিনাহ*[১] নামক এক রোগ হতে রক্ষা পেতে এটি ব্যবহার করছি। তারপর রাসূল ﷺ বলেন: এটাকে পরিত্যাগ কর, নিশ্চয়ই এটা শুধু তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে। আর তুমি যদি এটা পরা অবস্থায় মারা যাও, তবে তুমি কখনই সফলকাম হবে না।'[২]

সুতরাং পিতল, তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে প্রস্তুত ধাতু বা লোহা বা তামার তৈরি বালা, চুড়ি ও আংটি যদি কোন অসুস্থ বা স্বাস্থ্যবান লোক পরে এই বিশ্বাসে যে, এগুলোর মাধ্যমে অসুস্থতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বা রোগের উপশম হয়, তাহলে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, এ বিষয়টি 'হারাম (নিষিদ্ধ) দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসা নিষিদ্ধ' নামক বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা একে অপরের অসুস্থতার চিকিৎসা কর, তবে নিষিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করো না।'[৩]

আবূ ওয়াকিদ আল-লাইছি বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যখন হুনাইয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে *যা-তু আনওয়াত*[৪] নামক এক বৃক্ষ অতিক্রম করলেন। সৌভাগ্য লাভের আশায় এ গাছের ডালে ডালে মূর্তিপূজারীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। ইসলামে নবদীক্ষিত কয়েকজন সাহাবী রাসূল ﷺ-কে ঐ বৃক্ষটির মতো অন্য একটা বৃক্ষকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে বলল। রাসূল ﷺ বললেন, *সুবহানাল্লাহ!*[৫] এ বিষয়টি তো ঠিক সেই রকম যা মূসা (আ:)-কে লোকজন বলেছিল:

---

[১] আভিধানিক অর্থে *অসুস্থতা*। সম্ভবত গেঁটে বাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
[২] *আহমাদ*, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক সংগৃহীত।
[৩] আবূ দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত, *সুনান আবি দাউদ*, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৮৭।
[৪] আভিধানিক অর্থে, 'এমন ধরণের বস্তু যার উপর কিছু ঝুলছে'।
[৫] এর অর্থ 'আল্লাহ্ তা'আলা মহা পবিত্র'।

www.i-onlinemedia.net

﴿...اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ... ﴿١٣٨﴾﴾ (سورة الأعراف: ١٣٨)

• '...আমাদের জন্যও 'কোন দেবতা বানিয়ে দাও যেমন তাদের দেবতা আছে...।' [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৩৮]

যাঁর হাতে আমার এ প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা সবাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।"[১]

এ হাদীছে রাসূল ﷺ শুধু সৌভাগ্যের আলামত ও বস্তুগুলোর ধারণাকেই নাকচ করেন নি; বরং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে মুসলিমরা খ্রিস্টান ও ইহুদীদেরকে অনুকরণ করবে। যিক্‌র করার জন্য মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত তথাকথিত তসবীহ নামক গুটিকার মালা মূলত ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের জপমালার অনুকরণ, বড়দিনের অনুকরণে মিলাদ[২] (রাসূলের জন্মদিন পালন) এবং পীর, বুযুর্গ, দরবেশ, ওলী বা আওলিয়াদেরকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশ্বাস করার সাথে খ্রিস্টানদের যাজক, পাদ্রী ও ধর্মীয় পণ্ডিত এবং মক্কার তৎকালীন মুশরিকদের মূর্তিকে মধ্যস্থতাকারী বলে গ্রহণ করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। রাসূলের ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী ইতোমধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে!

যারা মন্ত্রপূত কবচ ব্যবহার করে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলে রাসূল ﷺ তা'বিজ ও কবচ ব্যবহারের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদেরকে আরো জোয়ালোভাবে সতর্ক করেছেন। 'উক্বাহ ইবনে 'আমির বর্ণনা করেন যে একদা রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে ব্যর্থতা ও অস্থিরতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করান, যে নিজে মন্ত্রপূত তা'বিজ-কবচ পরে ও অন্যকে পরায়।'[৩]

সাহাবীগণ যাদুমন্ত্র ও তা'বিজ-কবচ সম্পর্কে রাসূলের ﷺ বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। ফলে এমন অনেক ঘটনা হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন

---

[১] তিরমিযি, নাসাঈ ও *আহমাদ* কর্তৃক সংগৃহীত। শায়খ আল-আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; *সহীহ সুনান তিরমিযি*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), খণ্ড ২, পৃ. ২৩৫, হাদীস নং ১৭৭১।

[২] বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন মূলত অমুসলিম সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা নিজেদের দেশজ বা পূর্বধর্মের রীতিনীতি ত্যাগ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ-অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব, পারসিক ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, যার মধ্যে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নাবী অন্যতম। (বিস্তারিত দেখুন: *এইইয়াউস সুনান*, পৃ. ৫২৩)

[৩] *আহমাদ* ও আল-হাকীম কর্তৃক সংগৃহীত।

www.i-onlinemedia.net

গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যার মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীরা তাঁদের সমাজের পাশাপাশি নিজেদের পরিবারের মধ্যে যখনই এ ধরনের কোন কিছুর চর্চা করার প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন তখনই তাঁরা এ ব্যাপারে সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। 'উরাহ বর্ণনা করেন যে, সাহাবী হুযাইফা (রাঃ) একটি অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়ে ঐ লোকটির বাহুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিঁড়ে ফেলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾﴾

(سورة يوسف: ١٠٦)

'অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে।'

[সূরা ইউসুফ (১২): ১০৬][1]

অন্য সময়, তিনি অসুস্থ লোকটির বাহুতে একটি *খিয়াত* নামক বালার সন্ধান পেয়ে সে সম্পর্কে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি উত্তর দিল, বিশেষ করে আমার নিজের জন্য মন্ত্রপূত বস্তু। তৎক্ষণাৎ লোকটার বাহু থেকে সেই বস্তুটি ছিঁড়ে ফেলে হুযাইফা বললেন, তুমি যদি এটা তোমার সঙ্গে থাকাবস্থায় মারা যেতে, তাহলে আমি কখনোই তোমার জন্য জানাযা সলাত আদায় করতাম না।[2]

তা'বীজ-কবচ সম্পর্কে ইসলামের বিধান

পূর্বে উল্লেখিত রাসূল (ﷺ) কর্তৃক মন্ত্র, তা'বিজ-কবচ, সূতা, তাগা, অবৈধ ঝাড়-ফুঁক ও যাদুর নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুধু আরব দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। কোথাও যদি কোন বস্তুকে ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তবে সেখানেই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সমাজে এখনও বিভিন্ন প্রকারের জাদুমন্ত্রের ছড়াছড়ি প্রত্যক্ষ করা যায়। অনেক তা'বিজ-কবচ, সূতা, তাগা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে যে কেউ এ সম্পর্কে ভাবার অবকাশ পায় না। কিন্তু এ সব তা'বিজ-কবচের উৎস দেখিয়ে দিলে, এগুলোর মূলে শির্কের শক্ত অবস্থান দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[3]

---

[1] *আহমাদ* ও আল-হাকীম কর্তৃক সংগৃহীত। ইবনু কাসীর, *তাফসীর*, ২/৪৯৫।

[2] ইবনে আবী হাতীম কর্তৃক সংগৃহীত। আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, এ বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠা।

[3] তা'বীজ-কবচ সম্পর্কে ইসলামের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. মুয্যাম্মিল আলী কর্তৃক রচিত, *শির্ক কী ও কেন*, পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৮।

www.i-onlinemedia.net

হাত চালা
বাড়ায় জ্বালা

হাত, বাটি বা বদনা চালানোর একটি কথা শোনা যায় গ্রাম, শহর সব জায়গায়। দামি জিনিসপত্র হারিয়ে গেলে এ সব পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়। হাতের আংটি, গলার মালা, পকেটের মানিব্যাগ, হাতের ঘড়ি কোথাও পড়ে গেল অথবা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। অনেক অনুসন্ধান চলল। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজা হল। না, কোথাও নেই। হয়রান হয়ে অবশেষে ডেকে আনা হল পাড়ার পুরনো ওঝাকে। হাত চালান দিয়ে হারানো বস্তুটিকে খুঁজে বের করবেন তিনি। হয়ত বেশ নাম-যশ আছে তার এ ব্যাপারে। এ জন্য তার ওপর আস্থা জন্মাতেই পারে।

নির্দিষ্ট বাড়িতে ওঝা এসে হাত চালানোর জন্য একজন লোক ঠিক করেন। সবাইকে দিয়ে হাত চালানো হয় না। দরকার হয় একজন হাত-চলা লোক। রাশি-গ্রহ-নক্ষত্র মিলিয়ে হাত-চলা লোক নির্বাচন করা হয়। হাত-চলা লোকটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নাগালের মধ্যে নিয়ে মাটির ওপর বসিয়ে দেন ওঝা। ডান হাতটা তার সামনে বাড়িয়ে মাটি ছুঁয়ে থাকবে। হাতটা এমনভাবে মাটি স্পর্শ করে থাকবে যাতে শরীরের পুরো ভর থাকবে হাতের ওপর। এরপর ওঝা তাকে চোখ বন্ধ করে বা একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে থাকতে বলে তিনি মন্ত্র পড়া শুরু করেন। কিছুক্ষণ একটানা মন্ত্র পড়ার পর হাতের ওপর থাপ্পর কষে দিলে হাত-চলা লোকটির হাত চলতে শুরু করবে। হাত-চলা মানে তার শরীরও চলতে থাকা। হ্যাঁ, চলমান হাতটাই হারানো জিনিসটির সন্ধানে তখন ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে হয়ত থেমে গেল হাতখানি। অমনি সবাই দুদ্দাড় খুঁজতে লেগে যায় হারানো জিনিসটি, থেমে যাওয়া স্থানে। কখনো কদাচিৎ পাওয়া যায় হয়ত জিনিসটি। বেশিরভাগ সময়েই কিন্তু তা মেলে না। তখন ওঝা বাবাজী অসহায় অবস্থায় পড়ে যান। তবে না, তার উত্তরও তৈরি থাকে। চালাচালি করে জিনিস না পাওয়া গেলে তিনি বলেন, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে গেছে ওটি। হাত এভাবে চলতেই থাকবে। সামনের দিকে এগোতেই থাকবে। মাটিতে হাত ঘষে কতক্ষণ আর চলবে! তবে যেদিক পানে এগোচ্ছে হাত, সেদিকেই রয়েছে জিনিসখানি। এমন অবস্থায় ওঝা দিক নির্দেশনা বাতলে হাত চালানো পর্ব স্থগিত করে দেন। অনেক সময় অন্য কথাও বলেন তিনি। একে দিয়ে হবে না। এর রাশি বা গ্রহ-নক্ষত্রে গোলমাল আছে। অথবা বলেন, আদৌ কিছু হারানো যায়নি। এ বাড়িতেই আছে ওটি। তাই হাত আর সামনে এগোতে চাইছে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

আসল ঘটনা কিন্তু ভিন্ন। হাত চালানো ব্যাপারটিই একটি অন্ধবিশ্বাসজনিত পদ্ধতি। কুসংস্কারের গোঁড়ামী থেকে এর উৎপত্তি ও বহাল থাকা। ব্যাপারটি এ রকম- হাত চলা লোকটিকে যেভাবে বসানো হয় তাতে শরীরের পুরো ভার থাকে হাতের ওপর। এতে হাতের সামনে এগিয়ে যাবার জন্য সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি হয়। এর

www.i-onlinemedia.net

ওপর ওঝা যখন হাতে থাপ্পর হাঁকিয়ে দেন তখন হাতটা একটু নড়ে যায়। আর এতে মাটিতে ঘষা খেয়ে হাতের তালুতে একটু সুড়সুড়ি লাগে। সুড়সুড়ি লাগা হাত স্বভাবতই সামনে এগোতে থাকবে। লোকটিই সুড়সুড়ি থামানোর জন্য সামনে এগিয়ে দেবে হাতখানি। এরপর যোগ হয় ওই লোকটির অন্ধবিশ্বাসের অনুভূতি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসী লোকটি তার মানসিক দুর্বলতায় হাত সামনে এগিয়ে নিতেই থাকে। আপনা থেকেই সামনে ঠেলে নিয়ে যায় তার হাত দুখানি। তখন তার ভেতর কাজ করতে থাকে ভিন্ন এক আবেগতাড়িত মোহাচ্ছন্নতা। অন্ধ দুর্বলতায় কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ক্রমাগত চলতেই থাকে। যেন আপনা থেকে নিজ মনে চলছে তো, চলছেই। ওদিকে কিন্তু হাত দুটোর দফা-রফা হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল ধরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসচেতন সমাজে হাত চালানোর এ ধাপ্পাবাজী চলে আসছে। ধাপ্পাবাজ ওঝারা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এটা চালু রেখেছেন:

১. হাত চালানোর জন্য রাশি-নক্ষত্র মিলিয়ে লোক নির্বাচন।
২. শরীরে ভার মাটির ওপর রেখে বসার ভঙ্গী, এবং
৩. অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ দুর্বল মন।

এ তিনটি উপাদান একত্রে যুক্ত হয়ে হাত চালানোর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলছে।

www.i-onlinemedia.net

বাটি চালা
নাটক মেলা

চোর ধরা বা চোরাই মালামাল উদ্ধারের জন্য গ্রামাঞ্চল ও কিছু কিছু শহরে চালু রয়েছে বাটি বা বদনা চালা। চুরি হবার পর চোর ধরার এটা একটা বড় উপায় বলে চলে আসছে অনেকদিন ধরে। প্রকৃত শিক্ষা না থাকলে কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন থাকবে মানুষ। আর কুশিক্ষা মানে হল অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামী ইত্যাদি। বাটি বা বদনা চালা হচ্ছে তেমনি এক কুসংস্কার।

বাটি বা বদনা চালার চালাচালি এবার দেখা যাক।

খবর পেয়ে চুরি যাওয়া বাড়িতে ওঝা বাবাজী উপস্থিত হয়ে ধূপ, ধুনা বা আগরবাতি জ্বালান। তারপর খোঁজ করেন একজন বাটি চালা লোক তথা তুলা রাশির জাতককে। তেমন খুঁজে বের করা গেলে তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে সামনে রাখে একখানি বাটি বা বদনা। এরপর শুরু হয় একাধারে যাদুমন্ত্র পড়া। ইতোমধ্যে বাটি বা বদনা চালা লোকটির দু'হাতে বাটি বা বদনা ধরতে দেয়া হয়। চারদিকে উৎসুক লোকের ভীড়। মন্ত্রপাঠের এক পর্যায়ে হয়ত বাটি একটু নড়ে উঠল। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। বাটি নড়েছে, বাটি নড়েছে! ওদিকে তন্ত্র-মন্ত্রপাঠ চলছেই। কিন্তু আর বাটির নড়ন-চড়ন নেই। বিরক্ত মুখে ওঝা বাবাজী ঘোষণা করলেন, 'না, এর হাতে বাটি চলবে না।' সবার হাতে যে বাটি চলে না!

আবার লোক নির্বাচনের পালা শুরু হল। কেউ সাহস করে এগিয়ে আসে না। না জানি কী হয়ে যায়! ভীড়ের মধ্যে থেকে ওঝা বাবাজী একজনকে হয়ত ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি বাটি ধরো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার হাতে বাটি চলবে।' ওঝার নির্বাচিত লোক বাটি ধরল। কিছুক্ষণ তন্ত্র-মন্ত্রের পর বাটি নড়ে উঠতে শুরু করল। কয়েকশ' গজ এগিয়েও গেল। একটা বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে বাটির চলা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে বাটির গতিপথ গেল বদলে। ঠিক যে পথ ধরে ওটি এগিয়েছিল আবার একই পথ বেয়ে পূর্বের জায়গাতেই এসে বাটি থামল। আর কোন নড়াচড়া নেই। ওঝা আবার অন্য কাউকে আহ্বান জানালেন বাটি ধরতে। না, এবার আর লোক পাওয়া গেল না। দু'-একজন ভদ্র বেশভূষার যুবক এগিয়ে গেলেও ওঝা তাদের নাকচ করে দেন। তোমার রাশিতে মিলবে না। সবাইকে দিয়ে কী আর সব কাজ হয়!

অবশেষে ক্লান্ত ওঝা ঘোষণা করলেন, 'ঠিক আছে কাউকে যখন তেমন পাওয়া যাচ্ছে না, তবে এবার আমিই তাহলে বাটি ধরছি।' চারদিকে সোৎসাহ ধ্বনি। এবার চোর ধরা না পড়ে যাবে কোথায়? সবার চকচকে কৌতূহলী চোখ ওঝার প্রতি মনোযোগী হয়। মন্ত্র জপের পর বাটিটি গতিপ্রাপ্ত হল। আরেক দফা সকলে বাহ্বা ধ্বনি। প্রচণ্ড আনন্দ ও চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠল পরিবেশ। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বাটি। সে সাথে এগিয়ে চলেছেন ওঝা বাবাজী। মাঝে মধ্যে দু'-একটি কথা বলছেন জোরে। বলছেন, বাটি তার হাত এবং তাবৎ শরীর প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে

www.i-onlinemedia.net

চলেছে। ওটি যে এখন কী দুর্ণিবার শক্তির অধিকারী তা তিনি এটা সেটা বলে বোঝাতে চাইছেন উপস্থিত জনতাকে। প্রথমে আস্তে আস্তে চললেন। পরে, ক্রমান্বয়ে বেশ গতিতে এগোতে শুরু করেছে বাটিটি। ঝোপ-ঝাড়, বন-বাদাড়, রাস্তা-ঘাট মাড়িয়ে এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। হঠাৎ একটা গর্তে এসে স্থির হল। ওঝার ফরমায়েশ মোতাবেক গর্তটি আরো খুঁড়ে বড় গর্ত বানিয়ে ফেলা হল। না কিছু নেই। আবার বাটি চলতে লাগল। এর মধ্যে ওঝার সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে একাকার। মুখখানিও লাল রঙ ধারণ করেছে। এবার বললেন তিনি, 'বাটি যে পথ ধরে এগোচ্ছে, চোরও মালামাল নিয়ে সটকে পড়েছে সেই পথ ধরে। কারণ মালামাল চলে গেছে বহু দূরে। আর চুরি যাবার সঙ্গে সঙ্গে দু'-একদিনের মধ্যে না হলে বাটি চোর বা লোকের নাগাল পায় না।'

এভাবে হয়ত দু'তিন ঘন্টা চলার পর বাটিটি এমন এক রাস্তার মোড়ে এসে থামল, যার আশেপাশে তিন-চারটি বাড়ি রয়েছে। ওঝা তখন বলল, 'এ বাড়িগুলোতে আজ তল্লাশী চালিয়ে দেখুন। না পেলে আবার কাল এবং এখানেই যবনিকাপাত।'

যে ঘটনাটি এখানে বলা হল, এর রহস্য কী!? বিষয়টা ভেঙ্গে বললে বাটি বা বদনা চালার রহস্য কারো বুঝতে বাকী থাকবে না। প্রথমত লোক নির্বাচন। রাশি টাশি বলে একটা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা হয়। সবার দ্বারা হয় না, সবার এটা সয় না (অর্থাৎ ক্ষতি হয়) ইত্যাদি বলে প্রচলিত আতঙ্ককে আরো জোরদার করা হয়। ফলে সহসা কেউ বাটি ধরায় রাজী হয় না। আর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে সুবেশধারী তথা প্রকৃত তাওহীদের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক কেউ এগিয়ে এলে তাকে না করে দেয়া হয়। কারণ তাতে গুমোর ফাঁক হয়ে যাবে। কেউ যখন রাজী হয় না তখন এ সুযোগে তার নিজের একজন লোককে লাগিয়ে দেয়া হয়। তাকে দিয়ে একটু খেলিয়ে টেলিয়ে অবশেষে ওঝা নিজেই বাটি ধারণ করেন। তিনি খুব গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে বাটি চালা তথা বাটি খেল পর্বটি এগিয়ে নিতে থাকেন। তাই সন্দেহজনক দু'-একটা বাড়ি বা গর্ত-টর্তর নিকট গিয়ে থামিয়ে দেন বাটিখানাকে। খোঁজাখুঁজি চলে কিছুক্ষণ ধরে। পাওয়া গেলে (অনেক সময় কাকতালীয়ভাবে জিনিসপত্র পাওয়া যায় বৈকি! তখন তো স্বাভাবিকভাবেই কেরামতি বাড়ে ওঝা বাবাজীর!) ভাল আর না পাওয়া গেলে অনেক দূরে চলে গেছে জিনিসপত্র এবং শেষাবধি কয়েকটি বাড়ির গোলক ধাঁধার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বাটি চালা শেষ করেন।

এভাবে কত রকমের চালাচালি, পড়াপড়ি ক'রে আমাদের গ্রাম-গঞ্জের ওঝা, গুণীন, গণক ও কবিরাজরা মানুষ ঠকাচ্ছে! প্রতারণা করে পয়সা কামাচ্ছে সহজ-সরল, অশিক্ষিত মানুষদের ভাঁওতা দিয়ে। চাল পড়া তেমনি এক প্রতারণা। ওঝা ডেকে এনে চাল ভেজে সন্দেহজনক মানুষদের খাওয়ানো হয়। ভাজা চাল খাওয়াবার আগে তাতে ফুঁ-ফা দিয়ে দেয়া হয়। চোর বা অপরাধী যদি চাল খায় তাহলে তার মুখের চেহারাই যাবে বদলে। ধরা পড়ার আতঙ্কে সে তখন তটস্থ। ওঝা ওই আতঙ্কিত মুখ দেখে গৃহকর্তার কানে কানে চোরের সন্ধান বলে দেন।

মূলকথা হল শিক্ষা। সুশিক্ষা তথা ওহীর (কুরআন ও সহীহ হাদীস) আলোয় আলোকিত না হলে মানুষ তো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকবে। ওঝারাও আঁধারের পথ বেয়ে ঠকিয়ে যাবে চিরঠকা মানুষদের।

www.i-onlinemedia.net

মানুষের নখদর্পণ
মিছেই হয় চোর কর্তন

খোয়া যাওয়া কোন জিনিসের সন্ধান করতে বিশেষভাবে কার্যকর একটি পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে, এমনকি অনেক শহরে প্রচলিত এ পদ্ধতির নাম নখদর্পণ। দুটি শব্দের মিলিত এ শব্দখানি। নখ এবং দর্পণ। নখ হল হাতের আঙুলের অগ্রভাগে মসৃণ শক্ত অংশ। আর দর্পণ অর্থ হল আয়না। নখে তেল লাগিয়ে চকচকে করে চোখের সামনে মেলে ধরা হয়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে নখে ছবি বা চলচ্চিত্রের মতো চোর বা চুরিকৃত জিনিসের ছবি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এ পদ্ধতির হোতা যারা তারা এমনই বলেন। অর্থাৎ কিনা, নখের আয়নায় চোর ধরা।

আমাদের সমাজের গরীব, নিরক্ষর, সরল মানুষের মধ্যে পুরনো ভাঁওতাপূর্ণ অনেক ভ্রান্ত পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে এগুলো মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে বসবাস করছে। বর্তমানে শিক্ষাদীক্ষা ও সচেতনতা কিছুটা বাড়তে থাকার ফলে এগুলোর প্রতি জনসাধারণের আস্থা কমে এসেছে সত্যি। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অসহায় দরিদ্র মানুষেরা আর কোন পথ না পেয়ে আশ্রয় নেন এ সকল উদ্ভট অযৌক্তিক পদ্ধতির। নখদর্পণের মতো আরও যে পদ্ধতিগুলো সচল রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে- হাত চালান, বাটি চালান, কুলো চালান, নল চালান, চাল পড়া, আয়না পড়া ইত্যাদি বহু রকমের তুকতাক।

নখদর্পণের কলাকৌশলটা কেমন তা একটু দেখা যাক।

কোন বাড়িতে হয়ত দরকারী জিনিস চুরি হয়ে গেল। গৃহকর্তা অনেক খোঁজাখুঁজি করে চুরি যাওয়া জিনিসটি উদ্ধার করতে পারলেন না। শেষে আর কোন উপায়ান্তর না দেখে তিনি ডেকে আনলেন ঝাড়ফুঁক (!) করা ওঝা/কবিরাজ/গণককে। ঘটনা শুনে গণক নখদর্পণ করার আয়োজন করলেন। বেছে নিলেন তিনি বাড়ির প্রায়-অবুঝ সাত/আট বছরের একটি বালককে। বালকের ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখে লাগিয়ে দিলেন সর্ষের তেল। তারপর একটানা কয়েক মিনিট বিড়বিড় করে তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বালকটিকে তিনি একজনের নখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বললেন। বালকটি তাকিয়ে আছে তো আছেই। চারিদিকে চুপচাপ। হয়ত মাঝেমাঝে ফিসফাস আওয়াজ। কৌতূহলী লোকের ভীড়। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এই তো এলো, এই যে এসেই গেল। কী এলো! না, ছবি এলো! ছবি এলো। নখে চোরের ছবি ফুটে উঠল। গণক কিন্তু ওদিকে বালকটিকে কী যেন জিজ্ঞাসা করেই চলেছে। বালকটি অস্ফুটে হ্যাঁ-না উত্তর দিচ্ছে। বালকটির ঠিক পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে গণক মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। কখনো থেমে প্রশ্ন করছেন বালককে। একসময় হয়ত বালকটি সায় দিয়ে জানাল যে, সে নখে ছবি দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, খুব স্পষ্ট না হলেও অস্পষ্ট ছবি বা মানুষ নড়াচড়া করতে দেখতে পাচ্ছে।

www.i-onlinemedia.net

বালকটি নখে দেখতে পাচ্ছে গৃহকর্তার অগোচরে চোর ব্যাটা ঘরে ঢুকে তাকের ওপর থেকে টাকা-পয়সা ও গয়নাগাটি যা ছিল সব নিয়ে কোঁচড়ে পুরে সটকে পড়ল। সে আরও জানাল যে, চোর হিসেবে যাকে সন্দেহ করা হয়েছিল, সে লোকটিকেই সে জিনিসপত্র চুরি করতে দেখল। লোকটি চুরির সময় যেভাবে, যে ভঙ্গিতে চুরি হয়েছিল, ঠিক ঠিক সে অবস্থায়ই তাকে নখে চলমান দেখতে পেয়েছে। চোরের চেহারা, গায়ের রং, পরনের কাপড়, লুকিয়ে ঘরে ঢোকা, জিনিস নিয়ে কোঁচরবন্দি করা এবং সকলের অজান্তে কেটে পড়া। এত সবকিছু বালকটি তেল চকচকে নখের পর্দায় সিনেমার মতো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখে নিয়েছে।

আসলে ব্যাপারটি কী? পুরো ঘটনাটাই আসলে ধাপ্পা। কী রকম ধাপ্পা বলি তাহলে।

ওঝা/কবিরাজ/গণক ব্যাটা নখদর্পণ করতে এসে চুরির বিষয়টি শুনে জিজ্ঞেস করে, গৃহকর্তা কাউকে চোর হিসেবে সন্দেহ করেন কিনা! কর্তা হ্যা-সূচক উত্তর দিয়ে তার সন্দেহভাজন লোকের কথা বলেন। এর কথা বালকটিও শুনে ফেলে। নখদর্পণ প্রক্রিয়া শুরুর আগে বালককে আবারো তার কথা মনে করিয়ে দেয়া হয় কানের কাছে মুখ নিয়ে, ফিসফিস করে। তারপর বারবার সেই লোকের কথাই জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এতে বালকটির মনে নখদর্পণের অন্ধবিশ্বাসের ভিত তৈরি হয়ে যায়। যেহেতু সে এ সম্পর্কে ইতো পূর্বেই শুনে এসেছে এবং শুনছে বারবার। এর সাথে যোগ হয়েছে ওঝা/কবিরাজ/গণকের সম্মোহনী শক্তি। দুই-এ মিলেই বালকটির মনে মতিভ্রমের সৃষ্টি হয়। বাস্তব জ্ঞান ও সত্যাসত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা রহিত হয়ে যায় তার। অবস্থাটি তার হয় আত্মসম্মোহিত। একমনে একদৃষ্টিতে থাকলে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের কচিমন খুব তাড়াতাড়ি আত্মসম্মোহিত হয়। দিব্যজ্ঞান রহিত- এ অবস্থায় ওঝা/কবিরাজ/গণক পুরুষটি বালককে প্রভাবিত ক'রে যা চাইবে, যা দেখাবে বা যা বলাবে নির্বোধ বালকটি তাই দেখবে এবং গড়গড় করে বলবে। এ কারণে সে সন্দেহের লোককে চুরি করতে ও নিরাপদে পালাতে দেখে।

অনেক সময়ই এমন হয় যে, সন্দেহভাজন লোকটিই আসলে চোর। বালকের মুখে তার নাম উচ্চারিত হলে আসন্ন শাস্তির ভয়ে লোকটি জড়োসড়ো হয়ে যায়। তারপর সকলে তাকে ঘিরে ধরলে বা দু'চার ঘা মারধোরে সে সব কথা স্বীকার করে। অতি শীঘ্রই সে বের করে দেয় চোরাই মালামাল। এরপর নখদর্পণ ও ওঝা/কবিরাজ/পীর/গণকের কেরামতি বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কিছুমাত্রও যাদের এ পদ্ধতিতে সংশয় থাকে তাদের আস্থা দৃঢ় হয়। নখদর্পণের জন্য কিন্তু যে কাউকে নির্বাচন করা হয় না। বাড়ির বাচ্চা ছেলেমেয়ে অথবা মহিলাদের বেছে নেয়া হয় এ জন্য। এর কারণ হল, বাচ্চা ও মহিলারা মানসিকভাবে দুর্বল, অনেকটা অপরিণত এবং বেশ কল্পনাপ্রবণ। এদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সহজতর। বাচ্চাদের তো সমাধান বের করে সবাইকে তাক লাগিয়ে হিরো হবার বাসনা সুপ্তভাবে থাকেই। এ

www.i-onlinemedia.net

ব্যাপারগুলোকে কাজে লাগিয়ে নখের আয়নায় চোর ধরার প্রক্রিয়া চলে। তা ছাড়া, তেল চর্চিত নখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে নিজের, গণকের এবং আশেপাশের কৌতূহলী মানুষের মুখ দেখা যাবে। কাছেপিঠের জিনিসপত্র, বাড়িঘর এবং গাছপালার ছবিও ফুটে ওঠে। অনেক সময় সামনে ধরে নখের দিকে তাকিয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টিবিভ্রম শুরু হয়। ফলে, এ মুখগুলোকেই চোর বা দৃশ্যগুলোকে চুরি যাওয়া বাড়ির পরিবেশ বলে সে মনে করতে থাকে।

এ ব্যাপারগুলোকেই কাজে লাগিয়ে নখদর্পণের স্রেফ ভাঁওতাপূর্ণ প্রক্রিয়াটি চালু রয়েছে আমাদের সমাজ জীবনে। অন্য অনেক কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের মতো শির্‌কী যাদুমন্ত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মাঝে সচল রয়েছে। দু'-একটি ক্ষেত্রে আকস্মিক সাফল্যের সুবাদে এর হোতারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। নির্দোষ লোককে দোষী প্রতিপন্ন করার ফলে অনেক সময় সামাজিক সম্পর্কে ফাটল ধরে, বিবাদ-বিসম্বাত সৃষ্টি করে। শির্‌ক-কুফরযুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যুক্তিহীন নখদর্পণ প্রক্রিয়াটি নিতান্তই একটা কুসংস্কার বৈ কিছু নয়।

www.i-onlinemedia.net

যাদু-টোনার বাণ কেড়ে নেয় প্রাণ

বাণ মারা কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আমাদের গ্রামীণ ও শহুরে জীবনে এ নিয়ে অনেক কথা-কাহিনী চলে আসছে। এগুলো সবই ভীতি ও রীতিমত রোমাঞ্চকর। কারণ, এ পদ্ধতিটি কেবল মানুষের ক্ষতি ও ক্ষয় করার উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা হয়। মানুষকে বেকায়দায় ফেলার জন্য, অসুবিধা সৃষ্টির জন্য, ক্ষতি সাধনের জন্য বাণ মারার কৌশল ব্যবহার হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে।

'বাণ'[১] শব্দটি বাংলাদেশে[২] খুব পরিচিত হলেও শব্দটি কিন্তু বাংলা নয়। এটা সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ হল যাদু[৩] বা তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে গড়া শর বা তীর। অর্থাৎ যাদুমন্ত্র পড়ে ক্ষতিকারক হিসেবে বানানো হয়েছে এমন তীর। মানুষকে বিদ্ধ করে ঘায়েল করার জন্যই সাধারণত তীর ব্যবহার করা হয়। বাণ মারা এখানে প্রতীকি অর্থে এসেছে। যেহেতু মানুষকে বিপন্ন বা বিপদগ্রস্ত করার জন্য কৌশলটির ব্যবহার তাই *'বাণ মারা'*।

*'বাণ মারা'*র ব্যবহারের অন্ত নেই। কত ব্যাপারে যে *'বাণ মারা'* প্রক্রিয়া চলে, গ্রামে বাস করেন যারা তারা প্রায় সকলেই তা জানেন। অসুখ ভাল না হতে দেয়া, রোগ জটিল করা, অসুখ সৃষ্টি করা, নারীকে গর্ভধারণ করতে বা সন্তান প্রসব করতে না দেয়া, কারো বিয়ে হতে না দেয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ বা বাড়িঘরের ওপর *'বাণ মারা'* হয়। *'বাণ মারা'* হয় ফসলে। ফসল নষ্ট করে দেয়া বা ফসল কম হবার জন্য জমিকে বাণবিদ্ধ করা হয়। ফল গাছে বাণ মেরে ফল নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। পিঠা বানানোর সময় বাণ মেরে পিঠা সিদ্ধ হতে বা সুস্বাদু হতে না দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কোন সময় কোথাও যাত্রাকালেও বাণ মেরে যাত্রা-নাস্তি করার চেষ্টা করা হয়। অথবা যাত্রার উদ্দেশ্য যাতে সফল না হয় সেজন্য *'বাণ মারা'* হয়। এভাবে কত শত যে বাণ মারার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এবার আমরা বাণ মারার কিছু পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। শারীরিকভাবে ক্ষতির জন্য বাণের পদ্ধতি হল এ রকম- ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত (কৃষ্ণপক্ষের রাত) ১২টায় শ্মশান বা কবরস্থানে *'বাণ মারা'*র ওস্তাদ বা গুরু যাবেন। সঙ্গে একদল শিষ্য। সকলেই উলঙ্গ। গুরু মাঝখানে বসলে শিষ্যরা তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসবে। গুরুর সামনে একটি মাটির পাত্র রাখা হয়। কাঁচা হলুদ বা গুঁড়া হলুদ পানিতে গুলে তা দিয়ে পাত্রটির ওপরে একটি চারকোণী ঘর আঁকা হয়। এর চার কোণায় আঁকা হয় চারটি

---

[১] *এক প্রকার তান্ত্রিক মন্ত্রযুক্ত মারণাস্ত্র।*

[২] শুধু বাংলাদেশে নয় বরং 'বাণ মারা'র এ বিষয়টি সারা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে নানা নামে প্রচলিত রয়েছে। 'বাণ মারা' শব্দটি বাংলাদেশ ও ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

[৩] *বশীকরণের মন্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র, বশীকরণের প্রকরণ, কুনজর বা কুদৃষ্টি।*

www.i-onlinemedia.net

বৃত্ত। এখন ঘরের কেন্দ্রস্থলে রাখা হয় একটি পুতুল (মাটির বা প্লাস্তিকের যা-ই হোক)। পুতুলের পা উঁচিয়ে গুরুর দিকে ধরে তার ওপর ছিঁটানো হয় হলুদের গুঁড়ো। শরীরের সব জায়গায় গুঁড়ো ছিঁটানো হলে একটা সুঁচ দিয়ে ফল বা শস্যের বীজ গেঁথে নিয়ে পুতুলের গায়ে ঠেসে ধরা হয়। নির্দিষ্ট লোকটির শরীরের যে অংশে ক্ষতি করার কথা মনে করা হচ্ছে, পুতুলেরও ঠিক সেই জায়গাটায় বীজবিদ্ধ সুঁচ ঠেসে ধরা হয়। এরপর গুরু ও শিষ্যদের একটানা মন্ত্রপাঠ চলতে থাকে।

পুতুল ছাড়া আরো কিছু পদ্ধতি আছে, যেমন- যে ব্যক্তির ক্ষতি করার চেষ্টা করা হবে, গোপনে তার চুল, আঙুলের নখ, রক্ত বা থুথু যোগাড় করে তার ওপর যাদুমন্ত্র পড়া হয়। মানুষের পেছন পেছন হেঁটে তার ছায়ার ওপর যাদুমন্ত্র পড়ে বাণ মারা হয়। ব্যবহারের কাপড়-চোপড় বা অন্যান্য সামগ্রীর ওপরও যাদুমন্ত্র পড়ে বাণ মারা হয়। নারীকে গর্ভধারণ করতে, প্রসব করতে না দেয়া এবং প্রসবে জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টির জন্য গোপনে সেই নারীর কাপড় সংগ্রহ করে যাদুমন্ত্র পড়া হয়। কিংবা তার খাদ্যে মন্ত্রপড়া পানি মিশিয়ে দেয়া হয়। সামান্য একটুখানি গরুর দুধ যোগাড় করে তাতে মন্ত্র পড়ে নাকি দুধ শুকিয়ে দেয়া হয় গাভির স্তন থেকে। পিঠা রান্নার চুলায়, গাছের ফল পেড়ে বা জমির ফসল সংগ্রহ করে তাতে *'বাণ মারা'*র মন্ত্র পড়া হয়। যাত্রার রাস্তায় কাঠি পুঁতে তাতে বাণ মেরে নাকি যাত্রানাস্তি বা যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়া হয়।

এভাবেই গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে *'বাণ মারা'* হয়। খোঁজ করে জানা গেছে, ৬৪ ধরনের *'বাণ মারা'*র জন্য ৬৪ রকমের বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ জন্য রয়েছে বহু ধরনের যাদুমন্ত্রও। এ যাদুমন্ত্রগুলো যেমন বিচিত্র তেমনি হাসি উদ্রেককারী ও শির্ক-কুফর যুক্ত। একটি মন্ত্রের কথা এখানে উল্লেখ করি। পিঠা নষ্ট করার জন্য এ মন্ত্রটি নাকি পাঠ করা হয়।

আলো ধানের কালো পিঠা,
তিন গাইনে বাণে আঁটা।
একটা ধানে দুইটা তুষ,
পিঠা তলায় ভুষাভুষ।

রান্নার পিঠা সত্যি সত্যি ভাল না হলে তখন *'বাণ মারা'*র কথা মনে করা হয়। বাণে বিশ্বাস ক'রে তখন গৃহকর্ত্রী পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। চুলার পোড়া মাটি পিঠা বানানোর হাঁড়ির শরীরে লেপে দিয়ে সে সাথে আরও দু'একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে দেখা যায় পিঠা ঠিকঠাক মতো হতে শুরু করেছে। এটা আসলে *'বাণ মারা'* কিছু নয়। হাঁড়ির কোন জায়গায় ছিদ্র থাকাতে সেদিক দিয়ে তাপ বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাই লেপে দেয়ার পর তাপ বেরোতে না পেরে সুস্বাদু পিঠা রান্না করা যায়। ফল গাছের গোড়ায় বা ফসলের ক্ষেতে ক্ষার বা চুন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিলে গাছ মরে যায় বা ফল নষ্ট হয়ে যায়। গ্রামের গরীব সন্তানবতী মহিলারা বেশিরভাগই অপুষ্টিতে ভোগেন। এতে রিকেট নামে এক প্রকার রোগ হয়। ফলে কোমরের হাড়ের গঠন ঠিকমতো না হলে সন্তান প্রসবে কষ্ট হয়। আর তখন বাণ মারার কথা ভাবা হয়।

www.i-onlinemedia.net

আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যদি কারো সাথে কারো শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং এ দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি দুর্বল হয়, যার কারণে সেই দুর্বল পক্ষ সবল পক্ষকে সহজে ঘায়েল করতে সক্ষম না হয়; তবে এ ক্ষেত্রে দুর্বল পক্ষ সাধারণত বিভিন্ন জ্বিন সাধকের মাধ্যমে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সবল পক্ষকে বাণ মারে বা বধ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সবল পক্ষও দুর্বল পক্ষকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর ভালবাসা সৃষ্টি, কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি, কারো বিবাহ হতে না দেয়া, কারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি, কাউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা তথা বধ করা ইত্যাদি নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে শুরু হয় যাদুর খেলা। আর এখানেই শেষ নয় যাদুর খেলা, এ সকল যাদুকে নিষ্ক্রিয় করতে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যাদুমন্ত্রের। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জ্বিন, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা, নির্দিষ্ট তারিখে বা নির্দিষ্ট দিনে লাল বা কালো মোরগ জ্বিন বা ভূতের নামে রোগীকে জবেহ করতে বলা কিংবা মিষ্টি ও ফলমূল গায়রুল্লাহ্‌র নামে এমনকি হিন্দুদের মন্দীরে অবস্থিত দেব-দেবীকেও মানত হিসেবে প্রদান করা।

যে অন্তর নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ তথা শির্‌কমুক্ত ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন সব সময়ই দুর্বল। সামান্য কঠিন বাস্তবতাকে সহজে গ্রহণ করার মানসিকতা তাদের মাঝে অনুপস্থিত। নড়বড়ে ঈমানের ভিতের ওপর সামান্য আঘাত যেমন অসহনীয় হয় তেমনি কুসংস্কার, গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন মনও অতি সহজেই দুর্বল ভাবনায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। সে কারণেই তো হঠাৎ করে কিছু ঘটলে, ব্যতিক্রম কিছু হলে, অস্বাভাবিক কিছু হলেই বাণ মারা বা জ্বিন-ভূতের আছর বা তন্ত্রমন্ত্র পড়ার ভাবনায় পেয়ে বসে অশিক্ষিত অভাবী মানুষদের। যাদুমন্ত্র পড়ে, বাণ মেরে যারা জীবিকা ধারণ করে তারা ভণ্ড, প্রতারক, জালিয়াত, মুশরিক ও কাফির ছাড়া আর কিছু নয়। সহজ-সরল মানুষদের অশিক্ষা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের সুযোগে বাণ মারা, তন্ত্রমন্ত্র, যাদু ইত্যাদি বুজরুকি চলছে যুগ যুগ ধরে। প্রকৃত তাওহীদের শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতা ছড়িয়ে দিয়ে এ সকল মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে মানুষের মনে পরিবর্তন আনতে হবে। একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জগতের সবকিছু চেনা, জানা, গ্রহণ ও বাতিল করার মনোভাব জাগিয়ে দিতে হবে।

www.i-onlinemedia.net

পীরের নৃশংস কাণ্ডে রেফাজ এখন অন্ধ
পীরের কথা মেনে নিতে ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব

এ কাহিনীটি কল্পনার আশ্রয়ে বানানো কোন গল্প নয়, অসত্যও নয়। জলজ্যান্ত বাস্তব ঘটনা। প্রাত্যহিক জীবন থেকে তুলে নেয়া একটা আটপৌরে অথচ নিদারুণ মর্মস্পর্শী একটি ঘটনা। কাহিনী বিবৃত করেছেন যিনি তিনি পেশায় একজন চক্ষু চিকিৎসক।

রেফাজুদ্দীন নামের সবে কৈশোর পেরুনো চক্ষুরোগী এক তরুণ একদা এসেছিল তার নিকট। তার এক ভাই ছিল সঙ্গে। যন্ত্রণা-কাতর মুখ। চোখের কোণে কালি। চোখ দু'টো প্রায়-নির্মিলিত। মুখের ভাষায় উৎসারিত কেবল হতাশা। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানালেন, 'না, সব শেষ। পৃথিবীর রঙ-রূপ ধরা দেবে না তার কোনদিন এ দৃষ্টিতে।' আমৃত্যু অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে রেফাজুদ্দীনকে। এক ভ্রান্তিতে শৃঙ্খলিত হয়ে, কুসংস্কার কবলিত হয়ে চিরতরে চোখ হারিয়ে জীবনের সব আশা ও স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হয়েছে তার। অন্যের গলগ্রহ হয়ে, অন্যের ভরসায় বিপন্ন জীবনযাপন করে বেঁচে থাকতে হবে রেফাজুদ্দীনকে।

কী হয়েছিল রেফাজুদ্দীনের?

ষোড়শ বর্ষীয় তরুণ রেফাজুদ্দীন বরাবর মেধাবী ছাত্র। প্রতি ক্লাসে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার এবং স্কুলের শিক্ষকদের ধারণা এস.এস.সি.-তে প্রথম বিভাগে ভাল ফলাফল লাভ করবে। একদিন ক্লাসে এক শিক্ষককে সে জিজ্ঞেস করে:

'স্যার আপনি তো এস.এস.সি.-তে অনেক ভাল ফলাফল করেছিলেন। আপনি কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন স্যার?'

'দশ থেকে বার ঘন্টা পড়াশোনা নিয়ে থেকেছি। এ সময়টায় বই ছাড়া অন্য কোনদিকে মনোযোগ দিই নি। চেষ্টাটাই আসল। চেষ্টা ও সাধনা করার ফল আমি পেয়েছি। পড়াশোনার সঙ্গে আরেকটি কাজও আমি করেছিলাম।'- এটুকু বলে থেমে যান শিক্ষক।

'সেটা কী স্যার?' উৎসুক হয়ে জানতে চায় রেফাজ।

'এক পীর সাহেবের দোয়া নিয়েছিলাম। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে এক পীর আছেন। সবাই তাকে বলে কড়াপীর। পরীক্ষার আগে আমি সেই কড়াপীরের দোয়া এনেছিলাম কয়েকবার। ইচ্ছে করলে তোমার আব্বাকে নিয়ে একবার কড়াপীরের কাছে যেতে পার।'

কড়াপীরের ঠিকানা বলে দেন স্যার। কোন্‌দিন কিভাবে যেতে হবে বলে দেন তাও।

সরলমতি রেফাজুদ্দীন বিষয়টা গিয়ে বলে তার আব্বাকে। সামান্য শিক্ষিত রেফাজের বাবা তৎক্ষণাৎই সায় দেন এবং পীর সাহেবের কাছে যাবার দিনক্ষণ ঠিক

www.i-onlinemedia.net

করে ফেলেন। নির্ধারিত দিনে কয়েক কিলোমিটার পথ হেঁটে পিতা-পুত্র হাজির হয় কড়াপীরের আস্তানায়। বারান্দায় বসা মাঝবয়সী, দীর্ঘকায় সুপুরুষ পীর চোখ বুঁজে আধশোয়া হয়ে আছে মাটিতে। পাশে গামছা, লুঙ্গি, বদনা, মেছওয়াক, পানপাত্র ও পিকদান রাখা। কয়েকজন লোকও ঘিরে বসে আছে তাকে। লোকগুলো সবাই আনত ভঙ্গিতে বসা। তাদেরও চোখ বোঁজা। দু'জন যুবকের একজন পায়ের নিকট ও অন্যজন মাথার কাছে বসে আছে। একজন পীরের পা দুটো টিপে চলেছে একাধারে। আরেকজন মাথার পাকা চুল তুলে দিচ্ছে। সমগ্র পরিবেশের মধ্যে আলুথালু ও অরুচিকর অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় রেফাজ দারুণ অস্বস্তি অনুভব করে। বিরক্ত ধরে যায় তার। সে শ্রদ্ধাপ্লুত মন নিয়ে পীর বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু চারদিকে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর ও রুচিহীন অবস্থা থেকে তার ভক্তি-শ্রদ্ধা তো টুটে যায়ই, উপরন্তু বিরক্তিতে ছেয়ে যার তার মন।

রেফাজ ও তার বাবা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় যুবকদ্বয়ের একজন আঙুল ও চোখের ভাষায় কথা বলতে ও শব্দ করতে বারণ করে। একজন উঠে এসে রেফাজের বাবাকে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে জানতে চায় কেন এসেছে তারা। এরপর সে চোখের ইশারায় ডেকে রেফাজকে পীর সাহেবের মাথার কাছে বসায়। পায়ের শব্দে পীর সাহেব একবারের জন্য চোখ দুটো একটু খুলেই আবার বন্ধ করে। যুবকের নির্দেশে রেফাজ পীরের পাকা চুল তুলতে থাকে। কয়েক মিনিট নিঃশব্দ এভাবে চলতে থাকে। এক সময় আকস্মিকভাবেই দ্রুতলয়ে পীর সাহেব উঠে বসে। কাউকে কোনরকম বোঝার সুযোগ না দিয়ে রেফাজের গালে সজোরে এক বেমক্কা চড় হাঁকিয়ে দিল। রেফাজ তো হতবাক! কি অপরাধে তাকে চড় খেতে হল কিছু বুঝে উঠতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে কেবল পীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত লোকজনের মধ্যে অকারণে চড় খেয়ে অপমানিত বোধ করে। একজন যুবক বারান্দার এক কোণে ডেকে নিয়ে রেফাজকে বলে, 'হুজুরের গোস্বা অইছে। ক্যান অইছে কইবার পারমু না। তয় মনে অয়, তুমি খালি আতে আইছো, এইডা বোঝবার পাইরা ক্ষেইপ্যা গেছে। হুজুরের লগে দেখা করতে অইলে ছদগা নিয়া আইতে হয়।'

রেফাজ ভয়ে নিজের মধ্যে সিঁটিয়ে গেছে। হুজুর যদি রেগে গিয়ে তাকে বদ্‌দোয়া দেয় তাহলে যেসব যাবে। সে তার বাবাকে নিয়ে সবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করে, দু'দিন পর ছদকা নিয়ে আবার আসবে। আবার যায় তারা কথানুযায়ী। এবার সঙ্গে নেয়া ছদকা হুজুরের পায়ের নিকট সবিনয়ে জোড়হাতে রেখে দেয়। এবার হুজুর সস্নেহে রেফাজের মাথায় হাত বুলিয়ে ওদেরকে শরবত পান করায়। তারপর ওর বাবাকে কাছে ডেকে বলে, 'পোলার ওপর জ্বিন আছর করছে। দু'জ্বীনে ওর চোখ দু'ডায় বাসা বানছে। এগুলারে তাড়াইতে না পারলে পোলা পরীক্ষায় সফলকাম অইতে পারবো না। দাঁড়াও জ্বিন খেদাইন্যা অষুদ দিয়া দিতেছি।' একজনকে ইশারা করতেই ঔষুধের উপকরণগুলো এসে গেল। রেফাজ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল উপকরণের মধ্যে

www.i-onlinemedia.net

রয়েছে গরুর শুকনো গোবর, উঠোনের ভেজা মাটি, শুকনো মরিচের গুঁড়ো, সরিষার তেল ইত্যাদি। এগুলো সে একটা মাটির বাটিতে একত্র করে একটা পেস্ট তৈরি করল। তারপর কয়েকজনকে নির্দেশ দিল রেফাজকে হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে শুইয়ে দিতে। রেফাজের ওপর হামলে পড়ে দু'আঙুলে বানানো পেস্ট নিয়ে দু'চোখে সজোরে ডলে দিল। রেফাজ অসহ্য যন্ত্রণায় কাটা গরুর মতো অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগল। বিকট চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলল চারদিক। কিন্তু কেউ কাছে যেতে সাহস পেল না। হুজুর দু'চোখ চেপে ধরে রাখে আট-দশ মিনিট। তারপর হাহ্ হাহ্ হাহ্ করে হাসতে হাসতে বলে, 'হ এবার সরছে। সইরা পড়ছে জ্বিনগুলো, না পলাইয়া যাইবো কই! যা পরীক্ষায় তুই কামিয়াব হবি।'

রেফাজকে তারপর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। চোখের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে ক্রমে নিঃসাড় হয়ে পড়ছে। পরদিন দেখা গেল তার চোখের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। চোখ মেলতেও পারছে না, কিছু দেখতেও পারছে না। দৃষ্টি হারানোর উৎকণ্ঠায় সে মিইয়ে গেছে। তাওহীদপন্থী পাড়া-প্রতিবেশী ওর বাবাকে পরামর্শ দেয় শহরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে থানায় অবগত করতে। কিন্তু ওর বাবার ভয় তাতে যদি ক্ষতি হয়! হুজুর যদি জানতে পেরে অভিশাপ দেয়। এভাবে দু'দিন যাবার পর অবস্থা আরও শোচনীয় হলে কলেজ পড়ুয়া গ্রামের দু'তরুণ জোর করে রেফাজকে শহরে নিয়ে যায়। পরিচিত একজনের সহায়তায় তারা বিশিষ্ট চক্ষু ডাক্তারের নিকট হাজির করে। এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে, ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করে চোখ নিরাময়ের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন।

আমাদের গ্রামীণ সমাজে শুধু নয়, শহরেও তথাকথিত পীর সাহেবদের জোরালো দাপট লক্ষ্য করা যায়। তাওহীদ (আল্লাহ্র একত্ব) সম্পর্কে অসচেতন, ঈমান দুর্বল ও ভীরু লোকদের ওপর কলাকৌশলে প্রভাব বিস্তার করে এমন অনেক কড়াপীর বহাল তবিয়তে আয়েশী জীবনযাপনের বন্দোবস্ত করে রেখেছে। নানারকম ফাঁদ পেতে, ধর্মের দোহাই পেড়ে, ক্ষয়ক্ষতির ভয় দেখিয়ে, বিষয়-সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে আকৃষ্ট করে নিজেদের দিকে। এক ধরনের কৃত্রিম ঐন্দ্রজালিক বা কুহকময় পরিবেশ বানিয়ে সম্মোহন সৃষ্টি করে নানাভাবে প্রতারণা করে মানুষকে। পীরালী-প্রতারণার নজির বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশের দু-একটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও কিন্তু নেই। এদের বর্জন না করলে, উচ্ছেদ না করলে রেফাজুদ্দীনের মতো অনেক মেধাবী সম্ভাবনাময় তরুণের স্বপ্ন টুটে যায়। জীবন সংকটাপন্ন হয়। প্রতারণার চাতুর্যে অর্থবিত্ত খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

www.i-onlinemedia.net

বুড়িগঙ্গার ঘূর্ণিপাক
ভণ্ড পীর নিপাত যাক

এই তো সেদিনের ঘটনা। সত্তর-উর্ধ্ব এক মাকে ঘিরে এ কাহিনী। এমনিতে মা। এমন বার্ধক্য বেলাও চোখে-মুখে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ, আভিজাত্যেরও হয়ত। সংস্পর্শে গেলে, দেখে, কথা বলে শ্রদ্ধায় বুক ভরে যায়। রুচি, চলা, বসা সব কিছুতেই একটা পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করার মতো। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করেনি কখনো। অপার মাতৃস্নেহের ছায়ায় উদার ঠাঁই দিতে সদাসর্বদাই আগ বাড়িয়ে থাকতেন। এমন প্রবীণা ক্লান্তিহীন মা-টি শেষ জীবনে আক্রান্ত হলেন মরণব্যাধি ক্যান্সারে। বলা হয়, ক্যান্সার রোগে ভুগে ভুগে, ক্ষয় হতে হতে এক সময় প্রায় নির্বাপিত হয়ে যায় প্রাণবায়ু। তবু চেষ্টা চলে ফেরানোর সাধ্যমতো। যতো প্রকার প্রতিকার আছে, সব এক এক করে পরখ করে দেখা। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক সন্তান তার বর্তমানে হোমিও চিকিৎসক। নাম-যশ করে ফেলেছেন ইতোমধ্যে বেশ। সে সময় ছিলেন তিনি হোমিও চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র। তার শিক্ষকসহ পরিচিত যত নামী হোমিও চিকিৎসক ছিলেন সবাইকে দেখিয়েছেন, পরামর্শ নিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। বরং অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকেই এগুতে থাকে। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে, সবার পরামর্শে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হল মাকে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগিনীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন, না ফেরানোর আর পথ নেই। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এখন যে ক'দিন ঠেকা দিয়ে রাখা যায়। মাতৃ-অন্তপ্রাণ সন্তান দিশেহারা হয়েও শেষ চেষ্টার আশা বুকে নিয়ে এখানে-ওখানে ধর্ণা দেন। অপরিসীম ধৈর্য-স্থৈর্যের অধিকারী তার এ ছেলে। মাতৃস্নেহে সজাগ থেকে মার সেবা করেন হাসপাতালে তার অত্যন্ত ধীর, স্থির স্বভাবের সন্তান।

একদিন পরিচিত কেউ একজনের পরামর্শে তিনি গেলেন এক পীর সাহেবের আস্তানায়। হাসপাতালের কাছাকাছিই বখশিবাজার এলাকায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পীর সাহেব দেখা দিলেন, শুনলেন তার কথা, ক্রমাগত পান চিবানোর ফাঁকে ফাঁকে। চেহারায় নূরানী ভাব জ্বল জ্বল করে (!?) কথা বলেন খুব কম এবং খুব মাপজোঁক করে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেন। বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে দু'জন খাদেম দু'দিকে পানের পিকদানি হাতে ধরে বসে আছে। পীর সাহেব মুখ এগিয়ে ধরলেই সঙ্গে সঙ্গে পিকদানি বাড়িয়ে ধরে খাদেম যুগল। ওপরে ঝালর বাতি আলো ছড়ায়। অধিকাংশ সময়ই চোখ দুটো মুদে থাকেন। খুললে সোজা নিচ বরাবর তাকান। ব্যাকুল পুত্র তার মায়ের অবস্থা বর্ণনা করেন খুব ধীরলয়ে। যেন প্রতিটি বাক্য অনুধাবন করার সুযোগ পান পীর সাহেব। আদ্যপ্রান্ত শুনে অনুধাবন করে কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিস্তব্ধ গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছে। ভক্তি-শ্রদ্ধায় সবার দৃষ্টি আনত। কেবল দিশেহারা পুত্র তাকিয়ে আছেন সরাসরি পীর সাহেবের মুখের দিকে। তার তর সইছে না। কিছু বলুক, প্রতিকার বাতলে দিক দ্রুত।

www.i-onlinemedia.net

বেশকিছু সময় নিয়ে চোখ খুললেন তিনি। একটু নড়েচড়েও বসলেন। দু'খিলি পান মুখে গুঁজে দিয়ে, কিছুক্ষণ জাবর কেটে একমুখ পরিমাণ পিক নির্গত করলেন পিকদানিতে। অতঃপর মুখ খুললেন। প্রথমে অভয়বাণী, 'না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহ মাফি দেবেন। তবে একটা কাজ করতে হবে। খুব গোপনে, কাউকে না জানিয়ে কাজটি করতে হবে। শনিবার বা মঙ্গলবার রাত যখন কাঁটায় কাঁটায় ১২টা তখন বুড়িগঙ্গা নদীর মাঝ বরাবর গিয়ে পৌঁছাতে হবে। সঙ্গে নিতে হবে মুখে পাটের দড়ি বাঁধা একটি বোতল। নদীর পানিতে যেখানে ঘূর্ণিপাক হচ্ছে ঠিক সেখানটায় বোতল ছুঁড়ে ফেলে এক নিঃশ্বাস সমান সময় পরে একটানে টেনে উঠাতে হবে। ওই অবস্থায় বোতলে যেটুকু পানি উঠবে, সেই পানি সকালে খালি পেটে তিন ফোঁটা করে এক হপ্তা খাওয়াতে হবে। এতে ইনশাল্লাহ নিরাময় হবে।'

একটা যেন দিশা খুঁজে পেলেন পুত্র। উৎসাহ ও রোমাঞ্চে তাড়িত হয়ে তিনি রাতের প্রক প্রহরে গিয়ে হাজির হলেন বুড়িগঙ্গার তীরে। এক নৌকার মাঝি চাঁদের আলোয় উন্মুক্ত বাতাসে শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল নৌকার পাটাতনে। তাকে ডেকে ডেকে তুলে তিনগুণ ভাড়া সাব্যস্ত করে মধ্য বুড়িগঙ্গায় যাত্রা এবং রোমাঞ্চের পরিসমাপ্তি। মাঝি অবশ্য এ রকম ঘটনার সঙ্গে পূর্ব পরিচিত। আরো কয়েকজন যাত্রী একই উদ্দেশ্যে চেপেছিল তার জলযানটিতে ইতোপূর্বে।

বোতলে গঙ্গাজল যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল, তা যথারীতি সেবন করানো হল। মাকে ঘটনা খুলে বলা হয়েছিল সেবনের আগে। তাতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। চার-পাঁচ দিন অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে বলে মনে হল। কিন্তু সেটা টিকল না বেশিদিন। দশদিন পর থেকে অবস্থা তার আবার খারাপের দিকে এগুতে লাগল। খারাপ হতে হতে বাইশ দিনের মাথায় শেষ খারাপটিও গ্রাস করল তাঁকে।

আমাদের দেশে এমনই হাজারো পীর, ফক্বীর, দরবেশ বাবাজীরা লোক ভোলানো ছলছুতো বিছিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। এরা মানুষের অসহায়তা ও বিপন্নাবস্থাকে পুঁজি করে প্রতারণার জাল বিস্তার করেন। দুর্বল ঈমানের অধিকারী মনের ওপর সদম্ভে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কৌশল হিসেবে রাতের প্রথম/শেষ প্রহর, নদীর মাঝখান, নদীর মোহনা, ঘূর্ণিপাক, পাটের দড়ি, ফাঁসির দড়ি, কাঁচের বোতল, একটানে তোলা, শনিবার/মঙ্গলবার, তেমাথা, চৌরাস্তা ইত্যাকার ফন্দিফিকির জুড়ে দিয়ে এক ধরনের সম্মোহন সৃষ্টি করেন। এ সম্মোহনে একটা কাজ অবশ্য হয়। তাৎক্ষণিক কিছুটা শক্তি বা আত্মবিশ্বাসেরও সৃষ্টি হয়। যেমনটি হয়েছিল এই মার। যাতে তিনি প্রথমদিকে কিছুটা ভাল অনুভব করেছিলেন।

আমাদের সমাজের প্রবল ধন্বন্তরী, প্রভাবশালী পীর সাহেবদের দাপটের শেকড় কিন্তু খুব আলগা নয়। অনেকখানি গভীরেই প্রোথিত। কিন্তু আসলে এরা পরগাছা, পরজীবী এবং ঠকজীবীও। পরগাছাদের নির্মূল করতে চেতনা ও তাওহীদভিত্তিক প্রকৃত ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপক চর্চা দরকার।

www.i-onlinemedia.net

আশেপাশে যত পীর
ঈমান ধ্বংসের শয়তানী তীর

পীর শব্দটি ফার্সী শব্দ। এটা আরবী শব্দ নয়। কুরআন-হাদীসের পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত কোন শব্দও নয়। ব্যবহারিকভাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ উভয়কেই পীর বলা হয়। পারস্যের অগ্নিপূজারীদের পুরোহিতকে বলা হয় পীরে মুগাঁ। মুগঁ-এর বহুবচন মুগাঁ, যার অর্থ হচ্ছে অগ্নিপূজারীগণ। পীরে মুগাঁ মানে অগ্নিপূজারীদের পীর। ফার্সী অভিধানে পীরে মুগাঁর অর্থ করা হয়েছে 'আতাশ পোরস্তকা মুরশেদ' অর্থাৎ অগ্নিপূজারীদের পীর। তবে মুগাঁরা যখন তাদের পীরকে ডাকে তখন পীরে মুগাঁ বলে ডাকে না, পীর বলেই ডাকে।

অন্যদিকে পানশালার মদ বিক্রেতাকেও 'পীরে মুগাঁ' বলা হয়। কারণ সুফীবাদীরা আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপকভাবে মদ রূপে অভিহিত করে, উক্ত প্রেমরস-পরিবেশককে পীর বা 'গুড়ী মশাই' নামে অভিহিত করে থাকে।

তবে, মুসলিম দীক্ষাগুরু বোঝাতে অনেকেই পীর শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। মুরীদ একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ শিষ্য সাধক বা পীরের শিষ্য। মুরশিদ একটি আরবী শব্দ যার অর্থ 'আধ্যাত্মিক গুরু' বা 'ধর্মে সঠিক পথ প্রদর্শক'। ফার্সী 'পীর' এবং আরবী 'মুরশিদ' শব্দ দু'টির অর্থ একই। তবে আমাদের দেশে মুরশিদের পরিবর্তে পীর শব্দটিই বেশি প্রচলিত। পীরের শিষ্য বোঝাতে আরবী 'মুরীদ' শব্দটিই গ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভবত মুর্শীদ-মুরীদ বলার চেয়ে পীর-মুরীদ বলা বেশি সাবলীল বলেই এমনটা হয়েছে। এ দেশে পীরের সাথে আরেকটি শব্দ প্রচলিত আছে সেটা হল 'ফকীর' অর্থাৎ পীর-ফকীর; এখানে ফকীর কিন্তু আরবী শব্দ। ফকীর হল মরমী সাধক বা সাধু। আবার পীর-মুর্শীদ কথাটিও চালু আছে এ দেশে।

হিন্দুধর্মে যারা সন্ন্যাসী বা সাধু আমাদের মুসলিমদের মাঝে তারাই ফকীর নামে পরিচিত। হিন্দুরা বলে সন্ন্যাসী-বাবা বা সাধু-বাবা। মুসলিমরাও বলে পীর-বাবা বা ফকির-বাবা। 'বাবা' একটি তুর্কী শব্দ। হিন্দুরা পিতাকে বলে বাবা। কারো কারো মতে সংস্কৃত শব্দ 'বপ্র' থেকে 'বাবা' শব্দের উৎপত্তি। আসলে এ ধারণা ঠিক নয়। 'বপ্র' থেকে 'বাপু' হয়েছে, যার অর্থ 'পিতা'। 'বাবা' থেকে 'বাবু' হয়েছে। 'বাবু' শব্দটি ফার্সী। কারো কারো মতে 'বাবু' একটি বাংলা শব্দ কিন্তু সেটাও একটি ভুল ধারণা। যাহোক, হিন্দু সাধু বা সন্ন্যাসীর জন্য তুর্কী শব্দ বাবা এবং হিন্দু ভদ্রলোকের নামের শেষে ফার্সী বাবু শব্দের ব্যবহার হয়। ভারতবর্ষে কে প্রথম 'বাবা' শব্দটির প্রচলন করেছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। সেটা কি প্রথম মুসলিমদের দ্বারা (পীর-বাবা বুঝাতে) নাকি হিন্দুদের দ্বারা (সাধু-বাবা বুঝাতে) প্রচলিত হয়েছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত রূপে কোন তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। আবার এ ব্যাপারটিও সন্দেহজনক যে, 'পীর-বাবা' কথাটি ফার্সী ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত আছে কি-না। যদি সংস্কৃত

www.i-onlinemedia.net

শব্দ 'বপ্র' থেকে 'বাপু', 'বাপু' থেকে 'বাবু' এবং 'বাবু' থেকে 'বাবা' শব্দটির উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ভারতীয় হিন্দুরাই প্রথম 'সন্ন্যাসী-বাবা' কথাটির প্রচলন ঘটায় এবং তাদের দেখাদেখি মুসলিমরা 'ফকীর-বাবা' বা 'পীর-বাবা' কথার উৎপত্তি ঘটায়। আর ফার্সী ভাষাভাষীদের মধ্যে 'পীর-বাবা' কথাটির প্রচলন না থাকলে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলিমরাই 'সাধু-বাবা' বা 'সন্ন্যাসী বাবা'র পরিবর্তে নিজেদের 'পীর-বাবা' বা 'ফকীর-বাবা' কথার সৃষ্টি করে।

অতীতের যারা শাহ্, খাজা, খান ইত্যাদি মুসলিম উপাধি নিয়ে এদেশের মুসলিম জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, আজকের পীর-ফকীরেরা তাদের ন্যায় নাম ধারণ করে পীর-ফকীর সাজেন এবং মিথ্যা মাযার সৃষ্টিকালে ঐসব উপাধির কোন কোনটি অলীক পীরের নামে বা ফকিরের নামের সাথে যোগ করে দেন। মিথ্যা ও ভণ্ড পীরে এ দেশটা আজ ভরে গেছে। এদেরকে পীরাল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য হিন্দুদের অভিধানে একটি শব্দ ঠাঁই পেয়েছে, তা হল পীরালী। তারা ঐ সকল ব্রাহ্মণকে পীরালী বলে, যে মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেছে। তাদের মতে, ঐ ব্রাহ্মণ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারা এমন বিদঘুঁটে নাম দিয়েছে যা মুসলিমদের 'পীর' শব্দের সাথে জড়িত। এ হিন্দুরাই আবার মুসলিমদের জন্য একজন দেবতা সৃষ্টি করেছে, যার নাম দিয়েছে মানিকপীর। তাদের মতে, মুসলমানের গরু, ছাগল, ভেড়া, উট, মহিশ ইত্যাদি পশুর দেবতা হল মানিকপীর। কারণ, এ সবই উৎসর্গ[১] করা হয় পীরদের নামে। এ

---

[১] *'উৎসর্গ'* সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'অর্পণ'। এ অর্পণ স্বত্বত্যাগ করে অর্পণ। এ অর্পণ দেবতাকে অর্পণ। উৎসর্গ যখন জীবন দানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, তখনও এ উৎসর্গে দেবতার ছায়া থাকে, আমেজ থাকে। ধন-দৌলত উৎসর্গের প্রেক্ষাপটও তাই। সংস্কৃত ভাষায় এমন কতিপয় শব্দ আছে, যেগুলো শুধু ধর্মীয় কারণে ব্যবহার হয়, উৎসর্গ তন্মধ্যে একটি। হিন্দু ধর্মে আছে, মানুষের অন্তরে নারায়ণের আসন। এ জন্য তাদের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের অভিমত হচ্ছে, নারায়ণ-প্রেম অন্তরে নিয়ে কোন মানুষকে কিছু দান করলেও তা *'উৎসর্গ'* হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এ শাস্ত্রীয় বিধান সীমাবদ্ধ থাকার কথা। অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী সংস্কৃতি-সচেতন ব্যক্তিত্ব হিন্দুদের শাস্ত্রীয় নারায়ণ-দর্শনের বেখেয়াল ও অসচেতন অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের লেখা বই তাদের স্ব স্ব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা স্নেহভাজন স্বজনকে *'উৎসর্গ'* করে থাকেন। খুব ভালো কথা, সে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাতে পারেন, কিন্তু *'উৎসর্গ'* শব্দ ব্যবহার করে কেন তা করা হয়? এ শব্দ ব্যবহারে সবই যে বরবাদ হয়ে যায়। দেবতার জন্য যে শব্দটি নির্ধারিত, তাতে মুসলিমরা কেন হাত বাড়ান? দেবতাপন্থীরা তো মুসলিমদের থেকে কিছু নেয় না, মুসলিমদের শব্দ ভাণ্ডার থেকে তারা পারতপক্ষে কোন শব্দ আহরণ করে না। মুসলিমরা হিন্দু ধর্মের শব্দ ভাণ্ডার থেকে উৎসর্গের মতো শব্দ গ্রহণ ও ব্যবহার করেন কেন, তা বোঝা যায় না। মুসলিমদের শব্দ ভাণ্ডারে শব্দের কি এতই আকাল চলছে যে, *'উৎসর্গ'* শব্দের কোন বিকল্প বা প্রতিশব্দ নেই? যদি না থাকে তাহলে ভিন্ন কথা আর যদি থাকে তাহলে কেন ভিক্ষুকের মতো তা হাত বাড়িয়ে অপর থেকে গ্রহণ করেন? ইসলাম ধর্মসহ বিশ্বের প্রধান কয়েকটি ধর্মের নিজস্ব পরিভাষা আছে। হিন্দু ধর্মেরও নিজস্ব পরিভাষা আছে, *'উৎসর্গ'*ও তেমনি একটি শব্দ। মুসলিমদের জন্য *'উৎসর্গ'* শব্দটি অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ। *'উৎসর্গ'* শব্দটি শুধু ঈমান-আক্বীদা বিরোধীই নয়, এ শব্দকে স্বীকার করে নেয়া মানে সেই শব্দ-সংস্কৃতির জাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া। ফলে, সাধারণ অর্থে এ শব্দের ব্যবহার

www.i-onlinemedia.net

করুণ অবস্থা অবলোকন করে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বড় আফসোস করে বলেন,

তাওহীদের হায় এ চির সেবক,
ভুলিয়া গিয়াছে সে তাক্‌বীর।
দূর্গা নামের কাছাকাছি প্রায়,
দরগায় গিয়া লুটায় শির।
ওদের যেমন রাম-নারায়ণ,
এদের তেমন মানিক পীর।
ওদের চাল ও কলার সঙ্গে,
মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর।

পীর, পীরের আস্তানা এবং পীরের মাযারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে নানা রকম শির্‌কী কর্মকাণ্ড। আজকাল পীর এবং মাযারকে ঘিরে অজস্র তাওহীদ বিরোধী পাপাচারের চর্চা করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্কে এ বদ ফ্যাশনের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীর আর কোথাও এ রকম জঘন্যভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। আপনি যদি অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো ভ্রমণ করেন, তাহলে সেখানে কোথাও কোন পীর-আওলিয়ার মাযারে লালসালু, লাল কাপড়ের শামিয়ানা, নজরানার বাক্স, খাদেম-সেবায়েত, প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি, লাল ফকীর, বর্ণাঢ্য সৌধ ইত্যাদি দেখতে পাবেন না। তাই তো সেখানে মুশকিল আসানের লক্ষ্যে, সন্তান প্রত্যাশায়, রোগমুক্তি, ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক কল্যাণের আশায় কেউ কোন কবর বা মাযারকে উদ্দেশ্য করে ভ্রমণ করে না, নগদ টাকা ছাড়ে না, সিন্নী বিলায় না, মান্নতের পশু উৎসর্গ করে না, মোমবাতি জ্বালায় না, আগরবাতি দেয় না, উরস অনুষ্ঠান হয় না; যা এ দেশের মাযারে এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

এ দেশের মানুষ উৎপাত শুরু করেছে দু'দিক থেকে। একদিকে বর্তমান পীর নিয়ে আর অন্যদিকে অতীত পীর নিয়ে। যে পীর অতীত হয়ে গেছে, তার কবরকে মাযার

শুধু আপত্তিকর নয়, কবীরা গুনাহও বটে; এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শিরর্কের পর্যায়ভুক্ত। *'উৎসর্গ'* শব্দের পরিবর্তে আমাদের শব্দ ভাণ্ডারে অনেক শব্দ আছে। আমরা 'নজরানা' শব্দ ব্যবহার করতে পারি। 'নজরানা' আরবী শব্দ। এর ইংরেজি অর্থ হচ্ছে 'A present to a superiors'। আমরা ব্যবহার করতে পারি তোহফা ও হাদিয়া শব্দ। ত্যাগের ক্ষেত্রে যখন *'উৎসর্গ'* শব্দটি ব্যবহারের আবেগ আসবে, তখন আমরা কুরবান বা কুরবানী শব্দ ব্যবহার করতে পারি। তবে, জীবন উৎসর্গ করা আর জীবন কুরবান করা মোটেই এক অর্থবোধক নয়। দেবতার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা মানে 'বলি' হওয়া, আর আল্লাহ্‌র রাহে জীবন কুরবান করা মানে শহীদ হওয়া। মৃত্যু তো উভয় ক্ষেত্রে অবধারিত, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে আসমান-জমিন ও সত্য-মিথ্যার মতোই পার্থক্য। অতএব, *'উৎসর্গ'* শব্দ ব্যবহারে এখন থেকে আমরা যেন সতর্ক হই।

www.i-onlinemedia.net

পরিচিতি দিয়ে অনাচার শুরু করে দেয়। আর বর্তমান পীরকে নিয়ে নানা কাণ্ড-কীর্তন শুরু করে, তাকে নিয়ে ভক্তদের শির্কী-বিদআতী কাজকর্মের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

আজকাল বাংলাদেশের সর্বত্র কেন এ সকল মিথ্যা, ভণ্ড, প্রতারক ও ভেজাল পীরের অশুভ ভীড় ও চাপ? কারণটা হল পীরগিরি বা পীরালী এখন একটা চমৎকার ব্যবসা। শুধু ব্যবসা নয়, এতে প্রচুর সুনাম এবং অংহকারও আছে। এ সকল পীরালেরা মানুষদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে মুরীদের পকেটের পয়সা হাতায়। মরা গরু দেখলে যেমন শকুনেরা ভীড় জমায় তেমনি অজ্ঞ মূর্খ মুসলিম দেখলে ব্যবসা আর নামের পিয়াসী পীরালেরা (এবং পীরগণ) আস্তানা গেড়ে বসে। এরা বক ধার্মিক সাজে অর্থাৎ মুরীদ শিকারের সব রকম ব্যবস্থা নেয় এ তুলসী বনের বাঘেরা। এ সকল ভেজাল ও ভণ্ড পীরের প্রচার বেশি। বাস, ট্রেন, রাস্তার মোড়, বাজার, প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদিতে হকারেরা যেমন কাস্টমার ধরার জন্য নানারকম মুখরোচক কথা বলে সহজ-সরল মানুষের কাছে বস্তাপচা মালকে নাম্বার ওয়ান করে ফেলে, তেমনি পীরালেরাও বাজে ও শির্কী-বিদ'আতী বিষয়গুলোকে বক্তৃতা-বয়ানের দ্বারা রঙ-চঙ দিয়ে ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ তথা প্রকৃত ইসলামের জ্ঞানহীন সহজ-সরল মুসলিমদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহকে বিকৃত আদলে সাজিয়ে তোলে এবং তাদের কাছে প্রিয় করে দেয়। পীরালেরা নিজেদের ইচ্ছামতো কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে অজ্ঞ-মূর্খ ও সহজ-সরল মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেয়। তারা মানুষকে ইসলামের বিধি-বিধান বিষয়ে অজ্ঞ রাখতেই বেশি আগ্রহী। বর্তমানে সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, টিভি ও রেডিও মিডিয়াকেও ব্যবহার করা হচ্ছে এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে। সহজ-সরল-অজ্ঞ মুসলিমদেরকে আখিরাতের কল্যাণ ও দুনিয়াদারীর লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে এনে তাদের পকেটের কড়ি, হাঁড়ির চাল-ডাল, গাছের ফল, গাইয়ের দুধ, গোয়ালের গরু-মহিশ, খোয়াড়ের ছাগল-মুরগী আর অন্তরের ঈমান-আক্বীদা সব লুটে নিয়ে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে।

এ দেশে যে অসংখ্য পীর খই ফুটার মতো ফুটছে আর অসংখ্য মাযার ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়ে উঠছে তার একমাত্র কারণ এ দেশের অধিকাংশ মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান একেবারে শূন্যের কোঠায়। তাই তো তারা ধোঁকায় পড়ে ভুলে যায় তাদের করণীয় সম্পর্কে। ফলে তারা ঈমান-আক্বীদা হারায়, আর গোমরাহ-মুশরিক-বিদআতী হয়।

পীরালগণ যা করে

- পীরালগণ পীর-মুরীদী বিষয়টাকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করে। এদের থাকে দান বাক্স এবং নজরানা (দর্শনী) গ্রহণের ব্যবস্থা। নজরানা বা উপঢৌকন গ্রহণের জন্য তারা ছল-ছুতা খোঁজে। ফতোয়া দেয়। কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা

www.i-onlinemedia.net

করে। পীরকে নজরানা বা দর্শনী দিলে তিনি খুশী হন, যেমনটা খুশী হন দর্শনী পেয়ে পূজার ব্রাহ্মণ। নজরানা না পেলে ভণ্ডপীরেরা বেজার হন। কারণ, এটা তার আয়ের সবচেয়ে বড় ও প্রধান উৎস।

- পীরালগণ (ভণ্ড পীর) মাযারসহ বিভিন্ন স্থানে কাঠের বা ইটের তৈরি দানবাক্স বসিয়ে অথবা কোন শিষ্য-চেলা-চামুণ্ডার হাতে রশিদ বই ধরিয়ে দিয়ে অথবা খালি হাতে গাড়ীতে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তুলে দেয়। এটা পীরালদের আয়ের একটি বড় উৎস। মানুষের দান-খয়রাত তারা নিজেরা হাত পেতে না নিলেও বাক্স পেতে ঠিকই নেয়। অজ্ঞ মুসলিমরা পীরের নাম শুনেই বেহুশ। সাধ্যানুসারে কিছু না কিছু দান-খয়রাত করে থাকে। পীর সাহেবের কোন বিষয়ে তারা তলিয়ে দেখে না অথবা এ জাতীয় দান বৈধ কি অবৈধ তাও তারা ভাবে না। মাযারের দান বাক্সে দান করা, সেই দান সংগ্রহ ও ব্যয় সম্পর্কিত কোন বিধি-বিধান কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। মাযারে দান করা আর শিয়ালের মুখে মুরগী ছুঁড়ে দেয়া একই কথা। পীরের নজরানা বা দানবাক্সের দান গ্রহণ হচ্ছে সহজ-সরল মানুষের টাকা হাইজ্যাক করার সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ কৌশল। আসলে এ সব পীরালেরা সিঁধেল চোরের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব।
- ভণ্ডপীর বা পীরালেরা নিজেরাই নিজেদের প্রচার করে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাজার গরম করে তোলে এবং মুরীদ ও নজরানা সংগ্রহের জন্য প্রায়ই বিভিন্ন এলাকা সফর শুরু করে। জায়গায় জায়গায় মাহফিল করে। দেশের আনাচে-কানাচে সভা-সমিতি করে মুরীদ সংগ্রহ করে এবং পুরাতন মুরীদদের থেকে নজরানা সংগ্রহ করে। নতুন মুরীদেরাও দেয়। শুনেছি, আজকালকার পকেটমারেরা আস্-সালামু আলাইকুম বলেই অতি সুকৌশলে পকেট মেরে দেয়। পীরেরাও তেমনি পকেটমার। এরা মুসাফাহ করতে গিয়েই মুরীদের হাত থেকে নজরানা অতি কৌশলে বলতে গেলে *'অন্যে না দেখে'* মতো করে নিয়ে ফেলে। পীর হল মুরীদের পকেটমার। বাবার হাত সাফাই বড্ড প্রশংসনীয়।
- পীরালদের একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুরীদ জাতীয় চেলা থাকে। তারা খুবই ধুরন্দর প্রকৃতির। এরা সবসময় পীরের খাঁটি আশেকান হওয়ার ভান করে। তারা কোন রকম দাঁড়ি-কমা ছাড়াই পীরালের গুণকীর্তন করে। পীরালের এ সব সাঙ্গ-পাঙ্গরা অজ্ঞ-মূর্খ মানুষের কাছে নানা আজগুবি কারামতির কথা বলে। এরা মূলত পীরালের আশ্রিত ও পালিত সাগরেদ। এদের কাজই হল পীরালদের সম্পর্কে অলৌকিক কথাবার্তা বলা এবং খদ্দের (নতুন মুরীদ) জোটানো।
- পীরালগণ ইসলামী বিধি-বিধানের ধার ধারে না। ঠিকমতো সলাত-সিয়াম পালন করে না। আড়ালে-অন্ধকারে ধূমপান ও মদ-গাঁজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা সফরে গেলে বেশ-ভূষা বদলে ফেলে। সুযোগ পেলে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়।

www.i-onlinemedia.net

- পীরালেরা লম্বা বাহারী নাম পছন্দ করে। নামের সাথে এক ডজন বা আধা-ডজন বিশেষণ জাতীয় টাইটেল লাগাতে পারলেই খুশী হয়। যার টাইটেল যত লম্বা তিনি যেন তত বড় পীর।

মুরীদদের ভাবনা

পীরালদের যারা মুরীদ তাদের মধ্যে পীরাল সম্পর্কে যেসব চিন্তা-চেতনা কাজ করে তা হচ্ছে:

- মুরীদগণ মনে করে যে, পীরবাবা সকল সময় তার মুরীদ সন্তানগণের হাল-হাকীকত প্রভৃতি সবকিছু জানতে পারেন অর্থাৎ বাবা গায়েব জানেন।
- তাদের ধারণা, বাবার নামে তার দরবারের নামে মানত মেনে অর্থ-কড়ি, গরু-ছাগল, গরু-মহিশ প্রভৃতি দান না করলে বাবা খুশি হয় না আর সওয়াবও হয় না। এ সবের মাধ্যমেই তাদের মনের যত নেক মাকসূদ পূরা করতে হয়।
- তারা পীরের পা দু'টিকে বড় বেশি ইজ্জত করে। ঐ পায়ের ওপর পড়তে পারাকে তারা জান্নাতের দিকে ঝাঁপ দেয়া বলে মনে করে। পীরের দু'খানা পা'কে তারা যত মর্যাদা দেয়, আল্লাহ্‌র কুরআন তাদের কাছে কখনই তত মর্যাদা পায় না। তারা মনে করে যে, পীরের পা ধরা পুলসিরাত পার হওয়ার একমাত্র সহজ পথ। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ তাদের জন্য জটিল, কঠিন ও অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাই পীরের কেরামতি (?) পা-দু'খানাই তাদের একমাত্র সম্বল।
- তারা পীরের নামে দিওয়ানা। বাবার দরবারে হাজির হওয়ার জন্য টাকা খরচে কিংবা ঘুম-নিদ্রা বা খাওয়া-দাওয়া ত্যাগে তাদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। পীরের টাকা ভূতে যোগায়।
- তারা পীরকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে মনে বড় শান্তি পায়। হিন্দুরা বলে সন্ন্যাসী বাবা, সাধুবাবা আর মুসলিমরা বলে ফকির বাবা বা পীরবাবা।
- মুরীদদের অনেকেই (প্রায় সবাই) পীরবাবাকে সিজদা করে। তাদের ধারণা, বাবা হল 'জ্যান্ত-কাবা'। অর্থাৎ বাবা-কাবা।
- ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি মুরীদদের তেমন খেয়াল নেই। তারা মনে করে পীরই সব। তাই পীরকে খুশী করতে পারলেই ইহকাল ও পরকালে সকল বালা-মুসীবত থেকে রেহাই পাবে। তাদের ধারণা, পীরের সুপারিশই তাদেরকে আখিরাতে বিপদমুক্ত করবে।
- তারা মনের মাকসূদ পূরণের জন্য বা কোন বিপদে পড়লে কিংবা রোগাক্রান্ত হলে দূর থেকেই পীরের সাহায্য প্রার্থনা করে। এ দেশের অনেক পীরের মুরীদ তাদের লেখা চিঠির উপরিভাগে লেখে- 'খাজাবাবা সহায়'। এ ধরনের অজস্র

www.i-onlinemedia.net

পুরুষ-মহিলা মুরীদ এ দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের আশেপাশে এমন অনেক মুরীদ দেখা যায়, যারা সলাত-সিয়াম আদায় করে না এবং অন্যের হক্ব নষ্ট করায় ব্যস্ত। এদের পীর যেমন এরাও তেমন। মুরীদ যদি পরের ধন না মারে, তাহলে পীরকে দিবে কোথা থেকে, পরেরটাই তো পীরকে দিতে হয়। নিজের খাওয়া এবং বস-কে দেওয়ার জন্য পুলিশের এসপি সাহেবদের যেমন টাকার দরকার হলে নিম্নপদস্থদেরকে হুকুম দেন টাকা ম্যানেজ করার, আর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় এলোপাতাড়ি ধরপাকড় এবং মারধর। কামাই হয় দেদারছে। নিরীহ মানুষের সম্পদ ওসিরাও পায়, আবার এসপি সাহেবরাও নেয়। পীর-মুরীদের কারবারও সেই ওসি-এসপির মতোই। একদল অস্ত্রধারী, আরেকদল শয়তানী কৌশলপূর্ণ বুদ্ধিধারী।

- মুরীদরা পীরালের পালিত ও আশ্রিত সাগরেদদের বলা প্রতি কথায় বিনাবাক্যব্যয়ে প্রচণ্ড বিশ্বাস স্থাপন করে।

এ দেশের মানুষ যদি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতো, তাহলে এ দেশে পীরেরা এমন আরামের পীরালী ব্যবসা চালাতে পারত না। এ সব নামধারী পীরদের খপ্পরে পড়ে এ দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ প্রায় ঈমান হারা। পীর, মাযার এবং ফকির-দরবেশ নিয়ে আজ শির্কী কর্মকাণ্ডের ছড়াছড়ি। মাযার ঘিরে কেবলই পাপাচার। সরকারী হস্তক্ষেপে এদেশের সকল পীরের পীরালী ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া উচিত।

পীরবাদ বনাম ব্রাহ্মণ্যবাদ

হিন্দুধর্ম মতে ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য ব্রাহ্মণকে বলা হয় বর্ণ শ্রেষ্ঠ। তাই পৌরহিত্য করার একমাত্র অধিকার ব্রাহ্মণেরই। আর কারো এ অধিকার নেই। ব্রাহ্মণ মারা গেলে তার ছেলে হয় পুরোহিত। ছেলে মারা গেলে তার ছেলে, ছেলের ছেলে তস্য ছেলে- এভাবেই বংশানুক্রমে এ পৌরহিত্য চলতে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, পাণ্ডিত্য থাক আর না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ পৌরহিত্য করাটাই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের বংশগত ব্যাপার।

একইভাবে হিন্দু সমাজের মতো বংশানুক্রমে পৌরহিত্যের ধ্যান-ধারণা নিয়ে মুসলিম সমাজে গড়ে উঠেছে পীরবাদ এবং উদ্ভব হয়েছে পীর বংশের। পীর বংশের সবাই পীর যেমন- বড় পীর, মেঝো পীর, সেজো পীর, ছোট পীর অর্থাৎ পীরে পীরে একাকার। আবার পীর সাহেবের ছেলে-মেয়েরা সমাজে পরিচিত হন পীরজাদা, পীরজাদী হিসেবে। পীরালগণ পিতার মৃত্যুর পর গদ্দিনসীন হয়ে পড়ে। যে-ই পীর সাহেব ইন্তেকাল করলেন, এবার তার ছেলে হয়ে গেলেন 'গদ্দিনশীন' পীর। অজুহাত দেখানো হয় যে, মৃত্যুর পূর্বে তার পিতা তাকে গদিতে বসতে বলেছে। পীর সাহেব

www.i-onlinemedia.net

যদি জীবিত থাকতে প্রকৃতই 'অসিয়ত' করে গিয়ে থাকেন তার মৃত্যুর পর তার কোন্ ছেলে গদ্দিনশীন হবে, তাহলেই তো ভালই। নতুবা পীরের রেখে যাওয়া অযোগ্য পুত্রগণ গদী দখলের জন্য ঝগড়া-ঝাটি পর্যন্ত শুরু করে দেয়। এমনকি দলাদলি, লাঠালাঠি, মারামারি ও কোর্ট-কাচারী পর্যন্ত ছুটাছুটি চলে। মূলত, গদীর প্রতি লোভটা বেশি হয় টাকা ও সুনাম অর্জন হেতু। তবে, যদি পীরালের বাবা আরেক পীরাল হয়, তাহলে তিনি তার অযোগ্য পুত্রকে গদীতে বসিয়ে দিতে পারে আবার না বসালেও পুত্রটি সময়মতো ঠিক ঠিক বসে পড়বেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পীর সাহেবের একাধিক ছেলেরা এলাকা ভাগাভাগি করে নিয়ে পীরগীরি চালান। ঠিক এ যেন ফারায়েজ সূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা। ঠিক যেন বাপের জমিদারী নিয়ে কাড়াকাড়ি। অনেক ক্ষেত্রে পীর সাহেবের ছেলে না থাকলে ভাই, ভাতিজা, জামাই, নাতি যে-ই থাকুক সে-ই সেজে বসেন গদ্দিনশীন। বিদ্যা থাক আর না থাক, ইলম-কালাম থাক না থাক, আমল-আখলাক থাক না থাক- তাতে কী আসে যায়? পীরের 'নুৎফায়' পয়দা তো বটে। পীরালগণ মনে করে যে, পীর হওয়া তাদের উত্তরাধিকার। তাই তো পীরের বংশ রক্ষার জন্য যোগ্যতা না থাকলেও পীরালের সাজ নিতে হয়। সহজ-সরল অজ্ঞ মানুষকে ধোঁকা দিতে পীর হতে হয়। এভাবে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের মতোই বংশানুক্রমে পীরালগিরি চলতে থাকে। পীরদের এ গদ্দিনশীন হওয়া ব্রাহ্মণদের যজমানের[১] মতোই। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হবে। পীরের ছেলে গদ্দিনশীন পীর হবে। এটাই তো স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ্যবাদ আর পীরবাদের কি অপূর্ব মিল।

বংশানুক্রমে দ্বীনের ধারক-বাহক হওয়া বা পৌরহিত্য করা ইসলাম অনুমোদন করে না। 'পুরোহিত' শব্দের 'পুরো' অর্থ অগ্রে, 'হিত' অর্থ মঙ্গলকার্য; অর্থাৎ 'যিনি সর্বাগ্রে মঙ্গলকার্য সম্পাদন করেন' অর্থাৎ গুরু। আর 'পুরোধা' শব্দের 'পুরো' অর্থ অগ্রে, 'ধা' অর্থ ধারণ করা; অর্থাৎ অগ্রে যিনি ধারণ করেন অর্থাৎ যাজনকর্তা। এ কারণেই হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণই কেবল শাস্ত্রের যাগযজ্ঞ ও শ্রদ্ধাদি করার একমাত্র অধিকার রাখে। সাধারণ লোকের এ অধিকার নেই। কারণ, পৌরহিত্য করাটা ব্রাহ্মণদের বংশগত ব্যাপার। কিন্তু ইসলামে এ পৌরহিত্য করার অধিকার বিশেষ কোন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক মুসলিম স্বয়ং তার পুরোহিত। অর্থাৎ সৎকর্ম আগে সম্পাদনে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। সে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٣)

[১] হিন্দু সমাজে যে পূজা-যজ্ঞ করে থাকে বা যে ব্যক্তি দক্ষিণাদি দিয়ে পূজাদি কর্ম করায়।

www.i-onlinemedia.net

'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।' [সূরা আলি 'ইমরান (৩): ১৩৩]

কুরআনের এ আহ্বান সার্বজনীন এবং সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়।

পীর-মুরীদির যে প্রথা বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়া আবিষ্কার যা বিজাতীয় ধর্মের অনুসরণ মাত্র। এ প্রথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে ছিল না। তিনি কখনো পীর-মুরীদি করেননি। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর, আর না ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ। সাহাবায়ে কিরামও এ পীর-মুরীদি করেননি। তাঁদের কেউ কারো পীর ছিলেন না এবং কেউ ছিল না তাঁদের মুরীদ। শুধু তা-ই নয়, কুরআন-হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও এ পীর-মুরীদির কোন দলীল পাওয়া যাবে না।

কেউ পীর নামে খ্যাত হলে অমনি তার ছেলেরা নামের আগে-পিছে 'শাহ' শব্দ বলে অভিহিত হতে শুরু করে। 'শাহ' মানে বাদশাহ। পীরের ছেলেকে শাহ বা বাদশাহ বলার মানে এটা হতে পারে যে, পীর সাহেব নিজে একজন বাদশাহ; আর তার ছেলেরা হল 'ক্ষুদে বাদশাহ-বাদশাহজাদা'। বুড়ো বাদশাহ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ছেলেদের মধ্যে যে বড়, সে অমনি পীর-গদ্দিনশীন হয়ে বসবে। আর অমনি তার পুত্রেরা পূর্বানুরূপ 'শাহ' উপাধীতে ভূষিত হতে শুরু করবে। এ চিরন্তন নিয়ম আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি কখনো, কোন ক্ষেত্রেই। এ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, পীর-মুরীদীর প্রথাটাই আগাগোড়া একটা জাহেলিয়াতের প্রথা। অন্তত এ কথাটা তো অতি পরিস্কার যে, এ প্রথার প্রচলন হয়েছে এমন এক যুগে; যখন সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রচণ্ড বাদশাহী প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এ সর্বাত্মক ব্যবস্থার প্রভাবে নিতান্ত ধর্মীয় নেতৃত্বকেও অনুরূপ এক ধরনের বাদশাহী মনে করা হয়েছে। *'বাদশাহীর ন্যায় বাদশাহ্‌র ছেলে বাদশাহ হবে'*- এ নীতি অনুযায়ী পীরের ছেলে পীর হবে এ ধারণাও বদ্ধমূল করে নেয়া হয়েছে। বাদশাহ্‌র ছেলেকে বলা হয় 'শাহজাদা'- এ ঠিক শাব্দিক অর্থেই সঠিক প্রয়োগ (ইংরেজীতে Prince)। পীরের ছেলেকেও তাই 'শাহ' বলা হতে লাগল। কেননা, পীরও আসলে বাদশাহ নয়। আর তার ছেলেও নয় বাদশাহজাদা। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, পীরের ছেলেরাই সবকিছু, তারাই শাহ নামে অভিহিত হয়; তাদের মধ্যে বড়, সে-ই হয় গদ্দিনশীন। কিন্তু বেচারী মেয়েদের কোন অধিকার স্বীকৃত নয়, না মেয়েদের সন্তানদের কোন অধিকার সেখানে স্বীকৃত। সবকিছুই চলে *'পীরের ছেলে পীর, তার ছেলে পীর'*- এ ধারাবাহিকতার অব্যাহত ধারায়। এ ধারা কখনোই পীরের কন্যাদের দিকে প্রবাহিত হয় না। ঠিক বাদশাহী সিস্টেমও তাই। সেখানে গদি তথা রাজতখতের ওপর একমাত্র অধিকার ছেলেদের- সব ছেলে নয়, কেবলমাত্র বড়

www.i-onlinemedia.net

ছেলের। আর তার বংশধরদের। মুসলিমদের মাঝে যে বাদশাহী সিস্টেম রয়েছে, তাতে অবশ্যই অনেক সময় দেখা যায়, বড় ছেলে বাদশাহ হয়ে গেলে ছোট ভাই তাদের কেউ 'অলী আহমদ' হয়। তার মানে এ বাদশাহ্‌র পরে তার ছেলে না, তার এ ভাই হবে গদ্দিনশীন। কিন্তু পীর-মুরীদির ক্ষেত্রে এ বাদশাহী সিস্টেম এতদূর বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, এখানে বড় ছেলেই সব। বড় ছেলে একবার গদ্দিনশীন হয়ে বসতে পারলে সে-ই সবকিছুই হর্তা-কর্তা বিধাতা। সে পিতার কেবল গদিই দখল করে বসে না, পিতার মুরীদরা সব তার মুরীদ-এ পরিণত হয়ে যায় আপনা-আপনিভাবে। যেমন, জমিদার বা রাজার প্রজারা আপনা-আপনি তার ছেলেরও প্রজা হয়ে যায়। আর বিত্ত-সম্পত্তি কিছু থাকলে তারও একমাত্র ভোগদখলকারী হয় এই বড় সাহেব, যিনি গদ্দিনশীন হয়ে বসেন। ছোট ভাই কেউ থাকলে তারা হয় চরম অসহায়, উপেক্ষিত, বঞ্চিত, এর পিতার বিশাল মুরীদ মহল থেকে বিতাড়িত। এ বিষয়ে কারোই একবিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এ সিস্টেমের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। এ প্রথা বিন্দুমাত্র ইসলামী নয়। ইসলামে গদ্দিনশীনের কোন অবস্থান নেই, নেই শাহ হবার কোন সুযোগ। ছোট ভাই-বোনদের অধিকার হরণ করে একাই সবকিছু গ্রাস করে নেয়ার এ ব্যবস্থা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। এ প্রথা তথাকথিত জমিদারতন্ত্র, রাজতন্ত্র আর ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভৃতি জাহিলিয়াতের সব পদ্ধতিকে ছাড়িয়ে গেছে। এ পীর-মুরীদীর সাথে ইসলামের সুন্নাতের দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারে কি?

পীরবাদের মধ্যে কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন, কেউ বেদান্ত আধ্যাত্মবাদ, কেউ আবার নব্য-প্লেটোবাদের। আরবী সুফীবাদের সাথে ভারতবর্ষের সাধনপন্থা, আচরণবিধি, নিয়মশৃঙ্খলা ও নীতিশাস্ত্রের সমন্বয় হল। হিন্দু অতিন্দ্রীয়বাদী সাধনের সাথে সুফী-পীরদের ধ্যান-ধারণা ও সাধন পদ্ধতির মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য বিদ্যমান। হিন্দু সাধকদের তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি সুফী-পীরদের মারেফাত, হিন্দু সাধকদের পদ্ধতি সুফী-পীরদের ত্বরীক্বা, হিন্দু সাধকদের ধ্যান-তপস্যা সুফী পীরদের মুরাকাবা, হিন্দু সাধকদের সংযম সুফী পীরদের মুজাহিদা ইত্যাদি। সুফীবাদে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থাকলেও তাতে বৌদ্ধ নির্বাণবাদের বিলীন তত্ত্বের উন্মেষ ঘটেছে। অর্থাৎ বৌদ্ধরা পুনঃজন্মের ধারাবাহিকতায় পুণ্য করতে করতে এক পর্যায়ে স্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত বা মিলিত হয় এবং এটাকে বলে *'বিলীন হওয়া'*। একইভাবে সুফী পীরেরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে এ মিলনকে বলে ফানাফিল্লাহ। বৌদ্ধরা বিলীন অবস্থায় অবস্থান করাকে বলে নির্বাণ আর সুফী পীররা বলে বাকাবিল্লাহ। সুফী সাধনায় বিশেষ পন্থার 'সালীক' বা পথের পথিককে সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা 'সফর' বা চলার ও 'সুলুক' বা অভ্যাস করার জন্য পথ প্রদর্শনকারীকে গুরু মুর্শীদ বা পীরের সহায়তা আবশ্যক। এ পীর-মুরীদির ধারণা হিন্দু গুরুবাদের। গুরুবাদী সুফীগণ মুর্শীদ বা পীর গুরুকে মনে করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগস্থল। কাজেই গুরু/মুর্শীদ বা পীর স্রষ্টার মতোই ভক্তি বা শ্রদ্ধার পাত্র। হিন্দু ধর্মের গুরু-শিষ্যের কথা আছে। যিনি সাধনা ও ধর্মের ব্যাপারে শীর্ষস্থানে আছেন

www.i-onlinemedia.net

তিনিই গুরু পদবাচ্য। আর যারা সেই পথের পথিক ও রস-পিপাসু তারা গুরু আশ্রিত শিষ্য। সুফীবাদেও ঠিক তেমনি পীর-মুরীদ অর্থাৎ গুরু-শিষ্য।

সুফীবাদে পীর ছাড়া পথ দেখানোর আর কেউ নেই এবং পীর ছাড়া মুক্তিও নেই। এভাবে হিন্দু গুরুবাদ পীরবাদে রূপ নেয়। আর এ পীরতন্ত্রের প্ররোচনায় সমকালীন শরিয়তপন্থী আলেমদের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। আবার কিছু আলেম দুনিয়ার আকর্ষণে পীর বনে যান। ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে সুফী পীরদের তৎপরতা এবং তাদের ওপর বিজাতীয় ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ ও বেদান্ত ভাববাদ, নিও-প্লেটোনিক দর্শন, নাস্তিক মতবাদ, খৃষ্টীয় সন্তবাদ ও অতিন্দ্রীয়বাদ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত ও সমন্বিত রূপ ধারণ করে।

হিন্দু গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের মতো পীরের কাছে বাইয়াত করা শুরু হয়। ব্রাহ্মণদের শালিগ্রাম ছুঁয়ে শপথ গ্রহণের মতো পীরের পাগড়ী ধরে হলফ করা হয় এবং পীরের গদ্দিনশীন হওয়া ব্রাহ্মণদের যজমানের মতোই। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হবে আর পীরের ছেলে পীর হবে। এভাবেই হিন্দুদের ধ্যান-তপস্যা সুফী পীরদের মুরাকাবা, হিন্দুদের দর্শন সুফী পীরদের মুশাহাদা, হিন্দুদের কলকণ্ডলিনী শক্তি সুফী পীরদের লতিকা, হিন্দুদের ঈশ্বরের সত্তায় মিলন সুফীপীরদের ফানাফিল্লাহ এবং বৌদ্ধদের ইশ্বরত্ব লাভ বা নির্বাণ সুফীপীরদের বাকাবিল্লাহ, হিন্দুদের প্রাণায়ম বা জপ সুফীপীরদের যিকির-ফিকির, হিন্দুদের আখড়া সুফীপীরদের খানকা, হিন্দুদের সংগীত সুফী পীরদের সামা, হিন্দুদের মুছা বা ভবোন্মাদ সুফীপীরদের জুনুন ইত্যাদি নাম ধারণ করে।

ড. ওসমান গণি বলেন, 'সুফীদের আশীক ও মাশুক বৈষ্ণবদের রাধা ও কৃষ্ণ। সুফীদের হিজরান ও ওসাল বৈষ্ণবদের বিরহ ও মিলন, সুফীদের মায় ও শরাব বৈষ্ণবদের প্রেম ও প্রীতিচী, ইশক ইলাহী ভগবত প্রেম, আশেকে রাসূল হল কৃষ্ণ ভজন বা প্রেম ইত্যাদি।'[১]

ড. ইনামুল হক বলেন, 'কালের গতিতে সুফীবাদের সাথে হিন্দু যোগসাধন ও তন্ত্রচার পদ্ধতির একটা আপোষ-মিমাংসা হয়; ফলে সুফীবাদের সাথে বাংলাদেশের ধর্ম, সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল।'[২]

প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করতে কোন প্রকার দ্বিধা না করে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশেই ইসলামের সুফীমত বেশি প্রসার লাভ করে। এ সুফীমতের সাথে বাংলার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নেই। সুফীমতের ইসলাম সহজেই বাংলার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে আপোষ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল।'[৩]

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ও ইসলাম, ৫৬৬ পৃষ্ঠা।
[২] বঙ্গে সুফী প্রভাব, ৮৩ পৃষ্ঠা।
[৩] জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।

www.i-onlinemedia.net

আসলে, কুরআন-হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করে খুঁজেও সুফী পীরদের এ মোরাকাবা, মোশাহাদা, লতিকা, ফানাফিল্লাহ, বাকাবিল্লাহ, সুলুক, মনগড়া যিকির, খানকা ইত্যাদির সমর্থনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ বা রাসূল (ﷺ)-এর থেকে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের যুগেও এ জাতীয় 'আমল বা কার্যাবলীর নাম-নিশানা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে ইসলামের দুশমনরা এগুলোকে দ্বীনের মধ্যে সংযোজন করেছে।

অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর পীর নামে কথিত জাহিল লোক ও তাদের ততোধিক জাহিল মুরীদ এ পীর-মুরীদীকে দ্বীন-ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত বিষয় বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের মুরীদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, যদিও তাতে কোন মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়নি এবং এ বিপুল লাভজনক ব্যবসায়ে সঞ্চিত বিপুল অর্থের যাকাতও দেয়া হয় না কখনো।

বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কিছু কিছু লোক আছে তারা যেন একেবারে খাঁটি ইবলিশ। ইবলিশ যেমন নিজে জাহান্নামী তেমনি সে আদম সন্তানকে সঙ্গীরূপে সাথে নিয়ে জাহান্নামে যেতে চায়। এরাও তেমনি দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের নিমিত্তে চটকদার-মনভোলানো কিন্তু নাফরমানী তথা শির্‌কী ও কুফরী কাজ করে নিজেরা তো জাহান্নামী হয়েছে, তার সাথে অন্য সহজ-সরল মানুষদেরকেও জাহান্নামে সাথী করে নিচ্ছে। তার বিনিময়ে তারা দুনিয়াতে বালাখানা তৈরি করে অত্যন্ত জৌলুসের সাথে দিন যাপন করছে। বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই ধর্মভীরু। ইবলিসের দলটি সে সুযোগটি লুফে নিয়ে মানুষকে ধর্মান্ধতার ফাঁদে ফেলে বিপথগামী করছে। নিরীহ সরল সোজা মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে কম বুদ্ধিতা ও অজ্ঞ থাকার কারণে ইবলিশের তৈরি ফাঁদে পা দিয়ে ইহকাল ও পরকাল সবই হারাচ্ছে। এ সকল ভণ্ডরা নিজেদের পীর বলে ঘোষণা দেয় এবং নিজেদের পীরত্বের প্রমাণস্বরূপ তাদের নামের আগে-পিছে বিরাট লম্বা পদবী ব্যবহার করে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। এ ধরনের ভণ্ড ও প্রতারকদের ব্যবহৃত কিছু পদবীর নাম নিম্নে দেয়া হলঃ

পীরে কামেল (কামেল পীর), মুর্শীদে মুকাম্মাল (পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক), ইমামুল আইম্যা (ইমামগণের ইমাম), মুহীউস সুন্নাহ (সুন্নাতের জীবনদানকারী), মুহীউল বিদআত (বিদআতের মূলোৎপাটনকারী), কুতুবুল আলম (সারাবিশ্বের কুতুব), বাহিউজ্জামান (কালের স্থায়ী-যার মৃত্যু নেই), হাফেজুল হাদীস (হাদীসের হাফিজ), মুফতীউল আজম (বড় মুফতী), তাজুল মুফাচ্ছেরীন (তাফসীরবিদগণের মাথার মুকুট), রাইসুল মুহাদ্দেসীন (হাদীস বিশারদগণের নেতা), হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের দলীল), মুজাদ্দিদুজ্জামান (যুগের সংস্করক), সাইয়্যেদুল মুনাজ্জেরীন (দূরদর্শীদের নেতা), লিসানুল উম্মাত (উম্মতের কণ্ঠস্বর), ফকরুল উলামা ওয়াল মাশায়েখ (উলামা-মাশায়েখগণের অহংকার), আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী (হাসান ও হুসাইনের বংশধর), আল-কুরাইশী (কুরাইশ বংশধর), কামেউল বিদ'আত, গাউসে আজম, গাওসে

www.i-onlinemedia.net

সাকালাইন, ওলীয়ে কামেল, হাদীয়ে জামান, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, আশেকে রাসূল, খাজায়ে খাজেগান, শাহেনশাহে তরীকত, ওলীকুল শিরোমনি, সূফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, কেবলা, কাবা ইত্যাদি।

পীরতন্ত্রঃ ভেজালের মধ্যে ভেজাল

আজকাল অনেক পীরদেরকে বলতে শোনা যায়, 'বাবারা পীর ধরবা তো বুঝে-শুনে খাঁটি পীর ধরবা। তা না হলে, দুনিয়া ও আখিরাত সবই বরবাদ। কারণ বর্তমানে যেমন তেলে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, চিনিতে ভেজাল, গুঁড়ে ভেজাল, লবণে ভেজাল, ঔষধে ভেজাল তেমনি পীরেও ভেজাল ঢুকে পড়েছে।' এ আহ্বানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রত্যেক পীরই নিজের দিকে ইঙ্গিত করতে চায় যে, তিনিই হলেন একমাত্র খাঁটি পীর। বাকীরা সবাই হল ভেজাল। এক পীর আরেক পীরকে সহ্য করতে পারছে না। তাই দেখা যায়, যত পীর তত দল। কি সুন্দর দোকানদারী। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পণ্যকে খাঁটি ও আসল দাবী করছে। বিনা পূজির কি রমরমা ব্যবসা। আবার একদল অন্য দলকে শরীয়াত বিরোধী বা ভণ্ড বলেও আখ্যায়িত করছে এবং নিজেদেরকে শরীয়াতপন্থী বা শরীয়াতের পীর বলেও দাবী করছে।

শরীয়াতের যারা ধার ধারে না, তাদের দাবী হল, 'কুরআন আসলে ত্রিশ পারা নয় বরং তা চল্লিশ পারা। মৌলবীরা ত্রিশ পারা কুরআন নিয়ে কচুরীপানার মতো কেবল ভেসেই বেড়াচ্ছে, আর আসল ভেদ আমরাই পেয়েছি। যে দশ পারা আমাদের কাছে আছে, তাতেই রয়েছে হাকিকত ও মারেফাতের আসল তত্ত্ব। এ দশ পারা কুরআন কোথাও লেখাজোখা নেই। এগুলো খুব গোপনীয় ব্যাপার। এগুলো সব সীনায়-সীনায় চলে আসছে। আমরাই সেসবের ধজাধারী।' তারা আরো বলে, 'আল্লাহ তা'আলা ত্রিশ হাজার কথা মৌলবীদেরকে দিয়েছেন, আর ষাট হাজার গোপন কথা আমাদেরকে (পীরদেরকে) দিয়েছেন। আর ঐ ষাট হাজার গোপন কথাই হচ্ছে আসল কথা।' তাতেই নাকি রয়েছে কবর পূজার কথা, কবরকে সিজদা করার কথা, উরসের নামে ইসালে সওয়াবের মেলা বসানোর কথা, হৈ-হুল্লোড় করে যিকির করার কথা, গান বাদ্যের কথা, পীরের ধ্যান করার কথা আরও কত কি...। এর মধ্যে এমন অনেক বেফাঁস ধ্যান-ধারণার কথাও আছে যা কলমে লিখতে লজ্জাবোধ হয়। এ কারণে, এরা শরা-শরীয়াতের ধারও ধারে না।

www.i-onlinemedia.net

বিশিষ্ট সব ব্যক্তিত্বের মাযার শুনুন কিছু মজার সমাচার

যে স্থানে মুসলিমদের মৃতদেহ দাফন করা হয়, তা আমরা কবর বলি। আবার এ কবরই অনেক ক্ষেত্রে মাযার হিসেবে পরিচিত। মাযার একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হল দর্শনীয় স্থান। আজকাল আমরা মাযার নিয়ে যা শুরু করেছি তাতে শুধু শির্কের বেসাতি ছড়াচ্ছে। ফলে তা আজ শির্ক প্রদর্শনীর স্থান হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। হিন্দুদের যেমন তীর্থযাত্রা[১] মুসলিমদের তেমন মাযার যাত্রা। হিন্দুরা তীর্থ মন্দিরে দেব-দেবীর পূজা করে আর মুসলিমরা মাযারে গিয়ে মাযার বা পীরপূজা করে।

অধুনা প্রচুর কবর কিংবা ভুয়া কবর মাযার পরিচিতি পেয়ে গেছে। অবশ্যই প্রতিটি মাযার এক একটি কবর কিন্তু প্রতিটি কবর অবশ্যই এক একটি মাযার নয়। কবর বা ভুয়া কবর মাযার পরিচিতি পেয়েছে। কারণ, মাযার আজকাল একটি চমৎকার ব্যবসার হাতিয়ার। তাই, মাযার বলতেই এখন চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে একটি আজব প্রতিষ্ঠানের ছবি। কবরস্থান এবং প্রতিষ্ঠান এক বিষয় নয়। কবরস্থানের কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই। কিন্তু মাযারের তা আছে। মাযারে আছে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি, সৌধ, অফিস, খাদেম জাতীয় নানা কর্মচারী, দান বাক্স, আবাসস্থান, মসজিদ, খানকা, এতিমখানা, মাদ্রাসা, দোকানপাট, পুকুর, প্রস্রাবখানা, পায়খানা প্রভৃতি নানা কিছু। অর্থাৎ রীতিমতো একটি কমপ্লেক্স। পক্ষান্তরে, কবরস্থানের এত কিছু নেই। সেখানে শুধুই কবর, চতুর্দিকে বেড়াজাতীয় কিছু একটা সীমানা বা প্রাচীর এবং প্রাচীরগাত্রে কবরবাসীর নাম-পরিচিতি অথবা প্রাচীরের ওপর কবরবাসীর নাম-পরিচিতি যুক্ত সাইনবোর্ড। আর এ কারণেই কবরে কোন কমপ্লেক্স বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে না।

---

[১] *'তীর্থযাত্রী', 'তীর্থযাত্রা'* এ শব্দগুলো মুসলিমদের শব্দ নয়, মুসলিম সংস্কৃতির-কৃষ্টির কোন পরিভাষাও নয়। প্রকৃতপক্ষেই এ সংস্কৃত শব্দ 'তীর্থ' মুসলিম পরিভাষায় নেই। 'তীর্থ' যে ভাষার শব্দ সে ভাষার অভিধানে 'তীর্থ' শব্দের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'তীর্থ' মানে পূণ্যস্থান (মিলন তীর্থ), হিন্দু দেবতা বা মহাপুরুষদের লীলা ক্ষেত্র বা অধিষ্ঠানভূমি বা বাস ভূমি, পাপ মোচনের স্থান (A place for Pilgrimage)। 'তীর্থ' অর্থ গুরু, পণ্ডিত ইত্যাদি। ব্যাকরণ তীর্থ ও কাব্য তীর্থ প্রভৃতি শব্দ গুরু বা পণ্ডিত অর্থযুক্ত। ড. অ্যান্নাডেল তাঁর *Concise English Dictionary*-তে তীর্থযাত্রীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'একজন ভ্রমণকারী, যে তার দেশ থেকে দূরে অবস্থিত কোন মন্দির, গীর্জা বা পবিত্র স্থান পরিদর্শন করতে আসে অথবা কবরস্থ কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানাতে আসে, এ সংজ্ঞাগুলোর কোন একটিও মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদিকে বাংলা একাডেমী 'তীর্থ'-এর অর্থ লিখতে গিয়ে তীর্থ শব্দকে খতনা করে মুসলিম করেছেন, কিন্তু কালিমা পড়াননি। বাংলা একাডেমী 'তীর্থ' শব্দের অর্থ লিখেছে 'পাপ মোচন' আর ব্রাকেটে লিখেছেন (মক্কা তীর্থ)। নকল করতেও দক্ষতা লাগে, সে দক্ষতাও বাংলা একাডেমী দেখাতে পারেনি। মক্কায় মুসলিমরা তীর্থ করতে যান না, যান হজ্জ বা ওমরা করতে। মুসলিমদের অভিধানে তীর্থ শব্দই নেই, কোন মুসলিম যদি মক্কা তীর্থ, মদীনা তীর্থ বা হৃদয় তীর্থ লেখেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মক্কা, মদীনা ও হৃদয়কে তীর্থ অভিধায় অভিহিত করে অজ্ঞাতে একটা গুনাহের কাজ করা হয়। আবার, 'তীর্থের কাক'ও পরিত্যাজ্য। তীর্থকেই যখন স্বীকার করি না, তখন তীর্থের কাক আর চিলকে তো গ্রহণ করতে পারি না। যাহোক, 'তীর্থ' যাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের জন্য যথার্থ শব্দই 'তীর্থ', আমাদের জন্য নয়।

www.i-onlinemedia.net

কবর ও মাযারপূজার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মাযারে আর কবরে পার্থক্য থাকবে কেবল নামের মধ্যে এবং কবরবাসীর মর্যাদার কারণেই সেই পার্থক্য। বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণের কারণেই এটা হয়েছে। মধ্যযুগে মুসলিমদের দ্বারা যে কবর পূজা তা খ্রিষ্টান বা ইয়াহুদীদের থেকে সে কালের মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

ইসলামের বিরুদ্ধে বিশেষকরে আল্লাহ্‌র একত্বের চেতনাকে বিনষ্ট করার চক্রান্ত একদিনের জন্যও থেমে ছিল না। ইবলিশ শয়তানের কারসাজিতে একদল লোক সর্বদাই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যখনই মুসলিমদের মধ্যে অজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে তখনই শয়তান ও তার দোসররা তাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল সে ছিল ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। সে মুসলিম ছদ্মাবরণে ইসলামে প্রবেশ করে এবং সর্বপ্রথম 'সাবাইয়া' নামে একটি ফিরকার সৃষ্টি করে। তাদের ষড়যন্ত্রের কারণেই ইসলামের তৃতীয় খলীফা উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হন। এরাই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আর এদের মধ্যে থেকেই শিয়াদের বিভিন্ন উপদল যেমন, খারেজী, রাফেজী ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে। এ দলগুলোই বংশানুক্রমে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম দিতে থাকে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার বংশধরেরাই ৪০০ হিজরী সনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়। তারা 'ফাতেমী' নাম ধারণ করে, যাতে সাধারণ মানুষ তাদেরকে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বংশধর বা উত্তরাধিকারী মনে করে। প্রকৃতপক্ষে এরা নাবী তনয়া ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তথা আহলে বাইতের উত্তরাধিকারী তো ছিলই না বরং এরা ছিল ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অবৈধ বংশধর। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনু কাসীর তাদের সম্পর্কে বলেন, 'কাফির, ফাসিক্ব, পাপিষ্ঠ, ধর্মত্যাগী, যিন্দিক, মুনাফিক, আল্লাহ তা'আলার সিফাত অস্বীকারকারী এবং ইসলাম অস্বীকারকারী অগ্নিপূজকদের মতো তারা ছিল কাফির। তারা সালাত আদায়ও করত না এবং হজ্জও করত না। এরা ক্ষমতা গ্রহণের পর দেখতে পেল যে, মুসলিমরা ইবাদতের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং মসজিদগুলো কানায় কানায় মুসল্লীতে ভরপুর। এরা তখন প্রমাদ গুনল। তারা তখন মুসলিমদেরকে মসজিদ হতে বিমুখ করার বিকল্প পন্থা খুঁজতে লাগল। তারা জানত যে, মানুষকে সরাসরি ইবাদাত থেকে ফিরানো যাবে না। তাই, ইবাদতের 'খোলস' ঠিক রেখেই তাদেরকে গোমরাহীতে নিক্ষিপ্ত করতে হবে। তারা এটাও জানত যে, মুসলিমদেরকে সরাসরি মূর্তিপূজায়ও লিপ্ত করানো যাবে না। তাই ইবাদতের নামে তাদেরকে এমন কাজের দিকে নিয়ে যেতে হবে যাতে পরিণতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে এবং মূর্তিপূজকদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য না থাকে।

www.i-onlinemedia.net

Contents-1 Contents-2

প্রথমে এরা বিভিন্ন স্থানে সুপরিকল্পিতভাবে মাযার ও কোব্বা বানাতে শুরু করে। এরপর লোকদের মধ্যে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, এটা হোসাইন (রাঃ)-এর মাযার, এটা যয়নব (রাঃ)-এর মাযার ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে এ সব মাযারে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। মানুষের মাঝে এ ধারণাও দিতে থাকে যে, এ সব কবর যিয়ারত করা, তাতে মান্নত করা ইত্যাদি বড়ই বরকত ও সওয়াবের কাজ। সময়টা ছিল ইসলামের খুবই কঠিন ও পতনের যুগ। মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে দ্বিধা, সংশয়, সন্দেহ ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র তখন সক্রিয় ছিল। আর সরকার বা রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা এ কাজকে আরও বেগবান করে যাচ্ছিল। অনেক লোক তাদের কথায় আকৃষ্ট হতে লাগল। ফলে তারা নিয়মিতভাবে মাযার যিয়ারতের কাজকে ইবাদত বানিয়ে নিল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) যে কাজকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে গিয়েছিলেন তা-ই পুনরায় চালু হয়ে গেল।

সুফীবাদ ও সুফীদের উত্থানে এ কবর বা মাযার পূজা হালে জল পেয়ে গেল এবং তা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিভিন্ন স্থানে সাহাবীদের এবং পূর্ববর্তী পূণ্যবান লোকদের কবরগুলোকে চিহ্নিত করা শুরু হল। সেগুলোকে পাকা করা, উঁচু করা থেকে শুরু করে সেখানে কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা হতে লাগল। কবরের চারপাশে দেয়াল ঘিরে তার মধ্যে অতি আকর্ষণীয় মিনার তৈরি হতে লাগল। কোন সুফী বা তার পীর মারা গেলে তাকে কবরস্থ করার পরপরই তা পাকা মাযারে পরিণত করা হতো। এভাবে প্রতিটি এলাকায় নতুন নতুন মাযারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এক পর্যায়ে মাযারের সংখ্যা মসজিদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে লাগল। কোন কোন স্থানে মসজিদ এবং মাযারকে সমান্তরালভাবে পাশাপাশি স্থাপন করা হতো, যাতে মানুষ দুটোকেই ইবাদতের স্থান মনে করতে পারে। এমনকি সাজসজ্জা ও আকর্ষণীয়তার দিক থেকে মসজিদের চেয়ে মাযারের চাকচিক্য অনেক বেশি প্রাধান্য পেল।

মসজিদগুলো যখন আলোর অভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত, মাযারগুলোর আলোতে তখন চারিদিকে আলোকিত হয়ে যেত। তৎকালীন সুফী-দরবেশরা এ মাযারগুলোকে কেন্দ্র করে চিল্লাকাশী করত। এটা মানুষের মন-মগজে বিরাট প্রভাব বিস্তার করল। এবার মানুষ মসজিদে এবং মাযারে যাওয়ার মধ্যে তেমন পার্থক্য মনে করত না। তাই তারা মসজিদে যেমন সালাতের জন্য যেত তেমনি মাযারেও যিয়ারতের জন্য যেত, মসজিদে গিয়ে যেমন আল্লাহ্‌র কাছে চাইত তেমনি মাযারে গিয়ে কবরস্থ ব্যক্তির নিকট চাইত, মসজিদে গিয়ে যেমন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করত তেমনি মাযারে গিয়ে কবরস্থ ব্যক্তির সান্নিধ্য কামনা করত, আল্লাহ্‌র নামে যেমন যবেহ বা কুরবানী করত তেমনি মাযারের বা পীরের নামেও মান্নত করে তা যবেহ করত। এক কথায় আল্লাহ তা'আলা ও কবরস্থ ব্যক্তির মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য বজায় রইল না। মূর্তিপূজার পরিবর্তে শুরু হয়ে গেল কবর পূজা। এ কবরপূজা হল মূর্তিপূজার নব্য

www.i-onlinemedia.net

সংস্করণ। পার্থক্য শুধু হচ্ছে- আগেরদিনে নেককার বান্দাদের মূর্তি তৈরি করে তার উপাসনা করা হতো। তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হতো, তাদের নামে মান্নত মানা হতো। আর বর্তমানে ঐ নেককার ব্যক্তিদের 'মরদেহ'-এর উপাসনা করা হচ্ছে। তাদের নামে মান্নত মানা হচ্ছে, তাদের কাছে কাংখিত বস্তু চাওয়া হচ্ছে এই আর কি।

এ কবরভিত্তিক ইবাদত তথা কবরপূজার অভিশাপ সুফীদের আশির্বাদে সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি মক্কা, মদীনা, হেজায ও নজদ এলাকাও এর থেকে বাদ পড়েনি। এর ব্যাপকতা যে কত ভয়াবহ ছিল তা বর্ণনাতীত। মূলত তখনকার আরব জাহানের বিভিন্ন এলাকা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর ন্যায় আক্বীদাগত অধঃপতন ও ভ্রান্তির সাগরে নিমজ্জিত ছিল এবং যা বিভিন্ন তরীক্বাপন্থী পীর-মাশায়েখ ও স্বার্থান্বেষী মহল দ্বারা পরিচালিত হতো। ইরাকের বাগদাদ, নজফ ও কারবালা ছিল মাযারপূজার তীর্থভূমি। এরপর ভারতবর্ষ (বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) হল এ কবর বা মাযারপূজার সবচেয়ে উর্বরভূমি। অধিকাংশ আলেম-উলামা সুফীবাদে প্রভাবিত হওয়ার কারণে এ তিনটি দেশে মাযার ও কবরভিত্তিক উপাসনালয়গুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং আজ অবধি তা অব্যাহত গতিতেই বেড়েই চলেছে। মূলত ইবলিশ শয়তানের প্ররোচনায়, ইসলাম বিরোধী অপশক্তির সহযোগিতায় এবং পীরতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজে চালু রয়েছে মূর্তিপূজার নব-সংস্করণ কবর পূজা, মাযার পূজা। প্রকৃতপক্ষে, পীরতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে এ কবর পূজার সৃষ্টি হয়েছে।

এ কালের মুসলিমদের মধ্যে বিশেষত এ উপমহাদেশীয় মুসলিমদের মধ্যে কবর পূজা, পীর পূজা প্রভৃতি শির্ক জাতীয় অনাচার-কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি থেকে। মূলত আজকের সংস্কৃতির পুরোটাই হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুদের মন্দিরের গতি-প্রকৃতি এবং মঠ-শ্মশানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলই তা সহজে আঁচ করা যায়। হিন্দুদের তীর্থ মন্দিরে রয়েছে সেবাদাসী, সন্ন্যাসী, সৌধ, দান ব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আবাসস্থল, পূজা মন্দির, সেনিটেশন ব্যবস্থা, রন্ধনশালা, সেবায়েতরূপী কর্মচারী, অফিস, উদ্যান প্রভৃতি নানা কিছু।

আদি ভারতীয়দের মধ্যে সেকালে গাছ পূজা, পাথর পূজা, সূর্য পূজা, অগ্নি পূজা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কালে কালে সেসব রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দু মুনি-ঋষিগণ জনমানবহীন স্থানে গাছতলায় বসে ধ্যান-সাধনা করতেন। সেই গাছতলা দিনে দিনে ধর্মতলা হয়ে উঠত। মুনি-ঋষিগণের আশ্রম তৈরি হতো সেখানে। মন্দির তৈরি হতো এবং পূজা চলত। এভাবেই সেই স্থান হয়ে উঠত থান (আশ্রম) বা তীর্থস্থান। জনমানবহীন প্রান্তর বা বন-বাদাড় এভাবেই হয়ে ওঠে লোকালয়। মুনি-ঋষিদের আস্তানায় জুটে সাধু, সন্ন্যাসী, সেবায়েত-সেবাদাসী ইত্যাদি। সাধু বা সন্ন্যাসী বাবারাই হয়ে ওঠেন মন্দিরের পুরোহিত। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে মন্দিরের পূজা হতে শুরু করে তীর্থ কমপ্লেক্সের যাবতীয় বিষয়াদি চলে।

www.i-onlinemedia.net

মুনি-ঋষিদের অনুকরণে লোকালয়েও পূজাস্থান তৈরি হয়। বাড়ির আঙ্গিনায় তুলসী, শেওড়া প্রভৃতি পূজা চলতে থাকে। কখনো বাড়ির সদরে একটা উঁচু ভিটায় কখনো-বা পুকুর পাড়ে আবার বাড়ির বাইরে অশ্বত্থ গাছতলায় পূজাবেদী নির্মাণ ক'রে তৈরি হয় দেব-দেবীর প্রতিমা। তীর্থস্থানের তীর্থ-মন্দিরেও এ দেব-দেবীর প্রতিমাই মুখ্য। এদের ঘিরেই তীর্থস্থান। এখানে যেসব মুনি-ঋষি, সাধু ইত্যাদি রয়েছে তারা সবাই উঁচুবর্গের হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ। এ ব্রাহ্মণ সাধু পুরোহিতরা ক্ষত্রিয়[১] রাজাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের লালন-পালনের জন্য এবং আশ্রমের জন্য ক্ষত্রিয় রাজা ভূ-সম্পত্তি দান করে। দেবালয় তথা তীর্থমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার-প্রসার এ সব সম্পত্তির আয় থেকেই হয়। আর এ সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতোই প্রাচীন ভারতের লোকজনেরা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের পূজা করত। এ সবের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যই তারা এ পূজা দিত। কালক্রমে যখন হিন্দুধর্মের নানা দেব-দেবীর পূজা শুরু হয়, তখন নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচারের সৃষ্টি হয়। রোগ-শোক, দ্বন্দ্ব-সমস্যা, বিবাহ, শস্য ও ধন-সম্পদের হেফাজত, অভাব-অনটন থেকে রেহাই, পুত্রলাভ, কন্যাদায় মুক্তি, চাকরি প্রাপ্তি, পরীক্ষা পাস, মামলায় জয় লাভ ইত্যাদি নানা খেয়ালে মানুষ দেবতার আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হবার জন্য এ দেব মন্দিরে এসে পূজা দিতে থাকে। তাদের এ নিয়াত-মানত পূরণের জন্য তারা দেবতার ভোগ নিয়ে আসত। তারা চাল-ডাল, হাঁস-মুরগি, পাঁঠা, শস্য-ফলাদি, দুধ, অর্থকড়ি নানা কিছু দেবতার ভোগ হিসেবে নিয়ে আসত। আর দেব মন্দিরের পুরোহিতরা জনগণকে এ সব আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। তারা বলত, 'এ সব লাভ করতে হলে শিব বা দুর্গার পূজা দিতে হবে, দেবতার ভোগ দিতে হবে, তারপরই আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হবে, নানা সমস্যা মুক্তি ঘটবে, স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হবে, নরকমুক্তি হবে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সুখ-সম্পদ-শান্তি আসবে।' অজ্ঞ-মূর্খ হিন্দুরা কুটবুদ্ধির ব্রাহ্মণের কথায় ভুলে গিয়ে দেব-দেবীর বর বা আশীর্বাদ লাভে ধন্য হতে নিজের সর্বস্ব নিয়ে দেবালয়ে বা মন্দিরে হাজির হতো। আর এ সব দেবতার ভোগ মন্দিরের পুরোহিত, সাধু, সন্ন্যাসী, সেবাদাস, সেবাদাসী ইত্যাদি সকলে মিলে ভোগ করত। সেই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।

মুসলিমদের মাঝে কোন কালেই বৃক্ষপূজা বা প্রতিমা পূজা ছিল না। আজকের বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে নানা ইসলাম প্রচারকের মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ও অন্যান্যরা সেসব ইসলাম প্রচারকদের প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয় এবং তাঁদের স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। এভাবেই তাঁদের পক্ষে স্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়ে ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হয়। ধর্মচর্চা ও প্রচারের জন্য তাঁদের আস্তানায় খানকাহ প্রতিষ্ঠা

[১] হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ।

www.i-onlinemedia.net

করেন তাঁরা। তাঁদের মৃত্যুর পর এখানেই তাঁদের দাফন-কাফন করা হতো। আর এ মানুষদের কবরসমূহ দরগা বা মাযার রূপে মানুষের কাছে পরিচিতি পায়।

ঐসব বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারকগণ মারা যাবার পর তাঁদের ভক্তকূল সেই আস্তানা ছাড়ল না। তারা সেখানে পড়ে রইল। সেসব কবরসমূহ (মাযার) যিয়ারত করতে তাঁদের ভক্তগণ দূর-দূরান্ত থেকে আসতে লাগল। আর এ ভক্তদেরকে মাযারে আসতে উদ্বুদ্ধ করল সেসব তথাকথিত খাদেম বা খাদেম-পীরগণ। তারা যেন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁদের (কবরস্থ ব্যক্তিদের) স্থান দখল করে বসল। মাযারে দান-খয়রাত করতে ভক্ত-অনুরক্তদেরকে উৎসাহিত করতে লাগল। আর অজ্ঞ মুসলমানরা নানা নিয়াত-মানত করে দরগা বা মাযারে টাকা-কড়ি, শিরনী, মোমবাতি, চাল-ডাল, লাউ, কুমড়া, গরু, মহিশ, উট, দুম্বা, খাসি, দুধ, মুরগী, ডিম, ভাত, নারিকেল, কলা ইত্যাদি নানা কিছু মাযারের উদ্দেশ্যে দান করতে লাগল। আর হিন্দু পুরোহিত ও অন্যান্যদের মতো মাযারের খাদেম-পীরেরা তা ভোগ করতে লাগল। উভয় পক্ষই তথাকথিত পীর-ওলি-আওলিয়া ও দেবতার নামে অজ্ঞ-নিরীহ ও সহজ-সরল মানুষের অর্থ-সম্পদ সবকিছু ভোগ করছে। এ হচ্ছে জনগণের মাল-কড়ি ছিনতাইয়ের সবচেয়ে মোলায়েম কৌশল।

হিন্দুদের মুনি-ঋষিদের গড়া পূজা মন্দির যেমন এককালে তীর্থস্থানের মর্যাদা পেল এবং রাজা, জমিদারদের দান-অনুদানে পুষ্ট হতে লাগল, তেমনি তথাকথিত ওলি-আওলিয়াদের মাযারও সাধারণ মানুষ ও আমীর-সুলতানগণের অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে রাজকীয় বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। জনকল্যাণের একটা অঙ্গ মনে করেই মুসলিম শাসকগণ ও ধনবান ব্যক্তিগণ দরগার জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি লাখেরাজ সম্পত্তিরূপে বরাদ্দ করেন। প্রথমদিকে দরগার খাদেমগণ কর্তৃক মাযার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য ঐ সম্পত্তি তাদের দ্বারাই ভোগ-দখল হতো। পরবর্তীতে মাযার পরিচালনা বা ম্যানেজিং কমিটি তৈরি করে তার অধীনে সেসব সম্পত্তি ন্যস্ত করা হয় এবং উক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে দেশ ও দশের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। প্রথমদিকে কেবল দরগায় বাতি দেয়ার জন্য দরগার পরিচর্যাকারী খাদেমকে যে নিষ্করভূমি দেয়া হতো তাকে বলা হতো চেরাগী বা চেরাগী মহল। আজকাল বিদেশী এনজিও নামের প্রতিষ্ঠানগুলোর যাত্রা যেভাবে শুরু হয়েছে, খাদেম ও মাযারের যাত্রাও সেভাবেই শুরু হয়েছে। শুধু কি দরগায় বাতি দেয়া? সেখানে এখন হরেক রকম এতিমখানা, মাদ্রাসা, মক্তব, পুকুর, দিঘী, মসজিদ, মাযার, সৌধ প্রভৃতি রয়েছে। অর্থাৎ মাযার কমপ্লেক্স। ওলি-আওলিয়া-দরবেশের মৃত্যু দিবসে ও অন্যান্য সময়ে এখানে হালকা জিকির ও দু'আর আয়োজন হয়। ওলিগণের মৃত্যু দিবসে উরস হয়, দু'আ-জিকির এবং ওয়াজ মাহ্ফিল হয়। এভাবে ইসলামী জলসা ও উরসের মাধ্যমে দিনে দিনে মাযারের প্রধান খাদেম হয়ে ওঠেন মাননীয় পীর খাদেম এবং এক পর্যায়ে কেবলই পীর। খাদেম আর থাকেন না। তখন খাদেম হয়ে ওঠে অন্যান্য নিচু স্তরের সেবায়েতরা। ওদের কেউ একজন হয় প্রধান খাদেম, তারপর

www.i-onlinemedia.net

এক সময় সেও হয়ে যায় পীর। এ রকম করেই চলতে থাকে বংশধারার মতো। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পূর্বকালের ওলি-দরবেশগণ ছাড়া এদেশে যেসব পীর-ফকির রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে খাদেম কখনও পীর হয় না। এ সব ক্ষেত্রে পীর হয় পীরের ছেলে (বা ছোট ভাই) এবং পীরের বংশ সৃষ্টি হয়। তবে এ সব মাযারে সরকার প্রদত্ত কোন সম্পত্তি নেই। এলাকার ব্যক্তি বিশেষের দানকৃত সম্পত্তি বা মুরীদানদের নজরানা, ভেট প্রভৃতির আয় দ্বারা খরিদকৃত সম্পত্তিই এ সব মাযারের সম্পত্তি। মুরীদগণের থেকে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারাই এ সব মাযার কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে।

হিন্দুদের দেবমন্দির বা দেবালয়ের পুরোহিত আর মুসলিমদের মাযারের পীর-খাদেমদের চরিত্র একই প্রকৃতির। উভয়ই শোষক ও প্রতারক। সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ (অথচ ধর্মে অজ্ঞ) মানুষকে ঠকানোই এদের লক্ষ্য। পুরোহিত বা সন্ন্যাসীবাবা নেমেছেন কাদা-মাটি আর খড়-কুটোর তৈরি কল্পিত প্রতিমা নিয়ে আর পীর-খাদেমরা নেমেছেন মৃত পীর-ফকীর-ওলী-আওলিয়া ইত্যাদি নিয়ে। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা মক্কেল আকৃষ্ট করার জন্য অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর ভক্ত সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তাদের গুণকীর্তন করে থাকে। তাদের ওপর নানা অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করে থাকে। তারা এক এক দেব-দেবীর এক এক রকম অলৌকিক ক্ষমতার কিচ্ছা-কাহিনী বলে বেড়ায়। মাঝে-মধ্যে কিছু উদ্ভট প্রচারও করে থাকে। একইভাবে মুসলিমদের মাযারের পীর-খাদেমরাও নানা অপপ্রচার করে থাকে। মুসলিমদের মৃত পীরেরা মৃত হলেও তারা অদৃশ্যে থেকে মানুষের তথা মুরীদের উপকার করতে পারে, জীবিত অবস্থায় তারা নানা অলৌকিক কাজ করেছেন বলে প্রচার করা হয়। মূলত মাযার ব্যবসাকে রমরমা ও জমজমাট করে তোলার জন্য এ দেশে নানা মাযারের নানা পীর-ফকিরকে নিয়ে ভণ্ড-প্রতারকের দল নানা কিস্‌সা-কাহিনীর জন্ম দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে। এটা তো হল ধর্মীয় আবরণে মাযার সৃষ্টি ও মাযার ব্যবসা। এ দেশে রাজনৈতিক মাযারও আছে। অর্থাৎ 'মাযার' এখন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। আজকাল আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানিত ব্যক্তি হতে হয় না। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মারা গেলে তার কবরকে 'মাযার' খেতাব দেয়া হয়। এটা করা হয় রাজনীতি ব্যবসাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য। এ জাতীয় খেয়ালেই এখানে গড়ে উঠেছে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাযার। এ সব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাযারে কেবল সেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই আসা-যাওয়া করে থাকেন। অন্যরা এ সব মাযারে যেতে তেমন একটা আগ্রহী হন না। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, এ সব মাযারে আর্থিক ব্যবসার কোন চিন্তা-চেতনা নেই। এখানে আছে রাজনৈতিক ব্যবসার চিন্তা-ভাবনা। পীর-আওলিয়ার মাযারে যেমন তাদের দোহাই দিয়ে খাদেম-পীরেরা অর্থ হাতিয়ে নেয়, তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাযারে সেই বিশেষ ব্যক্তির দোহাই দিয়ে ভোট আদায়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ভক্ত-সমর্থকদের জন্য এরা হলেন রাজনৈতিক পীর।

www.i-onlinemedia.net

সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য মাযার গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কিছু মাযার সত্যিকার অর্থে কবরের উপরে নির্মিত মাযার, আর বাকিগুলো মিথ্যা মাযার। এখানে বেশকিছু কাল্পনিক মাযার দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো পরিচিত-অপরিচিত নানা নামে গড়ে তোলা হয়েছে। পরিচিত নামের মাযারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বায়েজিদ বোস্তামীর মাযার, বার আওলিয়ার মাযার ইত্যাদি। মাযার নামক এ দুটি প্রতিষ্ঠানে বার আওলিয়া বা বায়েজিদ বোস্তামী কারুরই কোন কবর নেই। এগুলো হল কবরহীন মাযার বা সেসব ব্যক্তিবর্গের নামে এবং স্মরণে গড়ে তোলা হয়েছে।

আবার এ দেশে বেশকিছু মাযার নানা অপরিচিত নামে গড়ে উঠেছে এবং উঠছে এখনও, ভবিষ্যতেও গড়ে উঠবে। এ সব মাযার যেসব নামে গড়ে তোলা হয় সেসব নামের আগে বা পরে 'শাহ' শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়। অনেক কৃর্তিমান ইসলাম প্রচারক ছিলেন যাঁদের নামের আগে বা পরে 'শাহ' শব্দটি ছিল।[১] এ কারণেই যারা ভুয়া বা কাল্পনিক মাযার গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়, তারা জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং মাযারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কল্পিত নামের আগে বা পরে 'শাহ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে বিভিন্ন নাম তৈরি করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে, গেইট দিয়ে, দান বাক্স বসিয়ে, কবর নামক ভুয়া স্থানটি পাকা করে, ইমারত গড়ে, খাদেমের থাকার ঘর বানিয়ে, মজলিসের জায়গা (খানকাহ) তৈরি করে রীতিমতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। যেখানে কোন কবর ছিল না, জঙ্গল ভরা ছিল, মানুষ গরু-ছাগল চরাত অথবা কোন কারণে উঁচু ভিটা হয়ে গেছে। সাধারণত সে রকম স্থানে মাযার তৈরি হয়। রাস্তার পার্শ্বে যেখানে লোক চলাচল বেশি হয়, বেশিরভাগ সময়ে সেসব স্থানে মাযার গড়ে ওঠে। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ হয়ত দেখা গেল কেউ একজন রাতের আঁধারে লোকচক্ষুর অগোচরে কাউকে ওলি বানিয়ে তার নামে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। এর ব্যবস্থাপক, উদ্ভাবক ও তার অনুচরবৃন্দ এখন নানা স্থানে মানুষের কাছে আজগুবি কাহিনী বলে বেড়াচ্ছে সেই কাল্পনিক ওলি বা পীর সম্পর্কে। আর ধীরে ধীরে সেখানে বাতি দেয়া হতে শুরু করে ওরশ পর্যন্ত হতে থাকে।

এমন একটি ঘটনার কথা শুনুন *(মিথ্যা পীরের সত্য কাহিনী):*

দেখুন! মানুষের বিবেক নিয়ে শয়তান কিভাবে খেলা করে। এমনকি আসমান-যমীনের স্রষ্টার ইবাদত থেকে মানুষের ইবাদত, মৃতের তা'যীম... বরং প্রাণী এবং জড়জন্তুর তা'যীমের দিকে আহ্বান করে।

কখনো একটি মিথ্যা কবর প্রতিষ্ঠা করে তার প্রচার করা হয়। মানুষের কাছে তার কারামতের কথা নানাভাবে উল্লেখ করা হয়। যাতে করে এ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা লাভবান হতে পারে। শেষ পর্যন্ত মানুষ তা বাস্তব মনে করে। অতঃপর শুরু হয় শির্কের খেলা। তাওয়াফ হয়, দু'আ চাওয়া হয়, নযর-মানত হয়... অন্যান্য কবরে যা

[১] ড. মুয্যাম্মিল আলী, *শিরক কী ও কেন,* (এডুকেশন সেন্টার সিলেট), পৃষ্ঠা ২২৯-২৪১।

www.i-onlinemedia.net

হয় এখানেও তাই। চাই উক্ত কবর যার নামে প্রচার করা হয় তা সত্য হোক বা মিথ্যা। জনৈক ব্যক্তি শায়খ বরকতের এ রকমই একটি কিচ্ছা উল্লেখ করেছে। ঘটনাটির সূচনা হয় দু'জন যুবকের দ্বারা।

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আদেল ও সাঈদ। পড়াশোনা শেষ করে একটি গ্রামে তারা স্কুলের শিক্ষকতা কর্মে নিয়োজিত। গ্রামটিতে কবর ও মাযার খুব বেশি। মানুষ ওগুলোর তা'যীম করে, নযর-নিয়ায পেশ করে, উরস করে...।

স্কুলে যেতে হয় বাসে চড়ে। একদিন বাসে চড়ে যাওয়ার সময় আদেল ও সাঈদ পারস্পরিক কথাবার্তায় লিপ্ত। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ বাসে উঠে ভিক্ষা চাইতে লাগল। গায়ে তার হাজার তালি লাগানো পোষাক। তাও ময়লা মাখা। বয়সের ভারে কাঁপছে। দেখে মনে হচ্ছে অর্ধপাগল, মুখের লালা বারবার মুছে ফেলছে হাতের আস্তিনে। গাড়িতে চড়ে সে যাত্রীদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করছে, তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, দাবী করছে তার দু'আ সর্বদা কবূল হয়ে থাকে, সে যদি বদ্‌দু'আ করে তবে বাস উল্টে যেতে পারে...।

সাঈদ এমন পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছে যারা ওলী-আউলিয়া, তথাকথিত পীর-ফকীর, দরবেশ, কুতুব, আবদাল... দ্বারা প্রভাবিত। সে ভীত ও পেরেশান হয়ে সাথী আদেলকে অনুরোধ জানায়, ভাই কিছু দিয়ে দাও। কেননা, এ দরবেশ খুব বরকতময় লোক। সর্বদা তার দু'আ কবূল হয়। হতে পারে বাস্তবিকই তার বদ্‌দু'আয় বাস উল্টে যাবে।

আদেল তার কথায় খুবই আশ্চর্য হল। বলল, হ্যাঁ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা কারামতে বিশ্বাস করে; কিন্তু নেককার ও পরহেযগার লোকদের কারামত। যারা লোক দেখানোর জন্য আমল করে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামানার্থে গোপনে সৎআমল করে। এ সমস্ত ভণ্ড ও ভবঘুরে লোকদের কারামত নয়। যারা নিজেদের দ্বীন বেচে অর্থ উপার্জন করে।

সাঈদ চিৎকার করে উঠল। কি তুমি আজেবাজে কথা বলছ! এই দরবেশের কারামতের কথা ছোট-বড় সব লোকেরই জানা! একটু পরেই দেখবে তিনি এখন বাস থেকে নেমে যাবেন। আর আমরা গ্রামে পৌছার আগেই তিনি হেঁটেই আমাদের আগে পৌছে যাবেন। এটা তাঁর কারামত। তুমি কি ওলীদের কারামতকে অস্বীকার কর?

আদেলঃ আমি কখনই কারামতের অস্বীকার করি না। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করতে পারেন। কিন্তু এটা হতে পারে না যে, এই কারামতের দরজা দিয়ে আমাদের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করবে- আমরা এ সমস্ত মানুষকে, মৃত ওলীদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার মনে করব? সৃষ্টি, নির্দেশ, জগতের পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষমতা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন- এ বিশ্বাস করব? আর তাদেরকে আমরা ভয় করব, তাদের ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব? এটা সম্ভব নয়।

www.i-onlinemedia.net

সাঈদঃ তুমি কি বিশ্বাস করা না যে, শায়খ 'আহমদ আবূ সারুদ' হজ্জে এসে আরাফাতের দিন (তুরস্কের) ইস্তাম্বুল গিয়ে নিজ পরিবারের সাথে খাদ্য খেয়ে আবার আরাফাতে ফিরে এসেছেন?

আদেলঃ সাঈদ! আল্লাহ তোমার বিবেকে বরকত দিন! তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কথাই শিখেছ?

সাঈদঃ মনে হয় আমরা হাঁসি-ঠাট্টা শুরু করেছি।

আদেলঃ আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবান্তর কথা আর তাদের কুসংস্কারের কোন প্রতিবাদ করা যাবে না, এমন তো নয়।

সাঈদঃ কিন্তু এ সমস্ত কারামতের কথা শুধু সাধারণ মানুষের মুখেই শোনা যায় না; বড় বড় আলেম ওলামগাণও এ সমস্ত মাযার ও দরবারের অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করে থাকেন। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে এ সমস্ত বিষয়ে ব্যাপকহারে আলোচনা হয়।

আদেলঃ ঠিক আছে সাঈদ, তোমার কি মত আমি যদি বাস্তবে প্রমাণ করে দিতে পারি যে, এ সমস্ত মাযার ও দরবারের অধিকাংশই মিথ্যা ও কাল্পনিক? এ সব মাযারের অধিকাংশের হাক্বীকত নেই- কবর নেই, লাশ নেই, কোন ওলী নেই। কিছু মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের কারণে মানুষের কাছে তা সত্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এ কথা শুনে সাঈদ ক্রোধে ফুঁসে উঠল এবং বলতে লাগল, নাউযুবিল্লাহ! নাউযুবিল্লাহ! উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকল। বাস তাদেরকে নিয়ে গ্রামে প্রবেশের আগে চৌরাস্তার মোড়ে যখন পৌঁছল তখন আদেল সাঈদকে লক্ষ্য করে বলল, সাঈদ! রাস্তার এ মোড়ে কি কোন ওলীর কবর বা দরবার বা মাযার আছে?

সাঈদঃ না, এটা কোন যুক্তিসংগত কথা হল না কি, একজন ওলীকে চৌরাস্তায় বা রাস্তার মোড়ে দাফন করা হবে?

আদেলঃ তাহলে তোমার কি মত, যদি আমরা গ্রামে প্রচার করে দেই যে, এই চৌরাস্তার জনৈক নেক ব্যক্তির পুরাতন কবর আছে, যার চিহ্ন আজ মিটে গেছে এবং নষ্ট হয়ে গেছে? এরপর আমরা তার কারামতির কিছু ঘটনা, তার কাছে দু'আ কবূল হওয়ার কিছু গল্প মানুষের সামনে পেশ করব। দেখি মানুষ বিশ্বাস করে কি না? আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি মানুষ এ ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে; বরং হতে পারে পরবর্তী বছর তার এখানে একটি বিরাট মাযার বা দরবার প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। এরপর শুরু হবে সেখানে শির্ক। অথচ এখানে শুধু মাটিই মাটি; যদি ওরা যমীনের পাতাল পর্যন্ত খনন করে তো কিছুই পাবে না।

সাঈদঃ কি সব আজেবাজে কথা বলছ? তুমি কি মনে করছ মানুষ এতই বোকা ও নির্বোধ?

আদেলঃ ঠিক আছে, তুমি যদি আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা কর এবং মত দাও তাতে তো তোমার কোন ক্ষতি নেই? নাকি তুমি ফলাফলের ব্যাপারে আশংকা করছ?

সাঈদঃ না, ভয় করি না। তবে বিষয়টিতে আমি তেমন সন্তুষ্ট নই।

আদেলঃ বুঝা গেল তোমার মত আছে। তুমি কি মনে কর যদি আমরা প্রস্তাবিত ওলীর নাম রাখি 'শায়খ বরকত'?

www.i-onlinemedia.net

সাঈদঃ ঠিক আছে, তুমি যা চাও।

এরপর দু'বন্ধু বিষয়টি খুব ধীরে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিল। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথমে চায়ের স্টল সেলুন প্রভৃতি দোকান থেকে শুরু করবে। কেননা, এ সব স্থান থেকেই যেকোন সংবাদ দ্রুত প্রসার হয়। তারা গ্রামে পৌঁছে সলিমের সেলুনে গেল। তার সামনে ওলী-আউলিয়াদের কথা আলোচনা করার পর বলল, জনৈক নেক ওলী অনেক বছর থেকে সমাধিস্থ আছেন। অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা অনেক বেশি; কিন্তু তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার লোকের সংখ্যা খুব কম।

সেলুনের নাপিত জিজ্ঞেস করল, কোথায় সে কবরটি? তারা বলল, গ্রামে প্রবেশের আগে যে চৌরাস্তা রয়েছে তার মোড়ে!

নাপিতঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ। আল্লাহর সব তা'রীফ, তিনি আমাদের গ্রামে একজন ওলী দিয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমি বহুকাল থেকে এ রকম একটা আশা করছিলাম। এটা কি কোন যুক্তিসঙ্গত কথা হতে পারে যে, পার্শ্ববর্তী 'নতুন গ্রামে', 'নারায়নপুর' গ্রামে দশ জনের বেশি ওলী-আওলিয়া আছেন, আর আমাদের গ্রামে একজনও থাকবে না?

আদেলঃ সলিম ভাই! 'শায়খ বরকত' খুব বড় মাপের ওলী ছিলেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর খুব মান-মর্যাদা ছিল।

নাপিত চিৎকার করে উঠে বলল, শায়খ বরকত (ক্বাদ্দাসাল্লাহু) সম্পর্কে আপনি এত কিছু জানেন, তারপরও চুপ রয়েছেন?

এরপর শায়খ বরকতের খবর শুষ্ক ঘাসে আগুন দেয়ার মত গ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মুখে মুখে সে কথা আলোচনা হতে লাগল। এমনকি মানুষ স্বপ্নেও তা দেখতে লাগল।

বিভিন্ন চায়ের দোকানে, মজলিসে, বাজারে, মসজিদে...'শায়খ বরকতের' নানা বরকতের কথা, তার মাথার চুল কত দীর্ঘ ছিল, পাগড়ী কত লম্বা ছিল, অসংখ্য-অগণিত কারামতির কথা- আযানের সময় হওয়ার সাথে সাথে মিনার নীচে নেমে আসত... ইত্যাদি...ইত্যাদি।

স্কুলের শিক্ষকদের মাঝেও বিষয়টি বাদ-প্রতিবাদের সাথে আলোচিত হতে লাগল। যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন শিক্ষক সাঈদ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওহে বিবেকবানের দল! আপানারা ছাড়ুন এ সমস্ত কুসংস্কার ও অমূলক বিশ্বাসের কথা!' শিক্ষকগণ সমস্বরে বলে উঠল, 'কুসংস্কার...তুমি বলতে চাও এখানে শায়খ বরকত নেই?'

সাঈদঃ অবশ্যই নেই। এ ধরনের কোন কবর এখানে নেই। এটি একটি অপপ্রচার। চৌরাস্তার মোড়ে শুধু মাটি আর মাটি। না কোন শায়খ বা ওলী বা দরবার ছিল বা না আদৌ আছে।

www.i-onlinemedia.net

শিক্ষকগণ যেন কেঁপে উঠলেন। একযোগে বললেন, 'কি বল তুমি? 'শায়খ বরকত' সম্পর্কে এমন কথা বলার স্পর্ধা তোমার হল কিভাবে? 'শায়ক বরকতের' বরকতে গ্রামের পশ্চিমের নদীটি ভরাট হয়েছে। তিনি...।'

তাদের চেঁচামেচীতে সাঈদ পেরেশান হয়ে উঠল। তারপরও সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আপনরা নিজের বিবেক বিক্রয় করে দিবেন না। আপনারা শিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ। কোন কবর বা মাযার সম্পর্কে একজন এসে কিছু বলল বা স্বপ্নে শয়তান কিছু দেখাল আর তাই বিশ্বাস করে দিবেন?

এতক্ষণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীরব ছিলেন। তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন। বললেন, 'শায়খ বরকতের গুণাগুণ আছে এবং তা নিশ্চিত। তুমি কি গতকালের পত্রিকা পড়নি?'

সাঈদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পত্রিকাতেও! কি লেখা হয়েছে তাতে?'

প্রধান শিক্ষক পত্রিকা বের করে সকলের সামনে পাঠ করেছেন। পত্রিকার সবচেয়ে বড় শিরনাম হচ্ছে, *'শায়খ বরকতের দরবার আবিস্কার'*। লেখা হয়েছেঃ 'শায়খ বরকত (দামাত বারাকাতুহু) ১১০০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খালেদ বিন ওয়ালীদের (রাঃ) ৩৩তম অধঃস্তন সন্তান। অনেক উলামায়ে কেরামের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন উমুক...উমুক... উমুক...। তিনি তুর্কী সৈন্য বাহিনীর সাথে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। যুদ্ধ যখন ভীষণ আকার ধারণ করে, তিনি খৃষ্টান বাহিনী লক্ষ্য করে একটি ফুঁ মারেন। সাথে সাথে ঘূর্ণিঝড় খৃষ্টান বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ঝড় তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে একশ মিটার দূরে নিক্ষেপ করে। সবাই আর্তচিৎকার করতে করতে রক্তাক্ত অবস্থায় ধূলায় লুটিয়ে পড়ে...।'

সাঈদঃ মাশাআল্লাহ! শায়খ বারকত সম্পর্কে সাংবাদিক সাহেব এত সূক্ষ্ম বিবরণ পেলেন কোথায়?

প্রধান শিক্ষকঃ এগুলো সত্য কথা। তুমি কি মনে কর এ সব কথা তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে? এগুলো ইতিহাস...।

সাঈদঃ কিন্তু এ সব দাবীর পক্ষে দলীল থাকা জরুরী। যেকোন দাবী এলেই তার বিশুদ্ধতা যাচাই করা আপনার উপর আবশ্যক। অন্যথা যে কেউ যা ইচ্ছা দাবী করতে পারে... কবর...ওলী-আউলিয়া, কারামাত...।

তারপর সাঈদ চিৎকার করে বলে উঠল, 'আপনারা আমার সুস্পষ্ট কথা শুনুন, শায়খ বরকত নামের এ দরবার বা মাযার একটি মিথ্যা ও অপপ্রচার মাত্র। আমি এবং স্যার আদেল মিলে এটি উদ্ভাবন করেছি। প্রকৃতপক্ষে এখানে কিছুই নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হল, মানুষের মূর্খতা এবং ভ্রষ্টতা যাচাই করে দেখা। স্যার আদেল আপনাদের সামনে আছেন তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন!'

শিক্ষকগণ আদেলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, এ লোকও তো তোমার মতো বিতর্ক পছন্দ করে। সব বিষয়ে দলীল চায়। সে তো ওলী-আউলিয়ার দুশমন।

তুমি আর আদেল যা-ই বল না কেন, আমরা বিশ্বাস করি শায়খ বরকত (দামাত বারাকাতুহু) যুগ যুগ ধরে এখানে রয়েছেন। দুনিয়ার কোন স্থান ওলী-আউলিয়া,

www.i-onlinemedia.net

পীর-দরবেশ, গাউস-কুতুব থেকে খালি নয়। তোমার বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করি।

সাঈদ ও আদেল নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ক্লাশের বেল বেজে উঠল। সবাই নিজ নিজ শ্রেণী কক্ষে চলে গেলেন।

শিক্ষক সাঈদ যা দেখছেন এবং শুনছেন তাতে অস্থির হয়ে উঠলেন। চিন্তা করছেন শায়খ বরকত... কারামতী... সম্ভব... অসম্ভব? এটা কি সম্ভব এত লোক সবাই ভুলের মধ্যে রয়েছে? পত্রিকার রিপোর্ট মিথ্যা?

আশ্চর্যের বিষয়, এলাকার বুযুর্গ, আলেম-ওলামাগণ তো কিছু দিন আগে চৌরাস্তার মোড়ে শায়খ বরকতের নামে উরস মোবারকও উদ্‌যাপন করলেন? কিন্তু শায়খ বরকত তো শিক্ষক আদেলের পক্ষ থেকে বানোয়াট একটি নাম... কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে, এত লোক সবাই প্রলাপ বকছে? অসম্ভব...আসম্ভব...।

ধীরে ধীরে সাঈদের মগজে নতুন চিন্তা প্রবেশ করতে লাগল। হয়তো শায়খ বরকত আছেনই। ওস্তাদ আদেল হয়তো আগে থেকেই ব্যাপারটা জানতেন। কিন্তু মানুষকে সন্দেহে ফেলার জন্য এখন হয়ত বলছেন, 'আমি নিজে 'শায়খ বরকত' নামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছি।'

সাঈদ স্যার বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তা-গবেষণা করলেন। এ থেকে বের হওয়ার জন্য শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোন কাজ হল না। তার মগজে বিষয়টি যেন ভালবাবেই স্থান পেয়েছে।

পরবর্তী দিন... পরের দিন... বিষয়টি নিয়ে স্কুলে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকল। তখন ছিল শিক্ষা বর্ষের শেষের দিক। বাৎসরিক ছুটি হল। শিক্ষকগণ নিজ নিজ এলাকায় ছুটি কাটাতে চলে গেলেন।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হল। শিক্ষকগণ দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে এসেছেন। আদেল ও সাঈদ আগের মত বাসে চড়ে গ্রামের স্কুলে যাচ্ছেন। আদেল স্যার 'শায়খ বরকতের' বিষয়টি বেমালুম ভুলেই গিয়েছেন। অথচ তিনিই এ ঘটনার জন্মদাতা। কিন্তু বাস যখন গ্রামের প্রবেশ পথে সেই চৌরাস্তায় পৌঁছেছে, তখন আদেল লক্ষ্য করলেন, শিক্ষক সাঈদ যেন গুণগুণ করে কি কি দু'আ যিকির পাঠ করছেন।

ওদিকে স্যার আদেল বিস্ময়ে হা হয়ে গেলেন। তিনি একি দেখছেন? চৌরাস্তার মোড়ে কত সুন্দর মাযার বানানো হয়েছে। মাযারের উপর আকাশচুম্বী বিশাল গম্বুজ ঝলমল করছে। পাশে তুর্কী স্টাইলে বানানো সুবিশাল মসজিদ।

আদেল মুচকি হেঁসে মনে মনে বলল, মানুষ কত নির্বোধ! শয়তান তাদেরকে শিরকে লিপ্ত করার ক্ষেত্রে কতই না কামিয়াব হয়েছে! তিনি স্যার সাঈদকে হাসিতে শরীক করার উদ্দেশ্যে তার দিকে নজর দিলেন, কিন্তু একি তিনি তো দু'আর জগতে ডুবে আছেন...। এক সময় তিনি চিৎকার করে বাস চালককে অনুরোধ করছেন, এখানে একটু থাম। তারপর তিনি দু'হাত উঠিয়ে শায়খ বরকতের রূহের উপর ফাতিহাখানি পাঠ করলেন...।

www.i-onlinemedia.net

মাযারের উৎপত্তি, আবিষ্কার এবং নির্মাণ বাস্তব সূত্র ধরেই হোক আর অবাস্তব সূত্র ধরেই হোক, কল্পিত হোক আর পরিকল্পিত হোক- অজ্ঞ ও বর্বর মুসলিমরা মাযারকে এখন মন্দির বানিয়ে নিয়েছে। মাযার হয়েছে শির্কের ভাগাড়। মাযারকে কেন্দ্র করে কত রকম অনাচার যে শুরু হয়েছে তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাযারকে ঘিরে গোমরাহী আচরণের ব্যাপকতা এত বেশি হয়েছে যে, বলা যায়, মাযার হল অনাচারের কারখানা। দিন-দিন সেখানে নতুন নতুন অনাচার দেখা দিচ্ছে। এ দেশের নানা স্থানে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় মাযার এখানে-সেখানে গড়ে উঠছে। মাযারের নামের যা ঢং তাতে হাসির উদ্রেক হয়। কোথাও আছে 'বুতা শাহ'র মাযার, কোথাও 'ল্যাংটার মাযার', কোথাও 'বোবা দরবেশের মাযার', কোথাও 'মামুর মাযার' কোথাও 'পাগলা বাবার মাযার', কোথাও 'ডাল-চান মিয়ার মাযার', কোথাও 'ভেন ভেনিয়া শাহ, 'বালু শাহ', 'নিদান শাহ', 'পান্থি শাহ', 'ভান্ডারী শাহ' ইত্যাদি শাহের মাযার- এ রকম নানা অদ্ভুত নামের মাযার এ দেশে দেখা যায়। এই যে বোবা, বুতা, ল্যাংটা, পাগলা ইত্যাদি নামের মাযার দেখা যায়। অনেক জায়গায় মৃত জানোয়ারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শাহ শব্দযুক্ত মাযারও দেখা যায়, যেমন ভেড়ার কবরকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরে গড়ে উঠেছে 'ভেড়া শাহ'-এর মাযার!!! এরা কিন্তু সবাই রোগী। পীর-খাদেম নয়। যে রোগ হলে গ্রামের মানুষ বলে মেয়েটাকে ভূতে ধরেছে বা জ্বীনে আছর করেছে, এদেরও সে জাতীয় রোগ। ভাগ্য ভাল যে, এরা পুরুষ হবার কারণে কেউ বলে না যে, এদের ভূতে ধরেছে। পুরুষদেরকে ভূতে ধরলে কেউ পাগলা হয়, কেউ বোবা হয়, কেউ বুতা হয়, কেউ হয় ল্যাংটা। আর সাধারণ মূর্খ মানুষেরা এদের ফকির নাম দেয়, এদের অস্বাভাবিক আচরণকেও স্বাভাবিক মনে করে। হয়ত, পুরুষ বলেই এরা পার পেয়ে যায়। পুরুষ কবিরাজরা ওদের চিকিৎসা করতে এগিয়ে আসে না। পুরুষ শাসিত সমাজ বলেই ভূতে কেবল মেয়েদের ধরে (!?)। আর সেই ভূতেই যখন পুরুষদের ধরে তখন তারা ফকির, দরবেশ, পীর ইত্যাদি খেতাব পায়। অথচ এ সব আউল-বাউল-ফকিরদের মধ্যে ইসলামের নামগন্ধ বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। এরা রোগী। এরা অসুস্থ। যার মধ্যে ইসলাম নেই, সে তো আর যাই হোক আল্লাহ্‌র ওলি-আওলিয়া হতে পারে না। যারা আর কিছু করে যেতে পারে না, তারা মাযার ব্যবসায় নামে এ সকল ভূতে ধরা রোগীদের নিয়ে। এরা হল দৈহিক পঙ্গু এবং সামাজিক পঙ্গু। মানসিক বৈকল্য বা মানসিক বিকলাঙ্গতা দেখা দিলেই ফন্দিবাজরা এদেরকে ফকির নাম দিয়ে এদের জন্য আস্তানা, মাযার ইত্যাদি তৈরি করে আর ব্যবসা জমায়। অনায়াসে ধনী হওয়ার ফন্দি আঁটে। এ সব মাযারের এমন কিছু কাল্পনিক ইতিহাস ও ব্যতিক্রম ব্যবস্থাপনা থাকে যাতে মানুষ সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মাযারকেন্দ্রীক রমরমা ব্যবসা জমে ওঠে।

www.i-onlinemedia.net

মানুষ যায় করতে কবর পূজা সেখান থেকে জাহান্নাম খুব সোজা

সমাধিস্থকরণের সময়ে ও তৎপরবর্তীকালে মৃতকে সম্মান দেখাতে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ভক্তিমূলক ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদন ও ক্ববরকে বিশেষভাবে শোভিতকরণের মাধ্যমে সজ্জিত সমাধি নির্মাণের কারণে মানবীয় ইতিহাসের অধিকাংশ সময় সত্য ধর্মে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটেছে। এর ফলস্বরূপ, মানবজাতির বেশিরভাগই কোন না কোন ধরনের ক্ববর পূজার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। পুরো মানবজাতির প্রায় এক চতুর্থাংশের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে চীনদেশবাসী; আর এদের অধিকাংশের ধর্ম মূলত দেবতাজ্ঞানে পূর্বপুরুষদের পূজা করার ধর্ম। তাদের বেশিরভাগ ধর্মানুষ্ঠান ক্ববরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধিত্বমূলক।[১] হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের পুণ্যবান ব্যক্তিদের ক্ববরসমূহ পবিত্র স্থান (মন্দির বা গীর্জা ইত্যাদি) হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর এ স্থানগুলোতে উপাসনাস্বরূপ ব্যাপকভাবে প্রার্থনা, বলিদান (দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তু বা প্রাণী), তীর্থযাত্রা ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় মুসলমান শাসক শ্রেণী ও জনগণ ইসলামের মূল বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি লাভ করে। ফলে অমুসলিমদের পৌত্তলিক (শিরকী) প্রথা ও চর্চাসমূহ এ সব নাম সর্বস্ব মুসলিম কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। 'আলীর (রাঃ)-মতো সাহাবী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আশ-শাফী' (রাহি.)-এর মতো প্রধান ফক্বীহগণ এবং সুফী হিসেবে খ্যাত জুনাইদ বাগদাদী ও 'আব্দুল ক্বাদির জীলানীর মতো *'ওলী'*দের কবরের উপর বিশাল আকারের সৌধ (গম্বুজ) নির্মাণ করা হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা *মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ* এবং সুদানের তথাকথিত মাহ্দীর কবরের উপরও অতি সাম্প্রতিক প্রথাগত সেই সমাধি নির্মিত হয়েছে। এ সকল সৌধের চারদিকে তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে অনেক অজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণ বহুদূর থেকে আগমন করে থাকে। এমনকি অনেকেই এ সমাধি তথা মাযারগুলোর ভিতরে বা বাইরে অবস্থান করে মৃতের নিকটে প্রার্থনা নিবেদন

---

[১] চীনদেশীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যবাহী সমাজে দেবতাজ্ঞানে পূর্বপুরুষদের *(Pai Tsu)* প্রতি পরম ভক্তি জ্ঞাপন করা একটি অতি প্রাচীন, অটল ও প্রভাবক্ষম তত্ত্ব। তাদের বিশ্বাস অনুসারে, মৃত ব্যক্তির *Hun* (পবিত্র আত্মা) এবং *P'o* (অপবিত্র বা মন্দ আত্মা) সাধারণত নিজের অস্তিত্ব ও সুখের জন্য তাদের বংশধর কর্তৃক প্রেরিত আধ্যাত্মিক অর্থ-সম্পদ, ধূপধুনোর সুবাস, খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীর দানের উপর নির্ভরশীল। ফলে যদি কেউ এ সকল বস্তুকে মৃতের প্রতি উৎসর্গ করে তবে এর প্রতিদান হিসেবে *Hun* (পবিত্র আত্মা) অলৌকিকভাবে সেই ব্যক্তির পরিবারের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম। তবে সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কটি কেবল তিন থেকে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত টিকে থাকে বলে ধারণা করা হয়। তারপর আত্মাসমূহ অতিসাম্প্রতিক আত্মার মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। *(Dictionary of Religions, পৃ. ৩৮)*

www.i-onlinemedia.net

করে। তাছাড়া, এ সব জায়গায় কেউ কেউ পশু-পাখি নিয়ে এসে ধর্মীয় বা মৃতের উদ্দেশ্যে তথা সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে জবেহ্ করে। কবরে প্রার্থনাকারীর অধিকাংশই এ মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে যে, সৎকর্মপরায়ণ মৃত ব্যক্তিরা যেহেতু আল্লাহ্র অতি নিকটবর্তী তাই অন্যান্য জায়গায় 'ইবাদাত করার চাইতে তাঁদের নিকটে বা আশেপাশে অবস্থান করে ইবাদাতের কর্ম সম্পাদন করলে তার গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এছাড়া, এ সকল বিশেষ মৃতব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা শান্তি অবতীর্ণ হওয়ায় এদের আশেপাশের সব কিছু নিশ্চয়ই শান্তি লাভে ধন্য হয় বলেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়। এমনকি যে জমির উপর ঐ সমাধি বা মাযার নির্মিত হয়েছে তাতে আল্লাহ্র করুণাধারা প্রবাহিত হয়। এ সকল বিশ্বাসের জের ধরেই ক্ববর ও মাযার পূজারীরা কিছু অতিরিক্ত শান্তি বা করুণা লাভের আশায় ক্ববর ও মাযারের দেয়ালে হাত মুছে তা নিজের শরীরের উপর বুলায়। ক্ববরবাসীর উপর বর্ষীয়মান শান্তি ও করুণার কারণে এর আশেপাশের স্থানও প্রভাবিত এবং এ স্থানের মাটিতে রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা রয়েছে- এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভর করে ক্ববর পূজারীরা প্রায়ই তাদের নির্দিষ্ট কবরের চারপার্শ্বের মাটি সংগ্রহ করে। ইমাম হুসাইন কারবালা প্রান্তরে যেখানে শহীদ হন সেখানকার কাদা মাটি শিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ কয়েকটি শাখার অধিকাংশই সংগ্রহ করে। তারপর মাটিকে আগুনে সেঁকে ছোট ছোট পাতখণ্ড তৈরি করে এবং সলাতের সময় তার উপর সিজদা করে।

মাযার ব্যবসা তথাকথিত আল্লাহ্র ওলিদের নিয়ে জমে ভাল। এ দেশের মানুষেরা নিজ ঘরের পাশে, পুকুর পাড়ে বা নিত্য আসা-যাওয়ার পথের ধারে যে কবর পড়ে আছে তাতে হয়ত শুয়ে আছেন মাতা, পিতা, চাচা, চাচী, ভাই, বোন, দাদা, দাদী, নানা, নানী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশী কেউ; কিন্তু তাদের কবর যিয়ারত করায় মানুষের আগ্রহ নেই। অথচ যিয়ারত পাবার হক এদেরই সবচেয়ে বেশি। আর তারাই কিনা দৌড় দেয় কোন অজানা-অচেনা মাযার যিয়ারতের নিয়াত-মানত করে। এ আচরণ তো একজন মুসলিমের নয়। নিয়াত করে কোন মাযারে যাওয়া তথা মাযারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বৈধ নয়। অথচ এ দেশের মূর্খ-বর্বর মানুষেরা পালে পালে শত-সহস্র মানুষ লঞ্চে-বাসে-মটরে-ট্রাকে-পদব্রজে গিয়ে সারা বৎসর ধরে বা বৎসরের একটা বিশেষ দিনে বিশেষকরে উরসের সময়ে বা মাহফিলের সময়ে মাযার যিয়ারত করে, যা জঘন্যতম কাজ এবং তাওহীদ বিরোধী ও জঘন্যতম পাপ।

এ দেশের মানুষ মাযারে গিয়ে পীরের আশ্রয় নেয়। ভক্তরা গান ধরে, 'খাজারে তোর দরবার হতে, কেউ ফেরে না খালি হাতে।' কোন কোন ভক্ত বলে, 'দয়াল বাবা...'। কোন ভক্ত হয়ত বলছে, 'দোহাই বদর বাবা'। আবার কেউ হয়ত গাঁজা খেতে খেতেও বলছে, 'দোহাই ল্যাংটার'। মাযারে যারা যায় তাদের মনে অজস্র

www.i-onlinemedia.net

কামনা-বাসনা থাকে। তাদের কেউ মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, কেউ পুত্র সন্তান চায়, কেউ কন্যা সন্তান চায়, কেউ কেবল সন্তান প্রার্থনা করে বাবার কাছে, কেউ কেউ স্বামী-স্ত্রীর মিল মহব্বত প্রার্থনা করে, কেউ বিয়ের প্রার্থনা করে, কেউ বর চায়, কেউ কনে চায়। কেউ বাবার কাছে রোগমুক্তি চায়, কেউ চাকরি চায়, কেউ মোকদ্দমায় জিততে চায়, কেউ ব্যবসায় উন্নতি চায়, কেউ বিদেশ যেতে চায়, কেউ নির্বাচনে জিতে মেম্বার-চেয়ারম্যান-এমপি-মিনিস্টার-প্রাইম মিনিস্টার হতে চায়। এভাবে নানাজনে ভক্তিভরে দারুণ আকুতি নিয়ে পীর-আওলিয়ার দরবারে নানা কিছু প্রার্থনা করে। আর এভাবেই তারা পীর-ফকীর-দরবেশের মধ্যে স্রষ্টার গুণাবলী আরোপ করে থাকে।

মাযার শরীফ জিন্দাবাদ!! মাযার ব্যবসা চিরজীবী হউক!!!

- মুরীদগণ যে শুধু মাযারে গিয়ে মনের কামনা-বাসনার কথা পীরবাবাদের কাছে পেশ করে তাই নয়, বরং তারা নিজ নিজ বাড়িতে বসে বা অন্যত্র থেকেও বিপদমুক্তি বা অন্যান্য মাকসূদের কথা পীরকে আহ্বান করে বলে। কারণ, তাদের ধারণা পীর অবশ্যই এ সব আবেদন শুনতে পায়। মৃত পীর-ওলী-আওলিয়ার কাছেও বলে আবার জীবিত পীর-ওলী-আওলিয়ার কাছেও বলে। দূর থেকে সাহায্য চাওয়ার পেছনে যে যুক্তিগুলো কাজ করে তার মধ্যে অ্যতম হল এ ধারণা যে, 'পীর-ওলী-আওলিয়াগণের 'পাক রূহ' (!?) সকল স্থানে সদাই হাজির-নাজির, তারা গায়েব জানে।'- এ ধারণাও তাদেরকে এ পথে পরিচালিত করে। আল্লাহকে ছাড়া 'পীর-বুযুর্গ-ওলী-আওলিয়াগণের সাহায্য চাওয়ার রীতিও বিজাতি থেকে ধার করা। প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুদের নানা দেব-দেবী রয়েছে। কেউ প্রেমের দেবতা, কেউ বিদ্যার দেবতা, কেউ ধনের দেবতা, কেউ শক্তির দেবতা ইত্যাদি নানা দেবতা তাদের আছে। তারা ধন-সম্পদ, প্রেম, আশীর্বাদ প্রভৃতির জন্য এ সব দেব-দেবীর আশ্রয় নিয়ে তাদের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। বিজাতীদের দেখাদেখি মুসলিমগণও নানরকম পীরের কাছে নানা কিছু অথবা একই পীরের কাছে অনেক কিছুই চেয়ে থাকে।

- **মাযারে নেশা করা হয়:** যারা নেশাখোর তারা আড়ালে আবডালে গোপনে নেশা করে। আমাদের সামাজিক জীবনে আমরা এটাই প্রায়ই দেখি। এখন মাযারে কেন সেটা হয়?

  প্রথমত, মাযার সাধারণত লোকে লোকারণ্য থাকে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, মাযার বা কবর সাধারণত জনসমাগমমুক্ত স্থান হতে একটু নিরিবিলি আলাদা জায়গায় হয়। আর মাযারে নেশা করলেও সেটা মূল মাযারে হয় না, সেটা হয় মূল মাযারের ভীড় থেকে কিছুটা আড়ালে। এটা গোপন হলেও প্রকাশ পেয়ে যায়।

www.i-onlinemedia.net

দ্বিতীয়ত, মাযারে ভণ্ড ও বর্বর লোকদের আনাগোনা বেশি হয় বলেই সেখানে নেশার আসর জমে।

গাঁজা সেবন বা গাঁজার আসর আমাদের মাযার সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অংগ। বাংলাদেশে আজকাল এমন মাযার কমই আছে যেখানে গাঁজাখোর লোকেরা ভীড় জমায় না। কথায় বলে, 'যেখানেই আছে পীরের বাস, সেখানেই আছে মাযার খাস।' এবং 'না থাকলে গাঁজার আসর, সে আবার কিসের মাযার।' যারা গাঁজা সেবন করে তারা ধ্যানের জগতে, মারিফাততত্ত্ব বা অধ্যাত্মিকতার স্তরে এবং দেহতত্ত্ব বা শরীরতত্ত্বের অন্দরে-আলিন্দে বিচরণের জন্যই গাঁজা খায়। এ গাঁজা খাওয়ার দলে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভূক্ত। বাইরের জগতে গাঁজা সেবন একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু মাযারে মানুষ গাঁজা খায় হাজারে হাজারে, এতে একবারও অপরাধ হয় না। কেউ এদের বাধা দেয় না। গাঁজাখোর মানুষেরা দু'দলে বিভক্ত। একদল মাযারের সাথে জড়িত। এরা পীরের আশেকান খাদেম এবং ফকির। আরেকদল আছে, যারা মাযারের খাদেম বা ফকির নয়। তবে এরা গাঁজাখোর। নিশ্চিন্তে গাঁজা সেবনের জন্য এরা মাযারে এসে জড়ো হয়। এদের কেউ আলাদা থাকে, কেউ ফকিরদের দলে ভিড়ে যায়। এরা বেশিরভাগই চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-মাস্তান অন্যেরা স্রেফ নেশাখোর।

এ গাঁজা বা মাদকদ্রব্য সেবনের রীতিটি হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে। সেই অতীত থেকে হিন্দুরা তাদের পূজায় বা যজ্ঞে সোমরস নামক এক প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করত। পূজা মন্দিরের এ আচরণটিই মুসলিমদের মাযারে, উরসে প্রবেশ করেছে।

- **মাযারে ফকিরেরা ভীড় করেঃ** এ কালে মাযারে যে সমস্ত আউল-বাউল-ফকির দেখা যায় এরা আসলে পাগল। এদের মধ্যে একদল অসুস্থ এবং অন্যদল অসুস্থতার ভান করছে। ভণ্ড পাগলের সংখ্যাই বেশি। অসুস্থ পাগল দু'চারটা। অসুস্থ পাগল হচ্ছে সেগুলো যেগুলো ল্যাংটা হয়ে ভাষাহীন হয়ে, উদ্ভ্রান্ত হয়ে বোকা-হাবা হয়ে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। এদের কোন তাল থাকে না। আর যারা ভণ্ড বা স্বেচ্ছায় পাগলের অভিনয় করে, তারা মাযারে গিয়ে আড্ডা পাড়ে। বলা হয়, এ উপমহাদেশের আগের কালের ফকির-দরবেশরা দু'খণ্ড লাল বা নীল কাপড় পড়তেন। মাযারে যেসব ভণ্ড বা পাগল ফকির নামে পরিচিতি পেয়েছে ওদের দেহেও লাল কাপড় থাকে। আসল কথা হচ্ছে, মাযারের ফকিরেরা আল্লাহ্‌র পথের পথিক নয়, বরং এরা সবচেয়ে বড় শয়তানের একনিষ্ঠ অনুসারী। তারা শতচ্ছিন্ন ও অজস্র তালিযুক্ত রঙবেরঙের অদ্ভুত পোশাক পরে। এদের জঁটা চুল থাকে, বিভিন্ন ধরনের লাঠি থাকে, গায়ে শিকল জড়ানো থাকে। তাদের মাথার চুল এবং দেহের পোশাক দারুণ অপরিষ্কার। এরা প্রায় সময়ই নাপাক থাকে। গোঁফ বলতে গেলে কখনই ছাঁটে না। গলায় তাসবীহ দানা জাতীয় এক প্রকার মালা

www.i-onlinemedia.net

ঝুলানো থাকে। কাঁধে থাকে একটা ভিক্ষার ঝুলি, মাথায় থাকে অদ্ভুত টুপি, তবে সকলের মাথায় টুপি থাকে না। মাযার এদের আবাসস্থল এবং জীবিকার উৎস। মাযারের এ সব ফকিরেরা গাঁজাখোর। গাঁজা খেতে খেতে জিকির করে, মরমী গান গায়। এগুলো শয়ত্বানের গান, লোকভুলানো গান। নেশার গান, নেশার জিকির। এরা ফকির-ফকিরণী অর্থাৎ বেগানা নারী ও পুরুষ একত্রেই উঠাবসা করে। এদের মেলামেশায় কোন পর্দা নেই। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন নোংরা, দেহও তেমনি নোংরা। নৃত্য-গীত আর গাঁজা সেবনই এ সব ভণ্ড ফকিরের প্রধান ধর্ম-কর্ম। এদের নাচ শিল্পকলায় সুষমামণ্ডিত নয়। তারা যে লোকনৃত্য করে তাও নয়। এদের নাচ হল 'ফকিরা নাচ'। ঝাঁকড়া চুলের মাথা দোলানো লাল কাপড় পেঁচানো কোমর দোলানো গুংগুর বাঁধা পা মাটিতে ঘা মারা, হাতের ডুগডুগি খঞ্জুর ইত্যাদি বাজানো আর লোকগান, ভক্তিমূলক গান, গাঁজার গান প্রভৃতিই এদের নৃত্য-গীতের উপকরণ কৌশল। এরা মাযারে যেমন নাচের-গানের আসর বসায়, তেমনি নৌকায়, বাসে, ট্রাকে, রেলের ছাদে আসা-যাওয়ার পথে নৃত্য-গীত করে।

এ সব ভণ্ড ফকিরেরা মাযারের গমনাগমন পথের পাশে, গেইটের আশে-পাশে আসন করে বসে মক্কেল ধরার জন্য। দু'পয়সা কামাই করাই হল একমাত্র উদ্দেশ্য। নানা কৌশলে জিকির করে, হাতে তাসবীহ রাখে এবং তামা-পিতল-কাঁসা এসবে বাঁধানো লাঠিও রাখে। এক টুকরা কাপড় বিছিয়ে আসন করে। সে কাপড়ে ভক্তদের দেয়া পয়সা থাকে। অনেকেই আবার কুরআন পাঠ করার অভিনয় করে। মহিলা ফকিরদের অবস্থাও একই।

এদের কাছে ভক্তরা নানা মাকসূদ নিয়ে আসে, কারণ, তারা মনে করে যে, বাবার মধ্যে কিছু আছে, সাধনা কইরা কিছু পাইছে ইত্যাদি। এ জাতীয় ধারণার কারণেই যার যাকে পছন্দ হয়, সে তার কাছে গিয়ে কিছু দান-খয়রাত করে বাবার পায়ের ওপর পড়ে যায়। বাবার মায়া হয়। বাবা পিঠ চাপড়ে বলে, কিরে কি চাস? তখন ভক্ত তার মনের কথা বাবাকে বলে। বাবা কিছু ঝাড়-ফুঁক করে মুখে বিড় বিড় করে কিছু উচ্চারণ করে বলে, 'নে, ওঠ, বাড়ি যা- সব পাবি।' ভক্ত খুশী হয়ে চলে যায়। ফকির মায়েরাও তাই করে। ভক্তের কাছে কেউ মা আর কেউ বাবা। আর ফকির-ফকিরণীরাও মা-বাবার মতোই ফ্রী হয়ে যায়। এদের মধ্যে চলে মারফতী প্রেম, আধ্যাত্মিক ভাব আর গাঁজার নেশা জড়িত মাখামাখি।

- **মাযারে মেলা জমেঃ** সব মাযারেই বাৎসরিক উরসের নির্ধারিত তারিখ থাকে। আবার, আমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করেও উরস হয়ে থাকে। মাযার ছোট ও বড় হওয়ার ভিত্তিতে দিবসের সংখ্যাও কম-বেশি হয়। ছোট ছোট মাযারগুলোতে দিন ব্যাপী উরস হয়। একটু বড়

www.i-onlinemedia.net

মাযারগুলোতে দু'দিন-তিন দিন ব্যাপী উরস হয়। আর বড় মাযারগুলোতে সপ্তাহ এমনকি পক্ষকালব্যাপী জমকালো উরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ সময় মাযারে ও পীরের দরবারে বিজলী বাতি, গেট, চকমকি কাগজ ইত্যাদি দিয়ে প্যান্ডেল, স্টেজ সাজানো হয়। বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে জিকির করে, কাওয়ালী-সামা শোনে। ভণ্ড পীর, ফকীররা এ সব ওরশে ওয়াজ নসীহতের নামে শরী'য়াত বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তবারুক রান্না করা হয়। এ উরসের দিনগুলোতে সংঘঠিত অশ্লীলতা গোটা বৎসরের তামাম অশ্লীলতাকে ছাপিয়ে যায়। মাযারপূজারীদের বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে খড়-কুটোর ন্যায় ভেসে যায় আল্লাহ্ ভীতি ও শরয়ী বিধি-বিধান। মাযারগুলো পরিণত হয় মন্দিরে। হিন্দুদের তীর্থযাত্রার অনুসরণে মাযার যাত্রায় অংশগ্রহণ করে অসংখ্য মানুষ। যেমন হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে জমে মেলা, তেমনি মাযারে উরস উপলক্ষে মেলা বসে। মাযারকেন্দ্রিক উরস বা মেলার দিনগুলোতে সেখানে নানা শ্রেণীর প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। ভক্ত, গায়ক, সাধক, দোকানদার, বাজিকর, জুয়ারী, বাইজী, গাঁজাখোর ও ভবঘুরে। মেলায় হরেক রকম অপকর্ম হয়। সব মিলিয়ে এ সময় মাযারগুলো পরিণত হয় পাপের স্বর্গরাজ্য। উরস নামের অন্তরালে দেদারসে চলে শির্ক-কুফরী থেকে শুরু করে জঘন্য পাপাচার। গাঁজা সেবন, জুয়া, পুতুল নাচ, হিজড়া নাচ, যাত্রা-সার্কাস ইত্যাদি মেলার আনুষঙ্গিক উপসর্গ। মেলায় নানা কিছুর সমাহার ঘটে। আসবাবপত্র, ঘরকন্যার জিনিসপত্র, নানান খাদ্যদ্রব্য, মিষ্টান্ন, পোশাক-আশাক, খেলনা, গাঁজার কল্কি, পুরিয়া, সিগারেট পাতা প্রভৃতি উপকরণ। এ ছাড়া মেলায় রয়েছে নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা। সব তো সেখানে মারফতী লোক, আধ্যাত্মিক চেতনায় আচ্ছন্ন, বাবার আশেকান মাযার সমঝদার ও ভাবের কারবারী! উরসের পরে যে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা পীর সাহেব ও তার খাদেমদের পকেটে চলে যায়। উরস মূলত আনন্দোৎসব ও টাকা উপার্জনের পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- **মাযারীরা অভিশপ্ত!** কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করার মাধ্যমে নির্মাণকারীদের ওপর আল্লাহ্র লা'নত নাজিলের সূত্রপাত ঘটে।[১] তারপর যদি কবরের উপর মাযার স্থাপন করে সেখানে পূজা-অর্চনা করা হয়, তাহলে সেসব পূজারীদের কী হবে? এ হিসেবে বলা যায়, এখনকার সময়ে অধিকাংশ মুসলিম অভিশপ্ত। তাছাড়া, মিথ্যা কবর, দরগাহ প্রভৃতি যিয়ারত করা মূর্তিপূজার সমতুল্য।

[১] *বুখারী*, ১ম খণ্ড, ২৫৫ পৃ., হাদীস নং ৪২৭; *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃ., হাদীস নং ১০৮২; আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, ২য় খণ্ড,৯১৭ পৃ., হাদীস নং ৩২২১ এবং আদ-দারিমি ।

www.i-onlinemedia.net

•চাকরির বেতন/গাছের ফল/তরকারি ইত্যাদি মাযারে বিতরণঃ এ দেশে কিছু মুসলিম রয়েছে যারা ক্ষেতের প্রথম তরকারী বা বাগানের প্রথম ফল বা চাকরির প্রথম মাসের বেতন অথবা সবচেয়ে বড় ফলটা নিয়াত করে মাযারে দান করে দেয়। তারা গাছ লাগিয়েই নিয়াত করে রাখে যে, অমুক গাছের প্রথম ফলটা বা অমুক ক্ষেতের প্রথম তরকারিটা অমুক মাযারে দিবে। এতে তারা সওয়াব যেমন প্রত্যাশা করে, তেমনি মনের মাকসূদ পূরণের আশাও রাখে এবং তারা এটা ধারণা করে যে, এভাবে দান করলে বাবার দু'আয় ফল বা তরকারীর উৎপাদন বেশি হবে এবং পশুপাখী ও মানুষের অনিষ্ট থেকে হিফাযাতে থাকবে। তাদের এ সব বিশ্বাস অর্থহীন। ভণ্ড পীরদের কিছু ভণ্ড সাগরেদ অছে যারা জনগণকে এ সব বিষয়ে উৎসাহিত করে। তারা বলে দেয়, 'তোর গাছের প্রথম ফলটা মাযারে দিয়া যাবি, বাবা খুশী হইব। তোর ফলও বেশি হইব।' অথবা বলে, 'তোর গাভীর প্রথম বিয়ানের দুধটা মাযারে দিবি, হুজুরের দু'আর বরকতে অনেক দুধ পাবি।' এভাবে তারা হাঁস-মুরগির ডিমও নিয়ে আসে মুরীদের বাড়ি থেকে। গৃহস্থের প্রথম দুধ, প্রথম ফল, প্রথম আণ্ডা (ডিম), প্রথম তরকারী তার পরিবারের সদস্যদেরও খেতে মন চায়। তাই এভাবে মাযারে দান করলে তা পরিবারের সদস্যদের মনবেদনার কারণ হয়। মাযারের উদরের তো সীমা-পরিসীমা নেই। 'যত পাই, তত খাই'- এটাই মূলনীতি। এ জাতীয় দান-খয়রাত সম্পূর্ণ বিজাতীয় অনুকরণ। প্রথম জাত পশু বা অন্যান্য কিছু যাজক বা গীর্জাকে দেয়ার নিয়ম খ্রিষ্টধর্মে আছে।[১] অর্থাৎ প্রথম জাত পশু অপবিত্র। এটা পবিত্র করতে পারে একমাত্র গীর্জা বা তার যাজক। কাজেই তাকে সেটা দিয়ে দিতে হবে। অন্যেরা ভোগ করলে তা হবে অপবিত্র ভোগ। মুসলিমদের মাযার বা মাযারের পীরেরা কিন্তু এ সব কথা বলে না। তারা বলে বরকতের কথা, সওয়াবের কথা, খুশীর কথা ইত্যাদি।

• পীর-আওলিয়ার মাযার এখন নাচে-গানে গুলজারঃ গাঁজাখোর ফকির খাদেম ছাড়াও একদল নর-নারী আছে যারা মাযারে বাদ্যযন্ত্রযোগে আল্লাহ ও রাসূল এবং মুর্শীদ ও পীরবাবার নামে লোকগীতি, আধ্যাত্মিক ও মারফতী গান বা মরমী সংগীত করে থাকে। এদের হাতে থাকে হারমোনিয়াম, ঢাল, বাঁশি, তবলা, ডুগডুগি, দোতরা, খঞ্জর ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। এরা সবাই ভাবের ও ভবের পাগল। পীর-মুর্শীদের আশির্বাদ লাভের জন্যই তাদের এ গান। গানের তালে তালে তারা নাচেও। আরেকদল নির্বোধ মুসলিম তাতে সান্তনা খুঁজে নেয় এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের গুণকীর্তন হচ্ছে, অতএব চলতে থাকুক। এ সব বেওকুবেরা শয়তানের পাপবাদ্য ও সুর কান পেতে শুনে। হিন্দুরা বাদ্য-বাজনাযোগে ভগবান ও দেব-দেবীর বন্দনা করে থাকে। অজ্ঞ মুসলিমরা সেই

[১] ২৭:২৬ লেবীয় পুস্তক, বাইবেল।

www.i-onlinemedia.net

কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথার অনুসরণ করে পীর-মুর্শীদ, আল্লাহ ও রাসূলের গুণকীর্তন করছে।

- মুসলিমগণ পীর-আওলিয়ার নামে পশু দান করে তার মাযারে নিয়ে যায় এবং পীরের উরসে সেগুলো জবাই করে মহা ধুমধামের সাথে ভক্ষণ করে। পীর-মুর্শীদ-আওলিয়ার নামে মান্নত করাটাই শির্কী ও সম্পূর্ণ হারাম। আর এ হারামের পশু মাযারের উরসে জবাই করে খাওয়াও হারাম। এ শির্কী ও হারাম কাজটি মুসলিমরা হিন্দুদের কাছ থেকে শিখেছে। হিন্দুরা মা কালীর মন্দিরে পূজার সময় পাঁঠা বলি দেয়। ওগুলো সব মান্নতের পাঁঠা এবং তারা সেগুলো ভক্ষণ করে। হিন্দুদের এ কর্মের দেখাদেখি মুসলিমরা মাযারে উরসের সময় গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা ইত্যাদি জবাই করছে। কেউ মা কালী-দেবীর পূজায় আর কেউ পীর-মুর্শীদের উরসে। কারও বলি আর কারও জবাই। কেউ দেবী খুশী করে আর কেউ পীর খুশী করে। কেউ বলি দেয় মন্দিরে আর কেউ জবাই করে মাযারে। উদ্দেশ্য ও ধ্যান-ধারণা উভয় পক্ষেরই এক।

  মুসলিমগণ পীর বা ওলীর নামে পশু উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়। এ সব পশু জনগণ খেয়ে ফেলে অথবা শেষতক তা মাযারে নিয়ে যাওয়া হয়। লোকে নানা নিয়তে এভাবে পশু উৎসর্গ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারও সন্তান হয়ে মারা যায়, কারও পুত্র সন্তান হয় না, কারও কন্যা সন্তান হয় না, কারও রোগ-বালাই ছাড়ে না ইত্যাদি নানা কারণে তারা পশু উৎসর্গ করে গায়রুল্লাহর নামে। তারা মান্নত করে এভাবে যে, 'হে বড় পীর বা হে খাজাবাবা! আমার এ পুত্রটি যদি বাঁচে তবে আমি তোমার নামে একটি গরু দেব।' ইত্যাদি।

  এ রীতিটিও হিন্দুদের থেকে মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের ষাঁড় নামে একটি কথা আছে। হিন্দু মতে, ধর্মের নামে তথা দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা ষাঁড়ই ধর্মের ষাঁড়। হিন্দুগণ দেবতার বর বা আশীর্বাদ পেয়ে মনের নানা মাকসূদ পূরণের জন্যই দেব-দেবীর নামে ষাঁড় উৎসর্গ করে। হিন্দুদের দেখেই মুসলিমরা পীরের নামে উৎসর্গ করতে শিখেছে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতি।

  এটা মূলত পীরালদের একটা বদ খেয়াল। বাড়তি ধূমধাম করে মানুষকে মাযারমুখী করার একটা ষড়যন্ত্র। পীর-খাদেম ও অন্যান্য কর্মচারীগণের সপরিবারে গোশ্ত খাওয়ার লোভ তো অবশ্যই বিচার্য। অতিরিক্ত পশুগুলো বিক্রি করে টাকা কামাই হয়। এটা হল টাকা ও গোশ্ত খাওয়ার ফিকির।

  দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলিমগণ এখন খুবই গরীব। আর এ দেশের মাযারমুখী মুসলিমদের অনেকেই তো নিঃস্ব এবং দিনমজুর শ্রেণীর। তাদের শেষ সম্বল হল গরু-ছাগল। সারা বছর তারা এগুলোকে খাইয়ে-দাইয়ে

www.i-onlinemedia.net

তরতাজা করে নিয়ে যায় মাযারে পীরের পেট মোটা-তাজা করার জন্য। এটা হল 'পীর মোটা-তাজা করণ' প্রকল্প। পীরালদের যারা দোসর তারা এর পক্ষে ফতোয়া দেয়। এটা হল মুসলিমদের শেষ সম্বল গরু-ছাগলগুলোকে তাদের হাতছাড়া করে তাদেরকে নিঃস্ব করে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। সাধারণ মানুষের ধারণা এমন যে, গরু-ছাগল যাক কিন্তু ঈমান থাক। গরু আর ঈমান নিয়ে মুসলিমরা উপত্যকায় বা জলাশয়ে পালিয়ে না গেলেও অন্তত মাযারে যে পালিয়ে যাচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কি? পীরালরা গরু-ছাগলের ভোগলীলায় মত্ত হয়ে মানুষের দুর্গতি সৃষ্টি করছে। এ জন্যই তারা হল দাজ্জাল বা চোর-ডাকাতের সাথে তুল্য। পীরালদের ষড়যন্ত্রে আজ আর সহজ-সরল মুসলমানদের ঈমান ও গরু-ছাগল নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারও যেন নেই।

- মুসলিমদের অনেকেই পীর-আওলিয়ার নামে সন্তানের মাথার চুল রেখে দেয় এবং মান্নতি মাযারে গিয়ে তা কাটিয়ে আনে বা কামিয়ে ফেলে। মাযার হল তাদের কাছে সেলুন। অনর্থক মাযারে গিয়ে চুল কাটার জন্য ভক্তরা প্রচুর অর্থ-কড়ি খরচ করে। হিন্দুরা মন্দিরে গিয়ে তাদের সন্তানের চুল ফেলে। তাদের দেখাদেখি মুসলিমরাও মাযারে গিয়ে চুল ফেলছে।
- ভক্ত আশেকানরা অনেকেই মাযার তাওয়াফ করে। এ দেশীয় মুসলিমদের যারা মাযার ভক্ত তারা সম্ভবত মক্কাশরীফ যাওয়ার ঝামেলা ও খরচ এড়ানোর জন্য নতুন ও সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা হিসেবে মাযার তাওয়াফ আরম্ভ করে দিয়েছে। কাবাঘর তাওয়াফ করার জন্য মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ থাকলেও কোন মাযার তাওয়াফ করার কোন বিধান নেই। মাযার তাওয়াফ করার পিছনে একটা কারণ অবশ্য আছে, তা হচ্ছে, পীরবাবা হল তাদের কাছে কেবলা কাবা।
- মাযারীরা মাযার সিজদা ও চুম্বন করে। মাযারে গিয়ে তারা এর গায়ে বা উপরে চুমু খায়, মাথা ঠেকায় এবং দেয়ালের বাইরে মাটিতে সিজদা করে। দেয়াল স্পর্শ করে হাতে চুমু খায়। তারা একদিকে জিন্দাপীরের কদমবুচি করছে অন্যদিকে মৃত পীরেরও সিজদা করছে। এ দেশে পীর-আওলিয়াদের পূজা এভাবেই শুরু হয়েছে। হিন্দুরা মন্দিরে দেব-দেবীকে কিংবা ব্রাহ্মণকে ও অন্যান্য গুরুজনকে নত হয়ে ষষ্ঠাংঙ্গ প্রণাম করে। তারই দেখাদেখি মুসলিমরা জিন্দা ও মৃত পীরকে প্রণামরূপী সিজদা করছে। এ দেশের অধিকাংশ মাযারই রাস্তার পাশে গড়ে ওঠে বা কোথাও মাযার দেখা দিলে তার পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়। যানবাহনে করে সেই পথ অতিক্রমকালে মাযার দেখা গেলে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নানা অংগভঙ্গি করে মাযারকে প্রণাম ও সালাম করে। এ দেশে এমন অনেক হিন্দু আছেন যারা কেবল মাযার নয়, মসজিদ দেখলেও সেটাকে প্রণাম করে।

মাযারে চুমু দেয়া সিজদার মতোই বাড়াবাড়ি। যিনি মাথা নত করে মাযারে চুমু খাবেন তিনি যে হিন্দুদের মতো নত হয়ে প্রণামের মতো সিজদা করতে যাবেন

www.i-onlinemedia.net

না, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? মাযারে চুম্বন নিজেই একটি শির্ক। এ শির্ক মানুষকে নিয়ে যেতে পারে আরেকটি শির্কের দিকে। মাযার সিজদা, চুম্বন ইত্যাদি মূর্তিপূজারই নামান্তর এবং কুফরী প্রথা। এ সবই মূলত গোমরাহির শেষ দরজা, যেখানে ভীড় জমিয়েছে এ দেশের লক্ষ-কোটি মুসলমান।

- মুসলিমগণ রোগ আরোগ্যকারী ও মনের মাকসূদ পূরণকারী হিসেবে মাযারের তবারুক অতি ভক্তি ও তাযিমের সাথে খেয়ে থাকে। আজকাল তবারুক পুরিয়া বানিয়ে বাড়ি বাড়ি বিতরণ করা হয়। ভাবখানা কিছুটা এ রকম যে, তোমাদের ডায়রিয়া হয়েছে বা হতে পারে, তোমরা সেলাইন (তবারুক) খাও অথবা ঘরে রাখ, কাজে লাগবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আজকাল পীরের বা মাযারের তবারুক হোমিওপ্যাথি ঔষধের পুরিয়ার ন্যায় ঘরে রাখা হচ্ছে। খেলে অসুখ ভাল হবে, মনের নানা মাকসূদ পূরণ হবে। এ তবারুক যে মুশকিল আসান করে শুধু তাই নয়, তবারুক সেবনে পুণ্য হয়- এ বিশ্বাসও আছে মাযার ভক্তদের। পীরের দরগায় ভক্তদের মাঝে যা বিতরণ করা হয় তাই তবারুক। সেটা কোন খাবার হতে পারে আবার গাছের ছাল-পাতা-শিকড় হতে পারে অথবা সুরমা জাতীয় ব্যবহার্য কোন কিছু হতে পারে। ধরে নেয়া হয় যে, ঐ দ্রব্য বা খাবারের প্রতি পীরের নেক দৃষ্টি রয়েছে অথবা পবিত্র স্পর্শ রয়েছে কিংবা সদা অনুমোদন রয়েছে। ভক্তরা এ তবারুক মাযারে খায় বা ব্যবহার করে, বাড়ি নিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করে আর মানুষ ভক্তির সাথে তা সেবন করে। সেবনের নানা পন্থাও বাতলে দেয়া হয়।

  তবারুক বিতরণের এ কুসংস্কারটি হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। আমাদের যা তবারুক হিন্দুদের তা প্রসাদ। পীরের হল তবারুক আর ব্রাহ্মণ বা দেব-দেবীরা হল প্রসাদ। তবারুক বিতরণ হয় মাযারে বা পীরের দরবারে আর প্রসাদ বিতরণ হয় মন্দিরে। তবারুক সেবনে বা ব্যবহারে মুসলিমদের বিশ্বাসের অনুরূপই হল প্রসাদ সেবনে হিন্দুদের বিশ্বাস।

- মুসলিমগণ কবরে ফুল, পাতা ইত্যাদি দেয়। এটা তারা পীর-মুর্শীদ-ওলি-আওলিয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য করে থাকে। খ্রিষ্টানগণ মৃত আত্মীয়-স্বজনের সমাধিতে ফুল দেয়। এটা তাদের একটা সৌজন্য রীতি। হিন্দুগণ পূজায় ফুল ব্যবহার করে। হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি মুসলিমগণ ফুল দিয়ে পীর-আওলিয়ার কবর পূজা করছেন। তাদের বোধ হয়, এ ধারণা হয়েছে যে, ফুলের গন্ধ গিয়ে মৃতপীরের নাগে লাগে আর তাতে ওলী বা পীর খুশী হন। হিন্দুরা দেবতা ঠাকুরের পূজায় কচি বেল পাতা, আমপাতা ও তুলসীপাতা এবং নানারকম ফুল ব্যবহার করে। হিন্দুদের ঠাকুর পূজার মতো করে মুসলিমরাও পীর পূজা শুরু করেছে ফুল ও পাতা ইত্যাদি দিয়ে। দেবতার আশীর্বাদ পাবার জন্য তাকে ফুল-পাতা দিয়ে পূজা করতে হয়, কিন্তু পীর-মুর্শীদেরা তো মৃত অবস্থায় আশীর্বাদ করতে পারেন না, তাহলে তাদেরকে ফুল-পাতা দিয়ে সন্তুষ্ট করার এ প্রয়াস কেন? পীরালরা এ সব পছন্দ করে। তারা জীবিত থাকতেই মৃত্যু পরবর্তী পূজা পেতে চান মুরীদদের কাছে।

www.i-onlinemedia.net

- মুসলিমগণ মাযারে আগরবাতি পোড়ায়, গোলাপ পানি ছিটায় এবং মোমবাতি জ্বালায়। অন্যদিকে, হিন্দুগণ তাদের ঠাকুর পূজায় ফুলের পানি ছিটায়, ধূপ পোড়ায় এবং মঙ্গল প্রদীপ জ্বালায়। হিন্দুদের ন্যায় এ সব করে মুসলিমরা পীর পূজা করছে। সেই সঙ্গে মূর্তিপূজার মহড়াও দিচ্ছে। মুসলিমদের তো আজ নিজ ঘরেই বাতি জ্বলছে না। ঘরের পরে তো মসজিদ। ঘর আর মসজিদ ফেলে কি তারা তেলের শিশি নিয়ে মাযারে দৌড়াবে?

- মুসলিমগণ মাযারে উরস করে থাকে। আরবী অভিধান মতে, বিবাহ ও বিবাহের পর যে খাওয়ার আয়োজন করা হয় তাই উরস। মজারে উরসপন্থীদের মতে, উরস অর্থ হল বুজুর্গানে দ্বীনের অর্থাৎ পীর-আওলিয়ার ওফাতের তারিখে তাদের রূহের প্রতি সওয়াব রেসানী করার জন্য যে খানা-মজলিশের ব্যবস্থা করা হয় তাই উরস। তারা আবার কবর জিয়ারত এবং সদকা-খয়রাতের সমষ্টিকেও উরস বলে থাকে।

  প্রতি বছর পীরের ইন্তেকালের দিন উরস করা হয়। ঐ বিশেষ তারিখের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সাগরেদগণ বিভিন্ন এলাকায় চাল, নারিকেল, গরু-ছাগল ও টাকা-পয়সা সংগ্রহের কাজে নেমে যায়। এ সব সংগ্রহকারীরা গায়ে, মাথায় ও লাঠিতে লালসালু কাপড় বেঁধে নেয়। অর্থাৎ তারা লাল গিলাফ পরানো কবরের বেশ ধরে। তারা হয়ে যায় পীরের কবরের চলমান মূর্তি। জনসাধারণ গরীব হলেও পীর ও মাযার ভক্তির কারণে যে যার সামর্থ অনুযায়ী দান-খয়রাত করে। এটা কি সত্যিই দান-খয়রাত? ইসলামী বিধানানুযায়ী, দান-খয়রাত করতে হয় গরীব-দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য ফকির-মিসকিনকে। কোন মাযারে তো দান-খয়রাত করার প্রশ্নই উঠে না। প্রতি বছর মানুষ মাযারে সাহায্য করে, সেখানে উরস হয় এবং মাযারগুলো বেঁচে থাকে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পিকনিক করার জন্য বিখ্যাত ও দর্শনীয় স্থানে দল বেঁধে চলে যায়। যাওয়ার সময় খাওয়ার সকল উপকরণই সাথে নিয়ে যায়। যেতে যেতে তারা গান গায়। নৃত্য করে। মাযারে উরসও একটা পিকনিকের মতো। এ পিকনিক ভক্ত, আশেকান-মুরীদের। এরা পীরের ছাত্র-ছাত্রী। এরাও উরস পিকনিকে যেতে যেতে নানা রকম গান গায়, নৃত্য করে এবং এটা তারা নারী-পুরুষ মিলেই করে। খাদ্য (গরু ইত্যাদি) ও টাকা-পয়সাও সাথে নিয়ে যায়।

  এ দেশের যেখানেই মাযার আছে, চাই সেটা বড় হোক বা ছোট হোক, প্রতি বছর সেখানে উরস হবেই। উরস ছাড়া মাযারের কথা কল্পনাই করা যায় না। উরস এলেই মৃত মাযার যেন জীবিত হয়ে ওঠে। উরসের সময় বসে যাবে নানা তেলেসমাতি কারবারের মেলা। দেশের আনাচে-কানাচে থেকে হাজার হাজার ভক্ত আশেকানের সমাগম ঘটে মাযারের আর শত শত সাজানো গরু-ছাগলের আগমনও ঘটে সেখানে। হিন্দুদের ন্যায় এ সময় গরু হয়ে যায় মাযার ভক্তদের দেবতা। তারা লালসালুতে গরু সাজায়, গরুকে মালা পরায়। গরুই যেন তাদের পীর।

www.i-onlinemedia.net

- মুসলিমগণ মাযারে অর্থকড়ি দান করেন। অর্থ আয়ের জন্য মাযার সৃষ্টি এবং উরস-মাহফিলের আয়োজন ভক্ত, আশেকান, মুরীদ-পীর বিশ্বাসীদের যেভাবেই আখ্যায়িত করি না কেন, তারা মাযারে টাকা দিতেই আগ্রহী। টাকা দিয়ে তারা এ দুনিয়ার নানা মাকসূদ এবং পরকালের কল্যাণ হাসিল করতে চায়। তাই মাযার হল টাকার গাছ। একটা মাযার সৃষ্টি মানে একটা টাকার গাছ লাগানো। মাযার একটা জমজমাট ব্যবসা। পীর সাহেব গদীতে বসে থাকেন, মানুষ নজরানা দেয়। আর গদী ছেড়ে বাইরে গেলেও মানুষ দান-খয়রাত করে। কাঠের ও ইটের তৈরি দানবাক্সেও মানুষ প্রচুর দান-খয়রাত করে। রসিদ বই ছাপিয়ে তা দিয়েও টাকা-পয়সা উসুল করা হয়। খাদেমরা নানা স্থানে গিয়ে দান-খয়রাত সংগ্রহ করে কোন রিসিট ছাড়াই। মানুষ যেসব পশুপাখি দান করে সেগুলো থেকেও প্রচুর পয়সা আসে। কোন কোন মাযারে গাড়ি থামিয়ে দান-খয়রাত আদায় করা হয়। কোন ভক্ত মাযারে যেতে না পারলে টাকাকড়ি অন্যদের কাছে দিয়ে দেয়। এ দেশের যারা প্রবাসে রয়েছে তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের কাছে চিঠিপত্র মারফত মাযারের দালালরা সাহায্য প্রার্থনা করে, পীরের জন্য নজরানা পাঠিয়ে দিতে বলে। ডেগ অর্থাৎ গায়েবী ডেগ হল টাকা আদায়ের আরেকটি উপায়। মাহফিলের দিন কিংবা উরসের দিন এ গায়েবী ডেগ প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য সময়ে এ ডেগ লুকিয়ে রাখা হয়। এমন অনেক ডেগ দেখতে পাওয়া যায় নানা মাযারে।
- মুসলিমগণ গরম মাযারের বেশি ভক্ত। পীর-আওলিয়ারা কিভাবে গরম হয় এটা সবাই জানে। যে পীরের মাযারে নিয়াত-মান্নত করে তড়িঘড়ি ফল পাওয়া যায় তাকেই গরম মাযার বলা হয়। এ সব মাযারে লোকজন বেশি বেশি দান-খয়রাত করে। এ দেশের হিন্দুরাও খবর রাখে কোন মাযার গরম অর কোন মাযার ঠাণ্ডা। মাযার ঠাণ্ডা-গরম হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে কিছু কিছু খাদেম ও সাগরেদের প্রচারের কারণে এটা হয়েছে। দোকানদার ব্যবসায়ীরা বেশি কাস্টমার আকর্ষণের জন্য যেমন নান কথা বলে তেমনি খাদেম দালালরাও মাযারে বেশি ভক্ত যোগান দেয়ার জন্য প্রচার করে অমুক মাযার গরম, নিয়ত করবেন সাথে সাথে ফল পাবেন। আবার কিছু কিছু মুর্খ মানুষের কারণেও এটা হয়ে থাকে। যেমন, ধরুন প্রতিবেশী শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে কেউ মাযারে কিছু মান্নত করল। ঘটনাক্রমে[১] হয়ত ঐ প্রতিবেশীর একটা গরু মারা গেল বা তার পরিবারের কেউ

---

[১] এ ক্ষেত্রে অনেকেই 'দৈবক্রমে' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তবে, 'দৈব' শব্দকে সাধারণত অদৃষ্ট বা ভাগ্য অর্থে ব্যবহার করা হলেও শব্দটি দেব সম্পর্কিত। দৈব দুর্ঘটনা মানে যে ঘটনার পিছনে থাকে দেবতার হাত। দেবতা যখন ঘটনার নায়ক হন, তখন তা দৈব ঘটনাই হয়ে থাকে। 'দুর্বিপাক'-এর অর্থও অনুরূপ। যে ঘটনার জন্য মানুষ দায়ী নয়, দেবতা সৃষ্ট দুর্ঘটনা, তাই দুর্বিপাক। 'দৈববাণী' আসে অদৃশ্য থেকে, অদৃশ্য থেকে দেবতা যে বাণী শুনিয়ে থাকেন বা শোনা যায়, তাই দৈববাণী। দৈবাদেশ হচ্ছে দেবতার আদেশ। দিব্যি, দিব্য, দৈবাৎ, দৈবক্রমে, দুর্দৈব সবই দেবতা সম্বন্ধীয়, দেবতা থেকে সৃষ্ট। মুসলিম সমাজে এ সব শব্দ বেশ প্রচলিত। অনেক মুসলিম এ ধরণের বাক্য ব্যবহার করে থাকে, 'মুহাম্মাদ (ﷺ) হেরা গুহায় দৈববাণী শুনলেন, *'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন...'*

www.i-onlinemedia.net

অসুখে পড়ল, তখন মান্নতকারী মনে করে মাযার সত্যিই গরম। এভাবেই অজ্ঞ মূর্খ মানুষেরাও কোন মাযারকে গরম করে ফেলে।

- প্রতিটি মাযারের সৌধে প্রবেশ করার পূর্বে বাধ্যগতভাবেই জুতো খুলে প্রবেশ করতে হয়। অথচ আমরা জানি, আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে জুতো নিয়ে প্রবেশ সিদ্ধ। আর 'বাবা'(?)-এর লাশ সম্বলিত ঘরে জুতো নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাহলে, কি বাবার (?) মর্যাদা আল্লাহ্‌র মর্যাদার চেয়েও বেশি? (না'ঊযুবিল্লাহ) মানুষের বাহ্যিক আমলে তো তাই প্রতিভাত হয়, সম্ভবত এ অতি ভক্তিতে ব্যধিগ্রস্থ হওয়ার ফলেই বিগত এক পুরুষ শাসকের আমলে ঢাকায় রাস্তা তৈরির অজুহাতে 'গোলাপ শাহ মসজিদ' ভাঙ্গা হলেও মাযার ভাঙ্গা হয়নি।
- কিছু কিছু মাযারের গেইটে লেখা থাকে, 'হাজত রাওয়া, মুশকিল কোশা। ফানাফিল্লাহ, বাকাবিল্লাহ গাউছে যমান মাহদূব শাহ...' অর্থাৎ আশা-আকাঙ্খা পূরণকারী, বিপদ-আপদ দূরকারী... যামানার সাহায্যকারী মাহদূব শাহ (প্রমুখের) মাযার।' আর এভাবে মৌখিক ও লিখিত উভয় পন্থায় মানুষের মাঝে শির্কী বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে দেয়া হচ্ছে। ফলে তারা এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে তাড়িত হয়ে মাযার পূজায় আকণ্ঠ ডুবে থাকছে।

মাযারগুলো মূলত হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির চর্চা ও লালন ক্ষেত্র। হিন্দুরা মুসলিমদের মাযারে যায় কোন বিশেষ ভক্তির কারণে নয়। তারা দেখতে পায়, সেখানে চলে পীর পূজা, গোর পূজা, পাথর পূজা, গাছ পূজা, মোমবাতি পূজা, দিঘী পূজা, ফুল পূজা, কবুতর পূজা, অগ্নি পূজা, কাছিম পূজা, মাছ পূজা, কুমীর পূজা, অশালীন নাচ-গান, মেলা, বাদ্য-বাজনা, নেশা পান ইত্যাদি যা তাদের সংস্কৃতির মহান দাবীদার। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমার এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যাবে। হিন্দুরা মুসলিমদের মাযারে যায় কিন্তু মসজিদে যায় না, কারণ মাযারে আর মন্দিরে তাদের কাছে কোন তফাৎ নেই। মাযারে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংস্কৃতি বেগবান করার প্রক্রিয়া চলে। মাযারগুলোতে অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়, এ যেন বহুত্ববাদী হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মম প্রতিশোধ। তারা যেন সেই সৎমানুষদের প্রতি উপহাস করে বলছে- 'দেখ, তোমরা শির্ক-বিদআত ও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলে আজ তোমাদের কবরকে কেন্দ্র করেই এগুলো চালু করেছি। তোমরা মন্দির

কুফরী ও শির্কী এ শব্দগুলো মুসলিম সমাজে প্রায়ই লেখায় বা কথাবার্তায় ব্যবহার হচ্ছে। যারা দেবতা সম্পর্কীয় শব্দ ব্যবহার করেন, তারা শব্দগুলোর বুৎপত্তিগত অর্থের কোন খবরই রাখেন না। মুসলিমদের দেবতা নেই, আছেন লা-শারীক এক আল্লাহ। 'তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না। এ হচ্ছে কুরআনের শিক্ষা। যদি তাতে আমাদের ঈমান থাকে, তাহলে দেবতাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? তাঁর শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে আসমান-জমিনে ও পাতালে কিছুই নেই। তার আর কখনো দৈববাণী নয়, নয় কোন ঐশীবাণী। এমনকি নয় দৈবক্রমে।

www.i-onlinemedia.net

উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলে, তাই তোমাদের প্রতিটি মাযারকে এক একটি মন্দিররূপে গড়ে তুলেছি। তোমরা মুশরিকদেরকে মুসলিম বানাচ্ছিলে অথচ তোমাদের কবরগুলোকে উপলক্ষ্য করেই আজ মুসলিমদেরকে মুশরিক বানাচ্ছি।'

প্রকৃতপক্ষে, ভণ্ড পীরেরা নজরানা ভোগের ব্যবসার জন্য মাযার গড়ে আর নির্বাচন এলে ধোঁকাবাজ রাজনীতিকেরা ভোটের জন্য মাযার যিয়ারত করে। সহজ-সরল মুসলিমরা মাযার-রাজনীতি ও মাযার ব্যবসার প্রতারণার শিকার, কেউ দিচ্ছে তবারুক আর কেউ দিচ্ছে রিলিফ, কেউ ঈমান-আক্বীদা লুটছে আর কেউ তাদের নাগরিক অধিকার হরণ করছে। রাম-কৃষ্ণপন্থী কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু রবীন্দ্রনাথকে পীর সাজিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করছে আর ভণ্ড পীর বুদ্ধিজীবীরা মাযার সংস্কৃতির চর্চা করে মূলত বাঙালি (হিন্দু) সংস্কৃতিরই যথার্থ বাস্তবায়ন করছে। এ বড় নিষ্ঠুর প্রতারণা।

মাযার পূজায় কেবল অনাচার বাড়ে। ভণ্ড পীরেরা যেদিন এ দেশ ছাড়বে এবং এ দেশের মানুষ যেদিন প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবে সেদিন মুসলিমরা নিজেদের পরিচয় খুঁজে পাবে। আজ আমরা আত্ম-পরিচয় ভুলে অন্যদের মাঝে শামিল হয়ে গেছি। বর্তমান বাংলাদেশে পীর-ফকীরদের ধর্মের নামে ব্যাপক শির্কী ও বিদআতী কার্যক্রমের বাস্তবচিত্র তুলে ধরার উদ্দেশে কবি শফিউল আলম বলেন:

দেখরে চাহিয়া তোরা কে যায় গাহিয়া খাজা নামের গান
পীর-মুর্শীদের আজ পাড়িয়াছে দোহাই আযাযীল শয়তান
তামাম দুনিয়া গিয়াছে ভরিয়া শির্ক ও বিদআতে
ইসলাম বুঝি দুনিয়া হতে বিদায় নিয়াছে
কত কবরে জ্বলেরে প্রদীপ মসজিদে নেই বাতি,
খানকাহ মাযারে শিরণী লয়ে উঠেছে সবাই মাতি।
লুটেরার দল লুটল সবি আর কিছু নেই বাকী,
কত লোকের ঈমান করছে হরণ ধর্মের নামে ডাকী
সাধুর বেশে শয়তান এসে দিচ্ছে কুমন্ত্রণা,
তাই না দেখে বিপথগামী হচ্ছে কত জনা।
এখনও তোর ঘুমের ভান
জাগরে যুবক নওজোয়ান
উড়াও গগনে তাওহীদী নিশান...
জাগরে যুবক নওজোয়ান...

www.i-onlinemedia.net

প্রতিমা পূজার ভিত্তি মূর্তি ও ভাস্কর্য, তা দেখে হতে হয় আশ্চর্য

আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অপসংস্কৃতির একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে। এ ময়দানে তো আছেই, আমাদের প্রত্যেকের ড্রয়িংরুমেও প্রবেশ করেছে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে। পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যেও চলছে অপসংস্কৃতির রাজত্ব। অপসংস্কৃতির চতুর্মুখী হামলার মোকাবিলায় ইসলামী সংস্কৃতির অবস্থান কোথায়, তা রীতিমতো গবেষণা সাপেক্ষ।

বাংলাদেশে অগ্নিউপাসকরাই মূর্তিপূজক। ভাস্কর্য শিল্পের নামে এখানে রাস্তার মোড়ে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার স্মারক হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে প্রচুর বিশালকায় পাথরের মূর্তি। এরা অস্ত্রহাতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছে। আর আমরা ওদের নমস্কার জানাচ্ছি। 'অপরাজেয় বাংলা', 'সাবাশ বাংলাদেশ', 'দূরন্ত' প্রভৃতি বাহারী নাম দিয়ে এ সব মূর্তি খাড়া করা হয়েছে। এদের বেদীতে ফুল, ফুলের তোড়া দেয়া হয়। আবার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ভাস্কর্যমূর্তি খাড়া করানো হয়েছে বিভিন্ন প্রাঙ্গনে। সেসব জায়গায় তো রীতিমত ঐসব ব্যক্তিদের পূজা হচ্ছে। তাছাড়া বাঙালিরা (?) বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি দিয়ে এখন তাদের ড্রইং-রুমের শোভাবর্ধন করছে। আমাদের শোকেসগুলো মূর্তি প্রদর্শনের কেস-এ পরিণত হয়েছে। আমরা এককালে কাবাঘর থেকে মূর্তি সরিয়ে দিয়েছি আর এখন ফেলে দেয়া মূর্তিই আবার তুলে নিচ্ছি নিজেদের ঘরে। মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করার জন্য এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নেই।

মূর্তি ও ভাস্কর্যকে যেসব মুসলিম শিল্প-সংস্কৃতি বলে মনে করেন, তারা যদি এ সম্পর্কে ইসলামী কোন ধারণাই না রাখেন, ইসলাম এ বিষয়ে কি কথা বলে, তাও না জানেন, আরবের আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ সম্পর্কে বেখবর থাকেন, এমনকি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবনী পাঠ না করে থাকেন, না শুনে থাকেন, তাহলে মূর্তি আর ভাস্কর্যের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির রূপ দেখতে পারেন, নিজেদের জড়াতে পারেন, এর চিন্তা ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা করতে পারেন, এমনকি এর উৎকর্ষ সাধনে ব্রতীও হতে পারেন।

এ অজ্ঞতা যেসব মুসলিমের নেই, তারা যেমন মূর্তিপূজারী হতে পারেন না, তেমনি পারেন না 'মূর্তি সংস্কৃতি'র প্রচার-প্রসার ও উৎকর্ষতার জন্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন ও সহায়তা করতে। তবে মূর্তিকে ও মূর্তি পূজাকে যেসব অমুসলিম 'ধর্ম' বানিয়ে ফেলেছেন, তাদের এ ধর্মাচরণকে কোনভাবে বাধা দেয়া যাবে না, তাদের পূজার বিরোধিতা করা যাবে না, তাদের ধর্মানুভূতিকে কোন আঘাত করা যাবে না; মন্দির, পুরোহিত আর জূজারীদের নিরাপত্তার জন্য সব রকমের সহায়তা করতে হবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা। সূরা কাফিরূনই এ ব্যাপারে মুসলিমদের গাইড লাইন।

www.i-onlinemedia.net

মুসলিমদের মধ্যে যারা অজ্ঞতা, প্রগতি আর বিজ্ঞতার পর্দা ঝুলিয়ে নানা ব্যাখ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মূর্তি সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়েছেন, তাদের অজ্ঞতা বাহানা মাত্র। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার ইবাদাতের জন্য মাটি, কাঠ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা তাঁর কাল্পনিক আকার দেয়ার কোন স্থান বা কল্পনা ইসলামে নেই। এ ধারণার ব্যাখ্যা হয়ত সবিস্তারে প্রত্যেকের কাছে নেই, কিন্তু এতটুকু ধারণা প্রত্যেকের কাছেই আছে যে, ইসলামে মূর্তিপূজা নেই, মূর্তি তৈরিও নিষেধ; বিভিন্ন সময়ের আলোচনা, ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই এ ধারণাটি হয়ে গেছে যে, মূর্তি ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম তথা নিষিদ্ধ। ইসলাম মূর্তি পূজার বিরোধী। মুসলিম মূর্তি পূজা করে না। মূর্তিকে তারা ঘৃণা করে। প্রতিমা, স্মৃতিচিহ্ন, স্মৃতিসৌধ, কোন মহাপুরুষের প্রতিকৃতি ও যাবতীয় ছায়ামূর্তি স্থাপন করা, এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা ইসলামে শির্ক ও মূর্তি পূজার সমান পাপ মনে করা হয়। আর এ পাপের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে কোন ক্ষমা অবশিষ্ট নেই। যারা প্রগতি আর বিজ্ঞতার দোহাই দেয়, তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্কে যেতে চাই না। ইবলিস তো আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিতর্ক করতেও পিছপা হয়নি। আমরা আদমের সন্তান, আল্লাহ্‌র ফয়সালাই আমাদের জন্য চূড়ান্ত।

মূর্তি ও ভাস্কর্য সমার্থক। মূর্তি ও ভাস্কর্যের কুরআনের পরিভাষা হচ্ছে,[১] 'আত-তামাছিল'। ইব্রাহীম (আ:) তাঁর স্বজাতিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ (سورة الأنبياء: ٥٣)

অর্থ: 'এ প্রতিকৃতিগুলো কি? যাদের তোমরা উপাসনা করছ?' [সূরা আল আম্বিয়া (২১): ৫৩]

এ আয়াতে মূর্তি বা তাদের উপাস্য দেবতাগুলোকে 'তামাছিল' বলা হয়েছে। অভিধানে 'মূর্তি, ভাস্কর্য ও ছবি'- এ তিনটির অর্থই 'তামাছিল' শব্দটি বহন করে। কোন ব্যক্তি বা জাতি যদি উপাস্য হিসেবে অথবা জাতীয় নিদর্শন হিসেবে কিংবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোন জীবজন্তু, গাছ-পাথর, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দেব-দেবতা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, নেতা-নেত্রী প্রভৃতির ছবি বা আকৃতি মূর্তির ন্যায় নির্মাণ করে ও তা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করে কিংবা নিজ গৃহে লটকিয়ে রাখে, তাহলে তা শির্ক হিসেবে গণ্য হবে।

এককালে আরব জাতি মূর্তি পূজারীতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তারা লাত্, মানাত, হুবলসহ বহু দেব-দেবতার প্রতিকৃতি আরব ভূমির বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করেছিল এবং সেখানে সমবেত হয়ে এদের বেদীতে বিভিন্ন পর্ব বা উপলক্ষে 'অর্ঘ্য' ও পুষ্প নিবেদন করত। মুশরিক আরব জাতির এদের প্রতি ছিল প্রচণ্ড রকমের বিশ্বাস এবং

[১] মূর্তি বা ভাস্কর্যের আরবী শব্দ হচ্ছে 'তিমছাল' (تمثال), 'ছানাম' (صنم), 'নাহত' (نحت) প্রভৃতি। মূলত ভাস্কর্য হচ্ছে একটি শিল্পের নাম। যে শিল্পে পাথর, মাটি বা কোন ধাতব বস্তু খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ করা হয়। আর যিনি ভাস্কর্য তৈরি করেন তাকে বলা হয় ভাস্কর বা মূর্তি নির্মাণকারী।

www.i-onlinemedia.net

শ্রদ্ধানুভূতি। এ কাজটি তাদের বিশ্বাসের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটা পর্যায়ক্রমে তাদের জাতীয় জীবনে ও তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মক্কার মূর্তি পূজারীরা মক্কা নগরীর উপকণ্ঠে মিনা বাজারের সন্নিকটে একটি বিশাল হুবল দেবতার মূর্তি স্থাপন করেছিল। কাবা গৃহের অভ্যন্তরেও বহু কল্পিত দেবতার প্রতিকৃতি স্থাপন করেছিল।

কুরআন নাযিল শুরু হলে সূচনাতেই রাসূল (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে মুসলিম জাতিকে মূর্তি পূজার নাপাকি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। যেমন, রাসূল (ﷺ)-কে বলা হয়,

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (سورة المدثر: ٤)

অর্থাৎ '[হে রাসূল!] আপনি মূর্তি পূজার অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকুন।' [সূরা মুদ্দাস্‌সির (৭৪): ৪]

বিখ্যাত তাফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহুরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ মনীষীগণ এ আয়াতের অর্থ করেছেন প্রতিমা ও ভাস্কর্যের অপবিত্রতা।[১]

৮ম হিজরী সনে মুসলিমগণ সুদীর্ঘ ৮টি বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের পর বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। ইতোপূর্বে মক্কার মুশরিকরা মহানবী (ﷺ) এবং তাঁর সাথী সাহাবীগণকে বহু কষ্ট ও নির্যাতন করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে মুসলিমগণ রাতের আঁধারে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় আশ্রয় নেন। এতেই মুশরিকরা ক্ষান্ত হয়নি। তাঁরা মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুহাজির এবং আনসারদের বিরুদ্ধেও একের পর এক ১০/১২টি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। মুসলিমরা যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তাদের দুশমনদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং নিজেদের বিজয়ের আনন্দকে অম্লান করে রাখার জন্য বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন ও ভাস্কর্য নির্মাণ করাই ছিল অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মহানবী (ﷺ) সেদিন মূর্তি পূজারী মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি এবং বিজয়ের আনন্দে কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করেননি। বদর, ওহুদ, খন্দক, মুতাসহ বহু যুদ্ধে হাজার হাজার সহকর্মী-সাহাবীদের আত্মত্যাগ ও কুরবানির পর যে ইসলাম আরবের বুকে কায়েম করেছিলেন, সেই রণপ্রান্তরগুলোতে তিনি একটিও ভাস্কর্য নির্মাণ করেননি, এমনকি বড় বড় সাহাবীদের কবরগুলোর পরিচয় পর্যন্ত নেই।

মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মূল করার জন্যই ইসলামের আগমন ঘটেছে। রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশে এবং নেতৃত্বে মক্কাসহ আরব ভূমি থেকে সকল মূর্তি ও জাহেলী যুগের স্মৃতিসৌধগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়। বিজয়ী বেশে রাসূল (ﷺ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন পর্যন্ত মুশরিকদের ধারণা ছিল, কাবাগৃহের মূর্তিগুলো তাদের রক্ষা করবে এবং সে জন্য কাবার মূর্তিগুলো ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণে

[১] *Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, p. 172; At-Tabari, 24:13.*

www.i-onlinemedia.net

অপেক্ষা করতে থাকে। মক্কায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র নাবী (ﷺ) কাবাগৃহের আশেপাশের সকল মূর্তি ও তৈলচিত্র অপসারণের কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি নিজ হাতে কয়েকটি মূর্তির গায়ে আঘাত করেন এবং বাকিগুলো আলী (রাঃ) ও অন্য কতিপয় সাহাবী ভেঙ্গে ফেলেন। এ সময় পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়-

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً﴾

(سورة الإسراء: ٨٤)

"বল, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।" [সূরা আল-ইসরা (১৭): ৮১]

তিনি (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করতে করতে তাঁর হাতের বর্শা দ্বারা কাবা ঘরের আশপাশ ও ছাদের উপরে স্থাপিত মুশরিকদের নির্মিত মূর্তি ও ভাস্কর্যগুলোকে লক্ষ্য করে এদের বুকে আঘাত করলেন আর সাথে সাথে মূর্তিগুলো উল্টে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল।[১]

জাবের (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় যখন আমরা নিকটবর্তী 'বাত্বহা' উপত্যকায় ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যেন কাবা গৃহের সকল ছবি (মূর্তি) নিশ্চিহ্ন করে দেন। তারপর উক্ত মূর্তিসমূহ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাবা গৃহে প্রবেশ করলেন না।[২]

তাছাড়া, শির্কের গন্ধযুক্ত নিদর্শন ধ্বংসে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার (রাঃ)-এর পদক্ষেপ কম উল্লেখযোগ্য নয়। মুসলিম সমাজে যাতে শির্ক কোন চোরা পথে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে উমার (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে শির্কের সন্দেহযুক্ত কোন কাজ হতে দেখলে তা সাথে সাথে বন্ধ করার নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে অনেক ঘটনার বিবরণ আমরা উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করতে পারি। নিম্নে এ রকম একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল:

> মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় একটা গাছের নিচে রাসূল (ﷺ) কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এর কয়েক বছর পর দেখা গেল যে, কিছু সাধারণ লোকজন এ গাছটিকে বুজুর্গ মনে করতে শুরু করে এবং এর নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করা পূণ্যের কাজ মনে করতে থাকে। উমার (রাঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি গাছটিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সেখানে অবস্থান করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এ গাছের মধ্যে শির্কের গন্ধ পেয়েছি।'[৩]

---

[১] মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, হা/২৪৭৮ ও ৪২৮৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ: ২৭২।

[২] সহীহ আবু দাউদ, হা/৩৫০২ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ।

[৩] জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, পৃষ্ঠা ৩৪-৫৫।

www.i-onlinemedia.net

এ ঘটনা থেকে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম শির্কের গন্ধযুক্ত কোন কাজকে শুধু বর্জনই করে না, একে সমূলে ধ্বংস করারও হুকুম দেয়।

ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম তাৎপর্য হল, মুসলিমদের চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসকে শির্কের কলুষ থেকে পবিত্র রাখা। তাওহীদের বিষয়ে ইসলাম অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এটা অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। কেননা, অতীত জাতিসমূহে মূর্তির পথেই শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

পৃথিবীর কোন সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) মুসলিম দেশের সরকার যদি মূর্তি ও ভাস্কার্য নির্মাণ শিল্পে জড়িয়েও পড়েন, তাহলেও তা মুসলিমদের জন্য আদর্শ হতে পারে না। আমাদের এ দেশ পৃথিবীর একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের বুকে ঘুমিয়ে আছেন এমন অনেক পুণ্যবান আলিম-মাশায়েখ যারা বাংলাদেশে তাওহীদের পতাকা উড়িয়েছেন। মুশরিকদের 'সংস্কৃতি-আচার-আচরণ'-এর পরিবর্তে এ দেশে তারা কায়েম করেছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি ও নিয়ম-নীতি। তারা চেয়েছিলেন শির্ক বর্জিত জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে সমাজের সকল স্তরে উজ্জীবিত করতে। অথচ আজ আমরা দেখছি বিপরীত অবস্থা, বিপরীত দৃশ্য। তাওহীদের চাষাবাদ করা এ ভূখণ্ডের দর্শনীয় স্থানগুলো মূর্তি প্রদর্শনীর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে, শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ ও চত্বরসমূহ। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। এ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, জগন্নাথ হলের ভিতরে ও সামনে পুকুরপাড়ে, মহসীন হলে গেটে বসুনিয়া তোরণের পাশে, মধুর ক্যান্টিনের সামনে, শামসুন্নাহার হলের সামনে, আনোয়ার পাশা (পুরাতন জাদুঘর) ভবনের সামনে, চারুকলার বকুলতলার সামনে ছাড়াও বিভিন্ন ভবনের সামনে রয়েছে নানা ব্যক্তির প্রতিকৃতি। জগন্নাথ হল, এসএম হল এবং উদয়ন স্কুলের মোহনায় ফুলার রোডে বিরাট এলাকা জুড়ে বহু মূর্তির সমন্বয়ে একটি ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। মূলত চারুকলা ও আনোয়ার পাশা ভবনের আশপাশে ছড়িয়ে থাকা মূর্তিগুলো এনে বসানে হয়েছে এখানে। একসাথে প্রায় ৮০টির মতো মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসানো হয়েছে। কাজ নিখুঁত না হওয়ায় এদের সনাক্ত করা কষ্টকর।

মূর্তি, মূর্তি এবং মূর্তি। শুধু মূর্তি আর মূর্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে এখন মূর্তির ছড়াছড়ি। গাছের তলে ঝোঁপের আড়ালে মূর্তি। ভাস্কর্যের নামে শিল্প সৌকর্যবিহীন অগণিত মূর্তি এলোমেলোভাবেও ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। এ সবের মধ্যে যুবক-যুবতীর মূর্তিও রয়েছে, রয়েছে হিন্দু অবতার কৃষ্ণ ও তার প্রেমসঙ্গিনী রাধার যুগল মূর্তি। টিএসসি সড়ক দ্বীপেও মূর্তি। ডাসের পিছনে 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' মূর্তি। যৌন আবেদনময় রুচিহীন অনেক মূর্তি যত্রতত্র পড়ে আছে। শিল্পের নামে শত শত মূর্তি ও মূর‍্যাল চিত্র তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ পৌত্তলিক সংস্কৃতি চর্চার

www.i-onlinemedia.net

আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক জাহিলিয়াতের যুগের ৩৬০টি মূর্তির রেকর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অনেক আগেই ভঙ্গ করেছে। এখন মূর্তি সংস্কৃতিপন্থীদের লক্ষ্য দেশের প্রত্যেক শহর, নগর, বন্দর এমনকি থানা সদর পর্যন্ত মূর্তি দিয়ে ভরে তোলা। কোন কোনটা হবে চেনা-জানাদের মূর্তি (ভাস্কর্য নামে) আর কোন কোনটা হবে অচেনা ও অজানাদের মূর্তি। ভাস্কর্য নামে আন্দোলন করে মূর্তির প্রতিষ্ঠা, কি চমৎকার কৌশল!

বাংলাদেশে মূর্তি তৈরির প্রথম ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ৮ই এপ্রিল। ১৯৬৪ সালে মাত্র দু'জন ছাত্র নিয়ে তৎকালীন আর্ট কলেজে ভাস্কর্য বিভাগের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে এ বিভাগে ছাত্রের অভাব নেই। প্রচুর ছাত্র। মূর্তি-ভাস্কর্যের ছড়াছড়িই প্রমাণ করে বিভাগটি কত সরগরম।

১৯৮৩ সালের মে মাসে জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা কুষ্টিয়ার একটি থানার মালখানা থেকে ৬টি মূর্তি এনে এলিফ্যান্ট রোডে পুলিশ অফিসার্স মেসে স্থাপন করেন। অফিসার্স মেসের 'শোভা বর্ধনের' জন্যই স্থাপন করা হয় বলে কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেন। মসজিদ নগরী ঢাকাকে মূর্তি নগরীতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন চলছে।

মূর্তি পূজা, মূর্তি নির্মাণ, মূর্তির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মুসলিম নামের মূর্তিপন্থীরা বলছেন, আমরা তো মূর্তি তৈরি করছি না, ভাস্কর্য তৈরি করছি। ভাস্কর্য দিয়ে রাজধানী সাজাচ্ছি। এটা তো দোষের কিছু নয়। মুসলিম নামের একজন ভাস্কর বলেছেন, মূর্তি আর ভাস্কর্য এক বস্তু নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ সব ধারণা তারা কোথায় পেলেন, তা তারাই ভাল জানেন। অভিধান থেকে আমরা জানতে পারি যে, মূর্তি আর ভাস্কর্যের মধ্যে কেবল শব্দের পার্থক্য ছাড়া বিশেষ আর কোন পার্থক্য নেই। অতি হালকা একটা পার্থক্য অবশ্য আছে তা পরে আলোচিত হবে।

মূর্তি মানে দেহ, শরীর, আকৃতি, চেহারা, রূপ, প্রতিমা অর্থাৎ মূর্তিমান, মূর্তিপুজা, অশরীরীর দেহ ধারণ, বাস্তব বা কাল্পনিক দেহ গড়ন ইত্যাদি। মূর্তিকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় Idle। এ আইড্‌ল সম্পর্কে সংস্কৃতি, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য পুস্তকে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা রয়েছে। এখানে মাত্র তিনটি উদ্ধৃত করা হল:

1. *An image of God of Goddess.*
2. *An object of worship*
3. *An object of love of deem devotion or admiration*

অর্থাৎ:

১.দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি
২.পূজার বস্তু
৩.ভালবাসা বা পরমভক্তির পাত্র বা বস্তু

www.i-onlinemedia.net

Contents-1 Contents-2

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রামাণ্য পুস্তকে মূর্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'শুধু দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরির নামই মূর্তি নয়, বরং কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর আমাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা এমন গভীর থাকে, যার ফলে আমরা তাতে সীমালংঘন করে এবং কখনো অযৌক্তিকভাবে যুক্ত হয়ে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর আকৃতি গড়ে তুলি, তাও মূর্তি।'[১]

ভাস্কর্য ও মূর্তিকে কেউ কেউ পৃথক অর্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দ দু'টির মধ্যে প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই, বরং দু'টিই অভিন্ন শব্দ। মূর্তি বা ভাস্কর্য গড়ার কলাকৌশল প্রায় একই। মূর্তি নামে যা গড়া হয়, তার মধ্যে মুখ্য থাকে ধর্মীয় মনোযোগ আর বিশ্বাস। কিন্তু ভাস্কর্য গড়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোযোগ বা বিশ্বাস মুখ্য থাকে না বটে, কিন্তু একেবারে যে বাদ যায়, তাও বলা যায় না। ভাস্কর্যে যখন ভাস্করের বা বিশেষ মহলের অথবা উদ্যোক্তাদের প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি খোদায় হয়ে দর্শকদের সামনে ভাসে আর তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তখন আর একে ভাস্কর্য বলা যাবে না, সেটা মূর্তি হয়ে যায়; এমনকি যে ছবির ফ্রেমের উপরে তারকাঁটা (পেরেক) বসিয়ে জন্ম ও মৃত্যু দিবসে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়, সে ছবিটিও মূর্তির চরিত্র ধারণ করে। অতএব, যারা মূর্তি ও ভাস্কর্যকে পৃথক ব্যাখ্যা করেন এবং উপাসনার জন্য নির্মিত না হলে দোষণীয় নয় বলার চেষ্টা করেন, তারা হয় মূর্খতার মধ্যে নিপতিত, নয়তো জ্ঞানপাপী। কেননা, এ বিষয়ে ইসলামের বিধিবিধান এবং মূর্তি তৈরি সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত মর্মান্তিক পরিণতির বিবরণই জ্ঞানী মহলের জন্য যথেষ্ট।

মূলত, স্মারক মূর্তি থেকেই পূজার মূর্তির সূচনা হয়েছে।[২] তাছাড়া, বাংলা পিডিয়ায় ভাস্কর্যের যে প্রবন্ধটি রয়েছে তার সারকথাই হল, এ শিল্পের সূচনা ও বিকাশ পুরোটাই ঘটেছে মূর্তিকে কেন্দ্র করে। বিখ্যাত ও প্রাচীন সকল ভাস্কর্যই বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। যেমন, কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেয়া হল:

১. এ শিল্পের কেন্দ্র ছিল মথুরা। এখানে সে সময় মূলত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন- এ প্রধান তিনটি কেন্দ্রের অনুসারীরা পূজার নিমিত্তে মূর্তি বানাতে গিয়ে এর সূচনা করেছিল।

---

[১] *Any person or thing on which we strongly set our affettion; that to which we are excessively, often improperly attached.* ভাস্কর্যকে ইংরেজি ভাষায় বলে, Sculpture -এর মানে ও ব্যাখ্যা হচ্ছে, *'The Art of carving, cutting or hewing stone or other materials into images of men, beasts. The Art of imitating natural objects in solid substances representation some real or imaginary objects.*

[২] বিস্তারিত দেখুন এ বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায়।

www.i-onlinemedia.net

২. গুপ্ত শাসকগণ ছিলেন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। প্রাথমিক গুপ্তমূর্তিগুলোর বেশিরভাগই বিষ্ণু অথবা বিষ্ণু সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোন মূর্তি। এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্যটি বিহারের ভাগলপুরের শাহকুণ্ড থেকে আবিস্কৃত নরসিংহ মূর্তি।

৩. বাংলার গুপ্ত ভাস্কর্যগুলো বেশিরভাগই প্রতীকী এবং এগুলোর আকৃতি নির্ধারিত হয়েছে মধ্যদেশ বা মধ্যভারতের পুরোহিত কর্তৃক বর্ণিত দেবতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

৪. অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করে। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং এ ধর্মের মহাযান মতবাদটি তাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পাল রাজাদের সর্বপ্রাচীন নমুনাটি ধর্মপালের ২৬ রাজ্যাঙ্কের (আনুমানিক ৭৭৫-৮১০ খ্রি.) যা বিহারের গয়া থেকে পাওয়া গেছে। দেবপালের সময়ের তারিখ সম্বলিত বলরামের দুটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য ও তারার একটি প্রস্তর ভাস্কর্য এ অঞ্চল থেকেই পাওয়া গেছে।

৫. বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দশম শতকে যে সকল ভাস্কর্য আবিস্কৃত হয়েছে, তাতে বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ্যমূর্তিও অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণ হিসেবে প্রতীকী চিহ্ন সম্বলিত বেশ কিছু মনসা মূর্তির কথা বলা যায়, যেগুলো এ অঞ্চলের প্রথম পর্যায়ের ভাস্কর্য হিসেবে পরিচিত।

৬. পশ্চিম দিনাজপুরের এহনাইল থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তিটি (২৪.৪ সে.মি.) তাদের কমনীয় আলিঙ্গনভঙ্গির জন্য শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হিসেবে প্রতীয়মান।[১]

এ ছাড়াও আরো অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা পিডিয়ায় 'মূর্তিতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেয়া হল:

'মহাজাগতিক বা পঞ্চবোধিসত্ত্ব বাংলায় পৃথকভাবে পূজিত হতেন। মান্দার (নওগাঁ জেলা) ভারসন থেকে প্রাপ্ত ও বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত মস্তকবিহীন কালো পাথরে খোদিত ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের এ অনিন্দসুন্দর ভাস্কর্যটি পঞ্চবোধিসত্ত্ব ভাস্কর্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।'[২]

জৈন ধর্মীয় মূর্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিবন্ধকার বলেন, 'শুধু বর্ধমানেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাকুড়া জেলাগুলোতে প্রচুর সংখ্যক পাথরের জৈন ভাস্কর্য ও অন্যান্য পুরাবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু এখনো সেখানে পূজিত হচ্ছে, আবার কিছু কিছু জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।'[৩]

---

[১] বাংলা পিডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৩-৫, ৩৩৭-৯।
[২] প্রাগুক্ত, ৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪।
[৩] প্রাগুক্ত, ৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮।

www.i-onlinemedia.net

মোটকথা, ভাস্কর্য থেকে মূর্তি এবং মূর্তি থেকে ভাস্কর্য- এ চলাচলই হল মূর্তি ও ভাস্কর্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সারকথা। একে অস্বীকার করা বাস্তবতাকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

ইসলামের মূল আদর্শ ও চেতনার সঙ্গে মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিরোধ হল:

- কোন কোন ভাস্কর তার নির্মিত বস্তুর ব্যাপারে এতই মুগ্ধতার শিকার হয়ে যায় যে, যেন ওই প্রস্তরমূর্তি এখনই জীবন্ত হয়ে উঠবে! এখনই তার মুখে বাক্যের স্ফূরণ ঘটবে! বলাবাহুল্য, এ মুগ্ধতা ও আচ্ছন্নতা তাকে এক অলীক বোধের শিকার করে দেয়। যেন সে মাটি দিয়ে একটি জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করে ফেলেছে!
- এ শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা কোন সীমারেখার পরোয়া করে না। নগ্ন অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি, মূর্তিপূজার বিভিন্ন চিত্র ও নিদর্শন ইত্যাদি সবকিছুই নির্মাণ করে থাকে।
- এ শিল্প হচ্ছে অপচয় ও বিলাসিতার পরিচয়-চিহ্ন। বিলাসী লোকেরা বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত প্রতিকৃতিসমূহের মাধ্যমে তাদের কক্ষ, অট্টালিকা ইত্যাদির 'সৌন্দর্য বর্ধন' করে থাকে। ইসলামের সঙ্গে এ অপচয় ও বিলাসিতার কোন সম্পর্ক নেই।
- মূর্তি ও ভাস্কর্যের মতো স্থূল উপকরণের মাধ্যমে স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎপদতা। প্রাচীন গ্রীক ও পারস্য সভ্যতায় এটা বিদ্যমান ছিল। পরে ইউরোপীয়রা তা অনুসরণ করেছে। এরা স্বভাবগতভাবেই ছিল মূর্তির পূজারী। তাদের পক্ষে মানুষের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়নি। ত্যাগ ও বীরত্বের সমুন্নত দৃষ্টান্তরূপে মানুষের সম্ভাবনাকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি বলেই তাদের বীর পুরুষদেরকে উপাস্য হিসেবে এবং উপাস্যদেরকে বীর যোদ্ধা হিসেবে কল্পনা করেছে।

যাহোক, আমরা সাধারণত জানি, দেব-দেবীর মূর্তি হয়। কিন্তু শত শত বছর ধরে এ ধারণাও প্রত্যাখ্যাত। কারণ একটাই, আর তা হচ্ছে, দেব-দেবীদের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, কেউ কি কখনো দেব-দেবীদের দেখেছেন? কেউ দেখেননি। কোন শিল্পীর নজরে তাদের ছায়াও পড়েনি। এখানে প্রশ্ন, তাহলে তাদের চেহারা একমাত্র কল্পনার রূপ দেয়া ছাড়া কি সম্ভব? সুতরাং বলা যায়, কাল্পনিক হোক বা বাস্তব হোক, সবই মূর্তি। আর এ মূর্তিগুলোর অধিকাংশেরই নতুন নামকরণ হয়েছে ভাস্কর্য। নর্তকীর নতুন নাম যেমন নৃত্যশিল্পী।

মুসলিমদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ হয়ে উঠেছে মূর্তিময়। মূর্তি স্থাপনের এলাকা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এক সময় ঢাকাকে বলা হতো মসজিদের নগরী। তারপর লোকে রিকশার নগরীও বলত, এখনো বলে। বস্তির নগরীও বলে থাকে। দু'দিন পর মূর্তির নগরীও বলবে, সে সময় দ্রুত আসছে। তখন হয়ত মসজিদ আর মূর্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগবে। তখন যদি মূর্তিপ্রেমিকরা মসজিদের উচ্ছেদ চায়, তাহলে অবাক হওয়ার কোন কারণ থাকবে না। মূর্তির দেশে মসজিদের সংখ্যা এ সব কারণেই কমে।

www.i-onlinemedia.net

কালে কালে আমরা অনেক পরিবর্তনই দেখছি। বেশ্যারা সমাজের কতিপয় বুদ্ধিজীবীর নিকট থেকে 'সেফটি ভাল্‌ব' উপাধী পেয়ে হয়েছে যৌন কর্মী, নর্তকীকে দেখছি নৃত্যশিল্পী হিসেবে, রাহাজানি করে যেসব দস্যু তারা হয়েছে ছিনতাইকারী। আর ভারতীয় মূর্তি সভ্যতা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ভাস্কর্য নামে। কারণ, মূর্তির মর্মবাণী আর দর্শন বাংলাদেশীদের শোনাতে গেলে বা সে শিক্ষা বাংলাদেশীদের অন্তরে স্থাপন করতে হলে ভাস্কর্যের মুখোশ তো অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে বাংলাদেশে মূর্তি ও ভাস্কর্য সমার্থক শব্দ হয়ে গেছে। যা মূর্তি তাই ভাস্কর্য। পূজার মূর্তি কল্পিত, ভাস্কর্যরূপ মূর্তি পরিচিত, মাঝে মাঝে কিন্তু আছে বিমূর্ত। ফারাক শুধু এই। আজকাল মিছিলেও মুখোশ মূর্তি লাগান হয়।

এক আল্লাহতে বিশ্বাসী তাওহীদবাদীদের কাছে ব্যক্তি বা বস্তু পূজার কোন কানাকড়ি মূল্য নেই। এ পূজার ধারণা প্রত্যেক মু'মিনের মগজ থেকে, মন থেকে বিলকুল মাইনাস। এখন যদি এ মাইনাসকে মাইনাস করা সম্ভব হয়, আর সে স্থানে স্থাপন বা প্রতিস্থাপন করা যায় মূর্তির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও ভালবাসাকে, তাহলে এ মগজে বহু স্রষ্টার রাজত্ব কায়েম হবে, শয়তান হবে সে রাজত্বের গভর্নর। বিনা হামলায় কৌশলে কাবু। এ জন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গন সুকৌশলে দখলের চিন্তা করে কুশলী শিকারীরা। কখনো নীরবে আবার কখনো সরবে এবং সাড়ম্বরে শিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

মূর্তির ব্যাপার-স্যাপার বিশ্বের নেতৃস্থানীয় কোন ধর্মে নেই এবং কখনো ছিল না। মূর্তির পূজা একান্তভাবে কাল্পনিক এবং এ ধারণা অবৈজ্ঞানিকও। ধর্মের সঙ্গে মূর্তির কোন সম্পর্কও নেই। মূর্তিপূজা বিশ্বের একটি মাত্র ধর্মের মূলধারায় এবং তার শাখা-প্রশাখায় রয়েছে, অন্য কোন ধর্মে মূর্তি পূজা নেই। আরবে এক সময় মূর্তিপূজা ছিল না, আবার এক সময় ছিল, তারপর মূর্তিপূজা ও মূর্তি চিরতরে নির্বাসিত হয়। মূর্তি পূজার স্বপক্ষে কোন দলিল নেই। দলিল থাকবেই বা কেমন করে। দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে যারা মূর্তিকে সামনে নিয়ে পূজা করে, তারা কি বলতে পারে যে, এ মূর্তির চেহারা অমুক দেব বা দেবীর? দেব-দেবীর অস্তিত্ব আছে বলে যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের এ ধর্মীয় বিশ্বাসকে মেনে নিলেও এ প্রশ্ন কি করা যায় না যে, দেব-দেবীরা কি দৃশ্যমান? মানুষ কি তাদের দেখতে পায়? না, দেখা যায় না, মানুষ দেখতে পায় না, তারা দৃশ্যমান নয়, তারা কায়াহীন, অদৃশ্য। যাদের দেখা যায় না, অদৃশ্য তাদের প্রকৃত চেহারা মাটি, পাথর বা কাঠের মূর্তিতে রূপ দেয়া কি সম্ভব? মোটেই সম্ভব নয়, শুধু কল্পনা করা যায়। সুতরাং ধর্মীয় কোন ভিত্তি ছাড়া শুধু কল্পনায় গড়া মূর্তি আর মূর্তি সামনে নিয়ে পূজা কখনো ধর্মীয় পূজা হতে পারে না, সংস্কৃতি তো নয়ই। সংস্কৃতি তো সংস্কার থেকে উদ্ভূত। যে সংস্কারে ধর্মীয় ভিত্তি নেই তা সংস্কার হয় কেমন করে, সংস্কারের তো একটা ভিত্তি থাকতে হবে? ভিত্তিটা কি? সংস্কার ছাড়া সংস্কৃতি হয় না।

www.i-onlinemedia.net

ধর্মে যে প্রথার স্বীকৃতি নেই, সে প্রথাকে পূজায় আনা যায় না। সনাতন পূজা মূর্তি পূজা নয়। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তা রাজ্যে দু'টি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে বৈদিক অপরটি তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার মূল ভিত্তি হচ্ছে বেদ ও উপনিষদ, আর তান্ত্রিক ধারা হচ্ছে অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থ। দেব-দেবীর পূজা কিংবা মূর্তিপূজা তান্ত্রিক মতানুসারে সম্পন্ন হয়। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা ছিল না। সেই যুগে আরাধনার মাধ্যম ছিল যজ্ঞকর্ম। ঈশ্বর বা ভগবানকে সকার রূপে আরাধনা করা, অসীমকে সীমার মাঝে, অপরূপকে রূপ দিয়ে মূর্তি পূজার বা পূজা পদ্ধতির আবিষ্কার বৈদিক পরবর্তী যুগে হিন্দু মুণি-ঋষির দ্বারা প্রবর্তিত হয়। আর মূর্তি গড়ার ইতিহাস যখন এই, তখন মূর্তিকে মুসলিম নামের বাবু-মুসলিমরা কোন্ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এত ভালবাসতে শুরু করলেন, তা বোঝা যায় না। হিন্দু ধর্মে মূর্তি যদি নানা সংস্কারে গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতিও পায়, তাহলে তা তাদের পূজায় থাক্ না, এ নিয়ে এক শ্রেণীর মুসলিমদের কাড়াকাড়ি কেন? এ কি অনধিকার চর্চা হয় না?

দুর্ভাগ্য যে, মূর্তি পূজারীদের ন্যায় বর্তমান যুগের নামধারী মুসলিমরাও মূর্তি বা মৃতব্যক্তির স্মরণে নির্মিত পিলারকে সম্মান করে, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা করে, যা আরো জঘন্য। ঐ সকল মুশরিক ও এ মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অতএব সাবধান!

কবি শফিকুল ইসলামের কবিতায় মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

যুক্তিবাদের যুক্তিতে হায় জাহেলিয়াতের আগমন
ফের আজরের মূর্তি আবার মোদের হাতেই উত্তোলন।
সাভারের মিনার কেমনে শাহাদাতেরই সাক্ষ্য হয়?
এদেশের ভার্সিটিতে কিসের মূর্তি দেখা যায়?
যুগে যুগে এমনি করে মূর্তিপূজক এসেছে।
স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে মূর্তি ওরা গড়েছে।
মিনারে নিরবতা এই বিধান কি ইসলামের
মুসলমান নতজানু, খাম্বা দেখে সিমেন্টের।
বিশ্বে শহীদ কে আছে রে, তাদের চেয়ে সম্মানী?
বদর, ওহুদ খন্দকে যারা করল জীবন কুরবানী।
হয় না কেন মিনার তাদের, হয় না কেন অনুষ্ঠান?
মুসলমানের করছ দাবী কেমন তুমি মুসলমান!
যুক্তিবাদের যুক্তিতে হায় জাহেলিয়াতের আগমন
ফের আজরের মূর্তি আবার মোদের হাতেই উত্তোলন।

www.i-onlinemedia.net

শিখা চিরন্তন-অনির্বাণ, মশাল আর মঙ্গলপ্রদীপ এ সকল নিচ্ছে কেড়ে মুসলিমের ঈমান প্রদীপ

শহীদ মিনার সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরাই জ্বালিয়েছে শিখা অনির্বাণ। অগ্নিউপাসকদের সংস্কৃতি এখন লালন করছে মুসলিমরা। জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ এবং শিখা অনির্বাণ নামে একটি শিখা প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-এ অবস্থিত এ শিখার সামনে জাতীয় দিবসগুলোতে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়।

অথচ, প্রত্যেক জাতিই মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং শেষ কৃত্য সম্পাদন করে। কেউ মরদেহের অপমান করে না। অসম্মান করে না। তবে বোধ-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুযায়ী এ সম্মান প্রদর্শনে ও শেষ কৃত্য সম্পাদনে পার্থক্য হয়। কেউ সুগন্ধি সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে, নতুন কাপড় পড়িয়ে, সলাতে জানাযা আদায় করে দাফন করে। কেউবা গোবর ছিটিয়ে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য পন্থা শেষে অগ্নি প্রজ্বলন করে দেহকে দাহ করে ছাই-ভস্ম পানিতে নিক্ষেপ করে; কেউবা পাহাড়ে-পর্বতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়, কেউবা সেই ভস্ম নির্দিষ্ট আঁধারে সযত্নে সংরক্ষণ করে।

আবার মৃত্যুর পরে মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য, বিদেহী আত্মার সদ্গতির জন্য, প্রশান্তির জন্য কৃত কর্মকাণ্ডে জাতি ভেদে, বোধ-বিশ্বাস ভেদে পার্থক্য হয়। আমরা মুসলিম, তাই মৃতব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নিয়মসমূহ পালন করি। আবার হিন্দু ধর্মবলাম্বীরা তাদের গুরুজনের বিদেহী আত্মার সদ্গতির জন্য, প্রশান্তির জন্য হোম, যজ্ঞ, তর্পণ পিণ্ডদান ইত্যাদি করেন। দেশ, ধর্মবিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিভিন্নতার জন্য পদ্ধতি ভিন্ন হয়েছে এবং তাই স্বাভাবিক। এ পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে কেউ সম্মান করছে না, এ কথা বলা যাবে না।

কারণ, সম্মান প্রদর্শনের একটাই মাত্র পন্থা বা পদ্ধতি নয়; বহু পন্থা, বহু পদ্ধতি রয়েছে। দেশে ভেদে, জাতি ভেদে, বোধ-বিশ্বাস ভেদে এ সম্মান প্রদর্শনের পন্থা ও পদ্ধতিতে পার্থক্য হতে পারে, হয়ে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। সম্মান প্রদর্শনের পন্থা ও পদ্ধতির সাথে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের একটা সম্পর্ক আছে। ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটি সম্পর্ক আছে। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি সম্পর্ক আছে। প্রতিটি ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্মের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্রতা রক্ষার অধিকার আছে। এটা সাম্প্রদায়িকতা নয়।

কোন পদ্ধতির বিরোধিতা করা মানে মূল লক্ষ্যের বিরোধিতা করা নয়। লক্ষ্য আর উপায় তো এক নয়, তাই শিখা চিরন্তনের বিরোধিতা মানে স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা নয়। স্বাধীনতার প্রতি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধিতা নয়। যারা শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ বা প্রজ্বলিত অগ্নির মাধ্যমে বা প্রতীকে সম্মান প্রদর্শনের বিরোধিতা করছেন, তার কারণটাও ঐ পদ্ধতি।

www.i-onlinemedia.net

কিন্তু আমাদের এক শ্রেণীর আঁতেল, বুদ্ধিজীবী লক্ষ্য আর উপায়টাকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এক করে ফেলছেন। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, শহীদ আর প্রজ্বলিত আগুন বা শিখা চিরন্তন এক করে ফেলতে চাইছেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার বিরোধিতাকে, মুক্তিযুদ্ধের, শহীদদের, স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধিতা রূপেই চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। বোধ-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিভিন্নতার দরুন অনেকেই শিখা চিরন্তন বা অগ্নি প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী হতে পারেন, তাই বলে তিনি বা তারা যে স্বাধীনতার বিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী- এ কথা সত্য নয়। প্রজ্বলিত অগ্নির মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের বিরোধিতার কারণ বিশ্বাসগত, ঐতিহ্যগত, ধর্মীয়।

অগ্নিকে সম্মান প্রদর্শন বা অগ্নির মাধ্যমে অথবা অগ্নিকে প্রতীক বানিয়ে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর এ পদ্ধতিটি মুসলিমদের নয়। এটা মুসলিমদের ঈমান-আক্বীদা, বোধ-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিপন্থী। এটা পারসিক, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর বোধ-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সামঞ্জস্যশীল। এটা কারো অজানা বিষয় নয়, কম-বেশি সকলেই জানেন। যেসব লোক এর বিরোধীদের গালাগাল করছেন, তারা জানেন আরো ভালোভাবেই।

অগ্নি বা আগুন হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা। বঙ্গীয় শব্দকোষে শ্রী হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অগ্নি অগ্নি-অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে- যাহা যজ্ঞে প্রথমে প্রণীত হয়। অগ্নি ঋগবেদের দেবতাগণের অন্যতম। ইনি অমর রত্নদাতা, যজ্ঞের দেবতা হোতা ঋত্বিক সম্পাদক রক্ষাকর্তা ও হব্যবাহক। আকাশে সূর্য, বায়ুমণ্ডলে বজ্র এবং পৃথিবীতে অগ্নি- এর তিন রূপ। উপাসকরা এর প্রসাদে দীর্ঘজীবন ধন ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। খাদ্য প্রাপ্তি এবং ক্ষুধা, দৈন্য শত্রু ও বিপদ হইতে রক্ষার নিমিত্ত এর স্তব করেন। ইনি দেবগণের মুখ এবং জিহ্বা। দেবতারা অগ্নিমুখে হুতদ্রব্য ভক্ষণ ও অগ্নি জিহ্বায় যজ্ঞবহ্নি আস্বাদন করেন। পুরানে অগ্নি ধর্মপত্নী বসুর গর্ভজাত। তার পত্নী স্বাহা এবং পাবক, পদমান ও শুচি তিন পুত্র; তিন পুত্রের পঞ্চাতারিংশ্যপুত্র। পঞ্চশী ঋগবেদের ১০.৯০.১ শ্লোকে আছে, পরম পুরুষের মুখে অগ্নির জন্ম। অগ্নি দেবতার প্রতিমা হচ্ছে স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ। কেশ-শ্মশ্রু ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। শক্তি ও অক্ষ সূত্র, বাহন ছাগ। পুরানে এর অন্যান্য প্রকার মূর্তির বর্ণনা আছে। কোথাও তার তিন পা, সাত হাত, দুই মুখ এবং বালার্কের ন্যায় বর্ণ। ইনি দক্ষিণ-পূর্ব কোণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋগবেদের এক-চতুর্থাংশেরও অধিক শ্লোকে কেবল অগ্নির স্তব করা হয়েছে।[১]

প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অগ্নিদেবের পূজা হতো। এখন ভারতবর্ষের হিন্দু ও পার্সীরাই কেবল এর অর্চনা করেন।[২] তৈত্তরীয় সহিংসতায় আছে,

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, ঋগবেদের মহা ১.৫.২৩ শ্লোক, পুরানের ৬৪.১.৫.৯ শ্লোকসহ আরো অন্যান্য শ্লোক।
[২] বিস্তারিত দেখুন, বাংলা বিশ্বকোষের 'অগ্নি' অনুচ্ছেদ।

www.i-onlinemedia.net

প্রজাপতি অগ্নির সৃষ্টি করে দেবতাগণকে বিশ্রাম ভূমি স্বরূপ দান করেন। হিন্দু, পারস্য, কালডিয়া, মিসর, ইয়াহুদী, গ্রীক, রোমক, চীন প্রভৃতি সকল জাতির শাস্ত্রেই দেখা যায় যে, তাদের দেবমন্দিরে রাত-দিন অগ্নি প্রজ্বলিত থাকত।

হিন্দুদের অসংখ্য যাগযজ্ঞ আছে। যজ্ঞের জন্য হোম অপরিহার্য। হোমের জন্য অপরিহার্য অগ্নি। হোমের অর্থই হচ্ছে দেবোদ্দেশ্যে অগ্নিতে মন্ত্রপূর্বক ঘৃতাদি প্রক্ষেপ।[১] এ হোমই এ জগৎ রক্ষা ও স্থিতির মূল। হোমের সম্যক অনুষ্ঠান না করলে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি না হলে শস্য জন্মে না, শস্যের অভাবে প্রজা উৎফুল্ল হয় না, সুতরাং ক্রমে জগৎ ধ্বংস হয়ে থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হতেই পারস্যে অগ্নি উপাসনার প্রচলন ছিল। প্রাচীন পারসিকদের ধর্মগুরু ছিলেন জরাস্তর *(Zoraster)* এবং তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল জিন্দাবেস্তা। জরথুস্ত্র প্রচার করেন যে, দু'জন দেবতার দ্বারা জগতের সমুদয় মঙ্গল-অমঙ্গল সাধিত হচ্ছে। মঙ্গলের দেবতা হচ্ছেন, *'আহরমাজদ'* অথবা *'হরমজদ'* আর অমঙ্গলের দেবতা হচ্ছেন *'আহরিমান'*। মঙ্গলের দেবতা *আহরমাজদ* অগ্নিতে অবস্থান করেন। তাই মঙ্গল লাভের জন্য অনির্বাণ অগ্নিশিখার পূজা করতে হবে। পারস্যে পারসিকদের মন্দিরে যে অগ্নিশিখা স্থাপন করা হয় তা ছিল অনির্বাণ। হাজার বছরের অধিককাল ধরে তা একনাগাড়ে জ্বলে আসছিল।

সুতরাং, শহীদদের প্রতি, জাতির কৃতী সন্তানদের প্রতি, বীরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এটা পদ্ধতি নয়। অগ্নি প্রজ্বলিত করে, অগ্নিশিখা স্থাপন করে বা অগ্নি প্রতীকের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন মুসলিমদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিপন্থী। বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রায় ৯০% মুসলিম। আক্বীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণে এঁরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি রূপে খ্যাত। তাঁদের বোধ-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিপন্থী একটা পদ্ধতি জাতীয়ভাবে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা সমীচীন কি-না, তা অবশ্যই ক্ষমতাসীনদের ভেবে দেখা দরকার। এভাবে অগ্নিকে সম্মান প্রদর্শন করা এক ধরনের অতি অবাঞ্ছিত শির্ক, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটা হবে অতীতের পারসিক ধর্ম তথা মজুসীদের অনুসরণ যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশে কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি তার জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে। সংস্কৃতি কতগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মবোধ, রুচিবোধ এবং বিশ্বাসের ভিন্নতার জন্য জাতির উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রকাশ ভঙ্গিতেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। ভারতের সংখ্যাগুরু মানুষ হিন্দু। তারা বহু দেবতায় বিশ্বাস করে। তাদের সাংস্কৃতির আচার-আচরণের প্রকাশভঙ্গিও তাই বহু অবতারবাদী। বাংলাদেশের

[১] বিস্তারিত দেখুন, ঋগবেদের মনু ৩/৭/৫-৬, ৩/৮৪/৭ শ্লোক।

www.i-onlinemedia.net

সংখ্যাগুরু মুসলিম এক আল্লাহর উপাসক। সুতরাং মুসলিমদের সংস্কৃতি এবং বহু অবতারবাদী ভারতীয় সংস্কৃতি কখনো এক হতে পারে না। কিছু মানুষ স্বীকার না করলেও এটাই স্বীকৃত সত্য যে, ধর্মবোধই আমাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কল্যাণবোধ, শ্রেয়বোধ ধর্মের কারণেই জাগ্রত হয়। ধর্মের কারণেই আমরা বুঝতে পারি, কোন্‌টা শালীন বা অশালীন।

অগ্নিপূজারী ভারতীয় সংস্কৃতিতে অগ্নি কালচারের প্রাধান্য তাদের ধর্মবোধ থেকেই নিঃসৃত। ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী 'অগ্নি' হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতারূপী ভগবান। হিন্দুদের কাছে পূজা, প্রদীপ, মশাল এবং অগ্নি এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এর একটা ছাড়া অন্যটা অসম্পূর্ণ, অচল, অর্থহীন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে একটি হিন্দু সংস্থা কর্তৃক শিখা চিরন্তনে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয় এবং ঐ স্থানে 'অগ্নি দেবতার মন্দির' নির্মাণের দাবী জানানো হয়। এ দাবী তাদের খুবই প্রাসঙ্গিক।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নিকে ২০০ সুক্তে স্তব করা হয়েছে, যা দেবরাজ ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন দেবতা সম্বন্ধে করা হয়নি। ঋগ্বেদে অগ্নিকে এতই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যে, ঋগ্বেদ শুরু হয়েছে অগ্নি বন্দনা দিয়ে (১/১ সুক্ত) এবং শেষ হয়েছে অগ্নি বন্দনার মাধ্যমেই (১০/১৯১ সুক্ত)। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, অগ্নি পার্থিব দেবতাদের মধ্যে প্রধান। অগ্নি স্বর্গবাসী দেবতা এবং মর্ত্যলোকের মানবের মধ্যে যোগাযোগ বা মধ্যস্থতাকারী। অগ্নি দেবকূলের যজ্ঞের সারথি। ইনি আপন রথে দেবতাদের বহন করে যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসেন। যার ফলে অগ্নি ছাড়া কোন যজ্ঞ হয় না। কোন শুভ কাজ শুরু হয় না। চালক না থাকলে যেমন মহামন্ত্রীও কোন শুভ কাজে উপস্থিত হতে পারেন না, তেমনি অগ্নি সারথি ব্যতীত দেবতাগণও যজ্ঞস্থলে বা শুভ কাজে উপস্থিত হতে পারেন না। সে জন্য অগ্নিকে হিন্দু ধর্মে পুরোহিত বলা হয়ে থাকে। আগুনের পরশ মণি ছাড়া কোন কাজই শুভ হয় না।

প্রায় প্রতিটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু বাড়িতে তুলসী গাছের কাছে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যারতি করা হয়। মঙ্গল প্রদীপের উৎস মঙ্গল আরতি তেকেই, যা অগ্নি দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

হিন্দুদের বাহ্যপূজার আর একটা প্রধান অঙ্গ হোম। মাটিতে বালি দিয়ে একটা চতুষ্কোণ বেদী তৈরি করা হয়। সেই বেদীর মাঝখানে 'কুশ' বা খড় দিয়ে একটা পদ্ম তৈরি করে তার উপর 'ওঁ' অক্ষরটি লিখতে হয়। পরে গব্যঘৃত কর্পূর ইত্যাদির মাধ্যমে 'হোমানল' অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে, আতপ চাল, চিনি, যব-কর্পূর ইত্যাদি সহযোগে 'চরু' তৈরি করে সেই আগুনে আহুতি দিতে হয়। পরে সেই অগ্নিকে প্রণাম করে প্রার্থনা করা হয় এভাবে, 'হে মহান দেবতা অগ্নি! তুমি আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দাও। তোমার জ্যোতিতে হৃদয় পূর্ণ করে দাও। আমাদের যত কু-গ্রহ, বাইরের ও অন্তরের যত প্রবল শত্রু, তাদের তোমার হোমানলে দগ্ধ করে দাও।'

www.i-onlinemedia.net

হিন্দুদের নিকট অগ্নি সদামঙ্গলময় বিধায় তাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা-অর্চনা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অগ্নির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু কাব্য সাহিত্যেও অগ্নি এসেছে পূজার হাত ধরেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্বের গানে বহুবার পূজার সঙ্গে প্রদীপের উপমা ব্যবহার করেছেন, যেমন-

'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।'

কিংবা, 'আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।'

অথবা, 'যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে,
একে একে তারা
আকাশ পানে ছুটবে বাঁধন হারা।'

এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পূজা এবং অগ্নি সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। আগুন ছাড়া পূজা হয় না। কারণ, আগুনের রথ ছাড়া দেবতা আসেন না।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মঙ্গল প্রদীপের মধ্যে মঙ্গল অনুসন্ধান করেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস, অগ্নি দেব বহনকারী সারথি। স্বর্গের দেবতারা যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বিবাহ প্রভৃতি শুভ কাজে অগ্নি ছাড়া আবির্ভূত হতে পারেন না। এ বিশ্বাস থেকেই এসেছে রাজঘাটের গান্ধী সমাধির চিতা অনির্বাণ বা ইন্ডিয়া গেটের চিতা চিরন্তন। একই বিশ্বাস থেকে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে তারা শুভ কাজ উদ্বোধন করে থাকেন। তারা বিশ্বাস করেন, শিখা কিংবা প্রদীপের আগুনের মাধমে দেবতা মর্ত্যে আবির্ভূত হবেন এবং তিনিই কাজটিকে শুভ পথে পরিচালিত করবেন। অগ্নি দেবতার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা থেকেই ভারতে শিখা কালচারের প্রচলন হয়েছে। বাংলাদেশেও কি তবে অগ্নি দেবতার বিশ্বাস নিয়ে শিখা কালচার শুরু করা হল?

বাংলাদেশ সাড়ে ১৩ কোটির বেশি মুসলিমের দেশ। এ দেশের জগগণের জীবন চিন্তা ভিন্ন ধরনের। তারা বিশ্বাস করে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনিই একমাত্র চিরন্তন, চিরঞ্জীব, তিনিই রক্ষাকর্তা। আসমান এবং জমিনের সবকিছু একমাত্র তাঁরই। আল্লাহর সাথে যেকোন বস্তু বা প্রাণীর শরীক স্থাপনের পশ্চাদমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান।

অতএব, যারা আজ শিখা জ্বালিয়ে দেবলোকের দেবতাকে মর্ত্যে আনার চেষ্টা করছেন, মঙ্গল সারথির মতো মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে শুভ কাজ উদ্বোধন করে বাঙালিপনার কথা বলছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে কোন্ বাঙালি কালচারের কথা বলছেন? সে কি বিগ্রহ পূজারী বাঙালি, না কি আল্লাহর একত্ববাদী বাঙালি, সেটাই পরিস্কারভাবে বুঝতে হবে। এ মুসলিম জাতি জানতে চায়, এ শিখা কালচার কাদের জন্য এবং কিসের জন্য?

www.i-onlinemedia.net

আল্লাহর একত্ববাদী বাঙালি মুসলিমরা তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে না। অন্য কারো কাছে মঙ্গল (কল্যাণ) প্রত্যাশীও সে নয়। প্রতিটি মুসলিম আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং আল্লাহর প্রেরিত বাণী সম্বলিত আল-কুরআনে বিশ্বাসী। সেই কুরআনই তাদেরকে শেখায়, *'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি পরম করুণাময়, দয়াময়। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।'* যেসব মৌলিক ভিত্তির ওপর ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তার প্রধান হল আল্লাহর একত্ব, ক্ষমতা, করুণা ও সর্বোচ্চ ভালবাসার প্রতি অগাধ বিশ্বাস। যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে 'অগ্নিশিখা' কালচারকে, কিংবা কবরের মাটি দিয়ে বেদী গড়ার কালচারকে অথবা স্থাপত্যের নামে মূর্তি কালচারকে দেশের বুকে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন, তারা কি মুসলিমদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখেন না?

যে দেশের সংখ্যাগুরু মানুষ যে সংস্কৃতির ধারক, সে দেশের সংস্কৃতিও গড়ে উঠবে সেই সংখ্যাগুরু মানুষের সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংখ্যাগুরুর ওপর চাপিয়ে দিলে অন্য ব্লাড গ্রুপের রক্ত যেমন শরীর ধারণ করতে পারে না, তেমনি জাতিও বিসদৃশ সংস্কৃতি ধারণ করতে পারবে না। ফলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য।

বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মানুষ মুসলিম। মুসলিমরা অগ্নি দেবতায় বিশ্বাস করে না, তারা একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। মুসলিমরা যখন কোন শুভ কাজ শুরু করে তখন অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হয় না। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর প্রশংসা করার মাধ্যমে তাঁর কাছে কল্যাণের প্রার্থনা জ্ঞাপন ক'রে কাজ শুরু করে। মুসলিমরা ক্ষণস্থায়ী অগ্নিশিখাকে চিরন্তন মনে করতে পারে না, তাদের কাছে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বই চিরন্তন। মুসলিমরা আগুন জ্বালে অন্ধকার দূর করার জন্য এবং রান্নাবান্নার জন্য। জীবনের কোন শুভ বা কল্যাণ বয়ে আনার অলৌকিক ক্ষমতা অগ্নির কাছে, এ ধারণায় মুসলিমরা বিশ্বাস করে না।

অতএব, সার্বিক বিচারে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শিখা অনির্বাণ ও চিরন্তনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী, পৌত্তলিক চিন্তা-সঞ্জাত এবং ভারতীয় শিখা কালচার থেকে আহরিত পরাশ্রয়ী চিন্তাপ্রসূত। এ অগ্নি পূজা সম্পূর্ণ শির্ক ও আল্লাহদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনির্বাণের' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং ওগুলোর প্রজ্জ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর ওপর এগুলো স্থাপন করা হয়, অলিম্পিক মশাল সহ বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জ্বলনও শির্কের অন্তর্ভূক্ত। এ কালচারের সাথে এ দেশের মাটি ও মানুষের কোন সংস্রব নেই। বরং শিখা চিরন্তনের অগ্নিকুণ্ড যতদিন এ দেশের বুকে জ্বলতে থাকবে, ততদিন আল্লাহর একত্ববাদকে খর্ব করার, আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার অভিশপ্ত মশাল জ্বলতে থাকবে বাংলাদেশের বুকে।

www.i-onlinemedia.net

কুরআন ও সুন্নাহ'র সঠিক শিক্ষা সালাফীদের থেকেই নিতে হবে দীক্ষা

পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে একসঙ্গে খাবার খাওয়ার সময় কথা বলার মধ্যে একবার বেদম বিষম খেলো শামীম। নাকে-মুখে একাকার অবস্থা। সামাল দেয়ার জন্য যখন সে প্রাণান্ত প্রয়াসে রত, তখন শামীমের মা বললেন, 'কীরে তোকে বুঝি কেউ মনে করছে। তোর কথা বলছে।' তখনও সামলে উঠতে পারেনি সে। খাবারের এক পর্যায়ে ওর দুলাভাইকে দেখে সালাম দিল। এবার বোনের ধমক, 'খেতে খেতে সালাম দিতে নেই, সেটাও কী শহরে গিয়ে ভুলে গেছিস?' দুলাভাই তাকে *'ঠিক আছে আগে খেয়ে নাও পরে কথা হবে'* বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সচেষ্ট হলেন।

এরপর সবাই আবার খাবারে মনোনিবেশ করল। জাদীদা খাচ্ছিল চুপচাপ। ওদের সঙ্গে মামাও খাচ্ছিল। হঠাৎ ওর প্লেটের দিকে নজর পড়ল মামার। দেখে যে, প্লেটের একদিকে সামান্য একটুখানি ভাঙা। পুরনো প্লেট। জাদীদাকে উদ্দেশ্য করে বাবা বলল, 'কীরে জাদীদা বেছে বেছে তুই ভাঙা প্লেটে খাস কেন!? তোর কপালে[১] কি ভালোটি জোটে না? ভাঙা প্লেটে খেলে যে তোর কপালটাও ভাঙাই হবে। কপালে জোড়া লাগবে না।' জাদীদা অবশ্য এটা কখনো খেয়াল করেনি বা এভাবে ভেবেও দেখেনি। সে হ্যাঁ-না কিছু না বলে ফ্যালফ্যাল করে কেবল চেয়ে রইল। মামা বলল, 'দেখছিস কী আজ ওতেই সেরে ফেলো। কিন্তু কথাটা মনে রাখিস বলে দিলাম।' নিরীহ ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে জাদীদা পুনরায় খাদ্য গিলতে নিয়োজিত হল। ওর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বাকিটুকু শেষ করে উঠে পড়ল। প্লেট হাতে নিয়ে সামনে এগুতেই একটা পাতিলের সঙ্গে ওর পা ঠুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে পাতিলে হাত ছুঁয়ে তিনবার সালাম করল। বসা থেকে মামা এটা দেখে বলে, 'করিস কী, করিস কী! ধাতুর প্রাণহীন পাতিলটি কী তোর সালাম নিল, না বুঝল! তোর পা না মাথা ওটিকে ছুঁয়েছে তাও কি ওটা বুঝেছে?' জাদীদা এ সব কিছুই বুঝল না। ছোটবেলা থেকে তো এ

---

[১] ভাগ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কপাল শব্দটি মূলত হিন্দু সংস্কৃতি থেকে আমাদের মুসলিমদের বিশ্বাসে অনুপ্রবেশ করেছে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থানুযায়ী, কোন সন্তান জন্মের ৬ষ্ঠ দিনে ভাগ্যের দেবতা এসে এ শিশুটির জীবনে সংঘটিতব্য ঘটনাসমূহ অর্থাৎ হায়াত, মৃত্যু, রিযিক, ধন-দৌলত ইত্যাদি তার [শিশুটির] কপালে লিখে যায়। আর এ বিশ্বাস থেকেই প্রচলিত হয়েছে- 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডণ।' কিন্তু আমরা মুসলিম হিসেবে এ ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে লাওহে মাহফূজে, যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই ওয়াকিবহাল। তাই আমরা বলি, 'ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডণ।' অতএব, প্রতিটি মুসলিমের উচিত ভাগ্য সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনায় 'কপাল' শব্দটির ব্যবহার করা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। কারণ, সামান্য একটি মাত্র শব্দই আমাদের বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদায় আঘাত করতে যথেষ্ট।

www.i-onlinemedia.net

রকমই দেখে আসছে। দেখে যা শিখেছে তাই তো পালনীয়! এতে কি দোষ করল তা ওর মাথায় ঢুকল না।

খাবার নিয়ে এতক্ষণ যেসব নিয়মের কথা জানলাম, এগুলো দীর্ঘকাল ধরে যে এ পরিবারকে শাসন করছে তা তো নয়। আমাদের সমাজের বেশিরভাগ বাড়ির বেশিরভাগ লোকজনকেই নির্বিচারে শাসন করে চলেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মামাদেরও বাগে রেখেছে। নির্বিচারে পালনীয় এ সব আচারের সঙ্গে যুক্ত আছে কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা। হ্যাঁ, শাসন একটা মানা দরকার। সেটা হবে কোন শাসন? সেটা হবে আল্লাহ্‌র শাসন। আল্লাহ্‌র বিধান কুরআন ও সহীহ হাদীসের শাসন।

উপরোক্ত নিয়মগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, খেতে বসে মুখে খাবার রেখে কথা বললে বা তাড়াহুড়ো করে খেলে গলনালীতে খাবার আটকে যায়। তারপর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে খাবার পাকস্থলী অভিমুখে না এগিয়ে উল্টোদিকে মানে মুখের দিকে আসতে থাকে। বিষমটা তখনই লেগে যায়। সুতরাং বিষম খাওয়ার সঙ্গে কারো মনে করার কোন সম্পর্ক নেই। থাকতেও পারে না। গরীব-দুঃখী পরিবারের লোকজন ভাঙা থালায় খায় বলে এতে আবার কিসের দৈন্যের ছাপ থাকতে পারে? খাবার রান্নাবান্না করতে হাঁড়ি-পাতিলের ওপরই নির্ভর করতে হয়, এ পর্যন্তই। তাই বলে নিষ্প্রাণ পাতিলে পা লাগলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সালাম করার কোনই অর্থ নেই।

অন্যদিকে, কাককে সাধারণত অশুভ বলে মনে করা হয়। এ বিশ্বাসটি মূলত বাইবেল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কারণ বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী, পাখিদের মধ্যে শুধুমাত্র কাকই নূহ (আ:)-এর নৌকায় আরোহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। কালো রঙ মানেই ভয়ার্ত, বিপজ্জনক বা অমঙ্গল! কাক যেহেতু কালো, কুৎসিত তাই এ প্রাণীটির সবকিছুই কুৎসিত; ভাল, আনন্দ বা মঙ্গলের যোগ নেই। এমনি ধারণা থেকেই তো কাকের ডাকের সঙ্গে অমঙ্গল বা অশুভ ভাবনা যুক্ত হয়ে গিয়েছে। অথচ, চীনে কাককে সৌভাগ্যের প্রতীক রূপে গণ্য করা হয় বলে কাক হত্যা করা নিষিদ্ধ।

বিড়াল একটি আদুরে ও নিরীহ প্রাণী। মিউ মিউ করে আর এর ওর কাছে ঘুর ঘুর করে আদর পেতে চাইবে। এ প্রাণীর পা বা পেট চাটাচাটিতে কী আসে যায়, অবুঝ প্রাণী অতিথির খবর পাবে কোত্থেকে? এগুলো সবই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত হাজারো অন্ধ সংস্কারের দু-চারটা নমুনা। যুক্তিহীন সংস্কার মেনে চলায় গৌরব নেই, উন্নতিও নেই। উন্নতি কিছু আসবে এগুলো না-মানাতেই। কুরআন-সহীহ হাদীস-যুক্তি-বুদ্ধিতে পরখ করে মানামানিটা ঠিক করে নিতে পারলে নিজের এবং দেশের উন্নতি হবেই।

ইংল্যান্ডের লোকজন বিশ্বাস করে যে, কালো বিড়াল হচ্ছে সৌভাগ্য আনয়নকারী। বিশেষ করে যদি কালো বিড়াল কারো চলার পথকে অতিক্রম করে যায়। অর্থাৎ সামনে দিয়ে কোন কালো বিড়াল অতিক্রম করাকে দুর্ভাগ্য আগমনের পূর্বআলামত হিসেবে

www.i-onlinemedia.net

গণ্য করে থাকে। এ বিশ্বাসটির উৎপত্তি হয় মধ্যযুগে। তখনকার যুগে কালো বিড়ালকে লোকজন ডাইনীদের প্রাণী বলে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত যে, কালো বিড়ালের মাথার মগজের সঙ্গে ব্যাঙ, সাপ এবং পোকামাকড়ের শরীরের অংশের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ডাইনীরা যাদুর পাঁচন তৈরি করে। যাদুর পাঁচনের সংস্পর্শ ব্যতীত কোন বিড়াল সাত বছর বেঁচে থাকলে কালো বিড়ালটি ডাইনীতে রূপান্তরিত হতো বলে ধারণা করত। বিপরীত দিকে, আমেরিকাসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে কালো বিড়ালকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। আমেরিকাতে সাদা রঙের বিড়ালকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। আবার এই সাদা বিড়ালই ইংল্যান্ডে অশুভ বা দুর্ভাগ্যের প্রতীক।

কোন ব্যক্তি কোন কিছুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যখন সে চায় যে তার সৌভাগ্য যেন পরিবর্তন না হয়, তখন সে বলে 'কাঠে টোকা দাও' এবং এ সময় সে তার চতুর্দিকে খুঁজে দেখে কোন কাঠ পাওয়া যায় কি না যেখানে সে টোকা দিতে পারে। এ বিশ্বাসের উৎস বের করতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সুদূর অতীতে, যখন ইউরোপের জনগণ বিশ্বাস করত যে, দেবতারা সাধারণত গাছের মধ্যে বাস করে। গাছে বসবাসকারী দেবতার নিকট থেকে কোন অনুগ্রহ লাভ করতে তারা গাছ স্পর্শ করত। তাদের এ প্রার্থনা যদি গৃহীত হতো, তাহলে দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তারা পুনরায় গাছ স্পর্শ করত।

লবণ পড়ে গেলে বেশিরভাগ মানুষ ভাবে যে তাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বা অশুভ কিছুর আগমন অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা সেই পড়ে যাওয়া লবণকে বাম কাঁধের উপরে নিক্ষেপ করে দুর্ভাগ্যকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে। লবণ যেহেতু কোন কিছুকে তাজা রাখতে পারে, অনুরূপভাবে এটি দুর্ভাগ্য প্রতিহত করে তাদেরকে রক্ষা করবে বলে ধারণা করা হয়। লবণের আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক কার্যকারিতা শক্তির কারণে প্রাচীনকালের মানুষেরা এ বিশ্বাস করত। এভাবে লবন পড়ে যাওয়াকে কোন অশুভ আলামতের অশনি সংকেত হিসেবে ধরা হয়। আবার যেহেতু তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, শয়তানী আত্মা বা অশুভ শক্তি মানুষের বামপার্শ্বে অবস্থান করে; তাই পড়ে যাওয়া লবণ বাম কাঁধে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে সন্তুষ্ট করা হয়। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি কর্তৃক আঁকা বাইবেলে বর্ণিত শেষ নৈশ ভোজের ছবিতে দেখা যায় যে, লবনের তাকে যিশুর বিশ্বাসঘাতক জুডাস আঘাত করছিল।

অনেক মানুষ বিশ্বাস করে যে, হঠাৎ করে একটি আয়না ভেঙ্গে যাওয়া বা ফেঁটে যাওয়া বা ভাঙ্গা আয়না সাত বছরের জন্য দুর্ভাগ্য আগমনের আলামত। প্রাচীনকালের মানুষেরা মনে করত যে, পানির উপরে কোন ব্যক্তির আত্মার প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। ফলে, কেউ পানিতে ঢিল ছুঁড়লে বা অন্য কোনভাবে যদি তাদের আত্মার প্রতিবিম্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে আত্মাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর আয়না আবিষ্কারের পর থেকে এ বিশ্বাস আয়নাতে স্থানান্তরিত হয়। ধারণা করা হয়, এ বিশ্বাসটি একটি প্রাচীন

www.i-onlinemedia.net

বিশ্বাস থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এ প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী, মানুষের বা কারও বা কোন প্রাণীর প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন বা ছায়া মূলত তার আত্মার প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছুই না। অতএব যা কারো প্রতিবিম্ব বা ছায়াকে পরিবর্তন করে তা দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে পারে। এ দুভাগ্যের সময়কালের ধারণা রোমানদের নিকট থেকে আগত বলে মনে করা হয়। রোমানদের ধারণা হচ্ছে, মানুষের জীবন প্রতি সাত বছর অন্তর নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

কোন দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া মই ত্রিভুজের সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, এ মইয়ের নিচ দিয়ে হাঁটা অসম্মানজনক, অমঙ্গলজনক, অকল্যাণকর; এক কথায় অশুভ। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, ত্রিভুজ মূলত পবিত্র ত্রিত্ববাদকেই প্রতীকায়িত করে। এ অবস্থায় রাখা মইয়ের নিচে অবস্থান করার সময় কোন বিষয়ে বাঞ্ছা করা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অথবা হাত বা পায়ের আঙুল অতিক্রম করিয়ে অশুভ বা দুর্ভাগ্য থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

ডিম ও আলু মানে তো সহজে বোঝায় যায় গোল্লা, মানে শূন্য! আর কলা! কলা দেখা মানে বা দেখানো মানে তো জানই। সেটাও এক শূন্যেরই ব্যাপার। কোন পরীক্ষার আগে ডিম, কলা, আলু খাওয়া মানেই হল পরীক্ষায় গোল্লা পাওয়া! আবার কেউ সাঁতার না শিখলেও তার ব্যবস্থাপত্র আমাদের সমাজের এখানে-সেখানে সর্বত্রই পাওয়া যায়। ছোট পিঁপড়া কোনভাবে খেতে পারলে অবশ্যই সাঁতার শিখতে বেগ পেতে হবে না। তাছাড়া, পচা বা পোক ধরা ফল খেলেও তাড়াতাড়ি সাঁতার শেখা যায়।

এগুলো নিয়ম বলে চলে আসলেও বস্তুত অনিয়ম বৈ কিছু নয়। এ সব নিয়মের অসারতা একটু পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই ধরা পড়ে। পিঁপড়ে ভালো সাঁতারু বলে তা খেয়ে সাঁতার শেখা যাবে এমন কথা নেই। কারণ মানুষ তো কত পাখি খায় তার জীবনে, কিন্তু কেউ কি আকাশে ওড়া শিখেছে? পচা ফল বা পোকা-ফল খেলে সাঁতার শেখা যাবে এমন কোন কথা নেই। ডিম ও আলুর আকৃতি শূন্যের মতো বলে ফলাফল শূন্য জুটবে, তা কী কোন কথা হল? কলার সঙ্গে শূন্য লাভের কী সম্পর্ক!

মূলত এ সব যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞানহীন অন্ধ-অসার ধারণা বা বিশ্বাস। পুরোনো আমলের ভ্রান্ত ধারণা। এমনই অনেক অচল ধারণা সচল রয়েছে আমাদের সমাজে কেবল ওহীর সত্য জ্ঞানের অভাবে। এ ধরনের সচল নিয়মগুলো অচল করা শুধু নয়, বাতিলই করতে হবে আজ, এখনই। সে জন্য আমাদের সকলকে ওহীর অমোঘ বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাঠ নিতে হবে। চেতনাটা সহীহ আক্বীদার কষ্টি পাথরে যাচাই-বাছাই করতে হবে।

www.i-onlinemedia.net

লটারি-জুয়া-হাউজি
সবই হল হারাম পুঁজি

লেগে যাবার সম্ভাবনার কথা শুনি আমরা। ভাগ্য ভাল হলে অথবা ভাগ্যে থাকলে না লেগে যাবে কোথায়? বলা হয় এ রকমও, 'কপাল যদি না হয় ফাঁকা, ঘুরতে পারে ভাগ্যের চাকা।' চাকা থাকলে তো ঘুরবেই। যদি তাকে আটকে না রাখা হয়। আর যদি কপাল বলে কিছু থাকে এবং তারও যদি চাকা থাকে তাহলে তার না ঘুরে উপায় কী! কপাল যে কারো ফাঁকা- এ অপবাদ তো কেউ মাথা পেতে নিতে চাইবেন না। কপাল ফাঁকা, মাথা ফাঁকা- এগুলো মানব জীবনের জন্য খুব খারাপ ব্যাপার বলে মনে করা হয়। সুতরাং কপাল ফাঁকা অর্থাৎ ভাগ্যহীন অলক্ষ্মী (!?) বলে পরিচিত হতে চাইবেন না কেউ। কপাল পরিপূর্ণ না হোক ফাঁকা নয় কারো। এম কপালে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারে বৈকি!

কপাল ফাঁকা না হলে, ভাগ্য সহায় হলে লটারি কুপনের ক্রেতা রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে পারেন। পেয়ে যেতে পারেন তিনি কয়েক লক্ষ টাকার পুরস্কার।

আমরা জুয়া খেলার কথা জানি। খেলাটা দেখেছিও অনেকে, গোল রঙচঙে বোর্ড। তার পুরোটা জুড়ে আঁকা থাকে বিভিন্ন জিনিসের ছবি। ঠিক মাঝ বরাবর থাকে চারদিকে ঘুরতে থাকা একটা তীর। তীরটিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। কোন জুয়াড়ীর ধরা নম্বরে তীর আটকালে সে হয় বিজয়ী। দেখা যায়, একটি জুয়ার বোর্ডে ৩০ থেকে ৪০টি ঘর থাকে। এক একটি ঘরে এক একটি চবি বা নম্বর আঁকা থাকে। একজন যখন জুয়ার বোর্ডে বাজী ধরে তখন তার বাজীতে জেতার সম্ভাবনা থাকে ৪০ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ নিতান্তই সামান্য।

লটারিতে পুরস্কার জেতার ব্যাপারটিও অনেকটা একই রকম। কী রকম! ব্যাপারটি খতিয়ে দেখলে লটারিকে জুয়া খেলা বলে সবাই মেনে নিতে কোনই দ্বিধা করবেন না। জুয়া খেলার তো বোর্ডে ঘর থাকে ৪০টি। আর লটারির কুপন ছাড়া হয় কয়েক কোটি। হয়তো প্রথম পুরস্কার ৫০ লক্ষ, দ্বিতীয় ৪০ লক্ষ, তৃতীয় ৩০ লক্ষ টাকা এবং সবগুলো মিলে হয়তো আরো ৫০ লক্ষ টাকার পুরস্কার। সব মিলিয়ে হয়তো ২ কোটি টাকার পুরস্কার। এছাড়া কুপন ছাপা, প্রচার চালানো ও অন্যান্য খাতে খরচ করে ১০ লক্ষ টাকা। এই মাত্র দুই, আড়াই বা তিন কোটি টাকা খরচ হয় একেকটি লটারি পরিচালনায়। লটারি যারা করে সেই সংস্থা তো খরচ বাদ দিয়ে কিছু লাভ করবেই। সেই হিসেবে হয়তো পাঁচ কোটি টাকার কুপন বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। একটি কুপনের দাম যদি ১০ টাকা হয়, তাহলে মোট কুপন ছাড়া হয় হয়তো ৫০ লক্ষ। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে, একজন একটি কুপন কিনলে তার পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা হয় ৫০ লক্ষের এক ভাগ। দুটো কিনলে ৫০ লক্ষের দুই ভাগ। এভাবে ১০টি কুপনে সম্ভাবনা ৫০ লক্ষের ১০ ভাগ।

www.i-onlinemedia.net

এখন দেখা যাক, লটারির কুপন কেনে কারা। সচরাচর যারা নিজের অবস্থা বদলাতে চান কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। যারা উচ্চাশা পোষণকারী, যেকোনভাবে রাতারাতি অবস্থা বদলে ফেলতে চান- তারাই কেনেন লটারির কুপন। অর্থাৎ গরিব অথবা স্বল্পআয়ের লোকজনই কুপনের অধিক ক্রেতা। নিজেদের জীবনে উন্নতি ঘটানোর জন্য লটারির আশ্রয় নেন তারা। লটারির প্রচারে যে ভাষায় লোভ দেখানো হয়, তাতে তারা বশীভূত হন। আর এরা যদি একবার সামান্য টাকার পুরস্কার পেয়েও যান তাহলে তো কথাই নেই। লোভে লোভে বার বার কুপন কেনার প্রতিযোগিতা চালাবেন। অনেক মানুষকে দেখা যায়, মাস শেষে বেতন হাতে পেয়ে প্রথমেই দু'-পাঁচটি লটারির কুপন কিনে ফেলেন। ভাগ্যের ফের ফেরাতে সহজ-সরল, সাধারণ মানুষ লটারির কুপন কিনে এভাবে প্রতারিত হয়েই চলেছেন।

www.i-onlinemedia.net

যারা বলে দাঁতের পোকা আসলে তারা বানায় বোকা

শহরের রাস্তাঘাটে, বাস, ট্রেন, লঞ্চে বা গ্রামের হাট-বাজারে দাঁতের মাজন বিক্রেতাদের দেখা যায়। 'পোকালাগা' দাঁতের ফুটো থেকে তারা 'পোকা' বের করে আনে। পোকা বের করা ও দাঁত ভাল রাখার জন্য তাদের মাজন অব্যর্থ বলে দাবী করে। বিক্রির সময় গোল হয়ে দাঁড়ানো লোকজনের মুখে মাজন লাগিয়ে কিছু পরে তারা পোকা বের করে এনে দেখায়। এ তো গেল মাজনওয়ালার কথা। এ ছাড়া, আমাদের সমাজে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের পেশা দাঁতের পোকা তোলা। গাছের ডাল বা শেকড় দিয়ে কিভাবে জানি দাঁত থেকে পোকা বের করে আনে। এ মানুষদের চেনেন অনেকে। নৌকার বহর সাজিয়ে নদীতে ভাসমান জীবন যাপন করেন এরা। ভাসতে ভাসতে কোন চর বা ভাললাগা গ্রামে গিয়ে নৌকার সারি ভেড়ায়। কিছুদিন এ তীর ঘিরেই এদের জীবন শুরু হয়। বেদে বলে পরিচিত এ মানুষদের অনেকে দাঁতের পোকা বাছা, দাঁতের অসুখ সারানো- এগুলো কাজ করেন। ঝোলা কাঁধে ফেলে গ্রামের পথ-ঘাটে হেঁটে-হেঁকে বেড়ায়, 'দাঁ-তের পোকা বাছা, পোকা তোলা।'

দাঁতের পোকা বের করার যে দু'শ্রেণীর লোকের কথা বললাম, এরা লেখাপড়া না-জানা অসচেতন মানুষ। কেউ মাজন দিয়ে আর কেউ গাছ-গাছড়ার সাহায্যে পোকা তোলেন। কিন্তু আধুনিক দাঁতের ডাক্তাররা কখনোই পোকার কথা বলেন না। পোকা বের করার কথাও তারা বলেন না কখনো। আসলে পোকা আছে বলেই তারা স্বীকার করেন না। দাঁতে যে কখনো পোকা হতে পারে, এটা তারা বিশ্বাসই করতে চান না। তাহলে কি দাঁতের পোকা বলে কিছু নেই! পোকা নিয়ে যে এত কাণ্ড তার সবই কি তবে মিথ্যা, বানানো কথা এগুলো!

আসলে কিন্তু তাই। দাঁতের পোকা নিয়ে যত কথা তার সবই বানানো। মিথ্যা কল্পকাহিনী। এর মধ্যে একবিন্দুও সত্য নেই। দাঁতে কখনো পোকা হয় না। তবে হ্যাঁ, আস্ত দাঁতে গর্ত হয় ঠিকই। এ গর্তের মধ্যে ব্যথা হয়। কখনো কখনো এ ব্যথা এত বেশি হয় যে, একে বলা হয় দাঁতে পোকা লেগে কামড় দিচ্ছে। তো এই গর্ত ও যন্ত্রণা হওয়া- এ সব কিন্তু পোকার কাজ নয়। এর কারণ ভিন্ন। এর কারণ হল এসিড বা অম্ল। বিভিন্ন কারণে দাঁতে এসিড হলে ধীরে ধীরে গর্ত হয়। গর্ত থেকে পরে ব্যথার সৃষ্টি হয়।

আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি এর মধ্যে অনেকবারই ভাতসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই। খাওয়ার পর খাবারের ছোট ছোট টুকরো বা কণা দাঁতের ফাঁকে বা আশপাশে লেগে থাকে। খাওয়ার পর ভালভাবে মুখ পরিষ্কার না করার জন্য এগুলো থেকে যায়। আমাদের মুখের ভেতরে আছে জীবাণু। দাঁতের ক্ষতি করে এই এসিড। দাঁতের

www.i-onlinemedia.net

ওপরের দিকে যে ঝকমকে সাদা অংশ থাকে তার নাম এনামেল। ভেতরের নরম অংশকে পাতলা পর্দার এনামেল রক্ষা করে। শক্ত জিনিস খাওয়ার শক্তিও যোগায় এনামেল। এসিড দাঁতের জন্য খুব অপকারী। এই এনামেল নষ্ট করে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে এসিড। ফলে দাঁতের শক্তি কমে যায়। ঝকঝকে ভাবটা দূর করে দেয়। এতে দাঁতে ক্ষয় ধরে। ক্ষয় হতে হতে একসময় দাঁতে ফুটো তৈরি হয়ে যায়। দাঁতে যদি এনামেলের ওপর নোংড়া লাল বা হলুদ পর্দা জমে, তবে এসিড তৈরি হয় খুব তাড়াতাড়ি। প্রথমে কিন্তু এ সবের কিছুই টের পাওয়া যায় না। পরে যখন ক্ষয়টা বেশি হয়ে দাঁত ফুটো হয় তখন বোঝা যায়। কারণ, তখন ব্যথা শুরু হয়ে যায়। খাবারের কণা বা পান-সিগারেটের যে নোংড়া দাগ তা এসিডকে টেনে ধরে রাখে।

চিনি জাতীয় খাবার, চকলেট, আইসক্রীম এগুলো যেহেতু আঠালো জিনিস তাই এতে এসিড হয় বেশি। এখন এ জাতীয় খাবার আমরা হরহামেশা খাই বলে দাঁতের ক্ষয়ও হয় বেশি। আগে এ ধরনের খাবারের চল তেমন ছিল না বলে দাঁতের ক্ষয় বা রোগও তেমন বেশি হয়নি।

দাঁতের এ ক্ষয়রোগ থেকে মুক্ত থেকে দাঁতকে শক্ত ও সতেজ রাখার উপায় কি? প্রাথমিকভাবে উপায় দুটো:

১.প্রতিদিন খাবারের পর খুব ভালো করে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করতে হবে, যাতে খাদ্যকণা কোনভাবেই দাঁতে লেগে থাকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিষ্কার করা দরকার।

২.যে খাবারগুলো আঠালো এবং ওপরে লেগে গিয়ে দাঁতকে ময়লা নোংড়া করে, এমন খাবার কম খাওয়া। মিষ্টি বা চিনি দিয়ে বানানো খাবার, পান, সিগারেট, তামাক ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া, কোথাও কোথাও পানিতে আয়রন (লোহা) ও লবণের ভাগ বেশি থাকে। এমন পানিও দাঁতের ক্ষতি করে। খাবার পানি সবসময় আগুনে ফুটিয়ে খেলে দাঁতের তেমন ক্ষতি হয় না।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম, দাঁতের পোকা বলে কিছু নেই। দাঁতে কখনো পোকা হয় না। দাঁতে যে গর্ত বা ব্যথা হয় সেজন্য পোকা দায়ী নয়। আসলে আমরা দাঁত সম্পর্কে খুব কম জানি বা খোঁজখবর কম রাখি। এ না-জানার সুযোগ নিয়ে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ দিব্যি ঠকিয়ে চলেছে আমাদের। আমাদের অজ্ঞানতা, অসচেতনতা ও কুসংস্কারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা ঠকিয়ে উপার্জন করছে।

অনেক সময়ই দেখা যায়, ওই মাজনওয়ালা বা বেদেরা মানুষকে ধরে তার মুখ থেকে পোকা বের করে। এ পোকা কোত্থেকে আসে এ প্রশ্ন হয়তো অনেকের। এটা আসলে হাতসাফাই বা ম্যাজিক। জাদুকররা হাতসাফাই করে খালি হাতে কত কি-ই না দেখান! খালি কলসী নিমেষে পানিতে ভরে ফেলেন। খালি পকেটে টাকা ভরিয়ে দেখান। এগুলো যদি সম্ভব হয় তবে দু'চারটে পোকা হাতের তালুতে এনে দেখানো খুব কঠিন কি! পুরনো চাল, পচা ফল বা গোবরের তাল থেকে পোকা সংগ্রহ করে এনে

www.i-onlinemedia.net

আগেভাগেই তারা আঙ্গুলের ফাঁকে লুকিয়ে রাখেন। আর এ পোকাগুলো মুখ থেকে বের করে আনার ভান করে দাঁতে লবঙ্গের তেল লাগিয়ে দেন। লবঙ্গের তেল কিছু সময়ের জন্য ব্যথা দূর করে। এক একজন একেকভাবে এ প্রতারণার খেলা দেখিয়ে মানুষকে বোকা বানান।

প্রতারণার আরেকটা পদ্ধতিও আছে। কুমড়োর শক্ত বিচির ওপরের পর্দা ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলা হয়। বিচির ভেতরের নরম শাঁসটাকে চিকন করে কুচি কুচি করে টুকরো করা হয়। টুকরোগুলো রোদে শুকিয়ে দাঁতের মাজনের শিশির মধ্যে মিশিয়ে রাস্তায়-বাজারে মাজন বিক্রি করতে লেগে যায় মাজনওয়ালা। দাঁতের ব্যথায় ভুগছে এমন লোকজন ধরে মাজন লাগাতে দিয়ে দেয় শিশি থেকে। দু'পাঁচ মিনিট পর থুথু ফেলতে বলেন। সাথে সাথে বলে, 'এবার দেখুন, আমার মাজন কিভাবে পোকা ধরে বের করে আনছে।' কুমড়ো বিচির টুকরাগুলো থুথুর সাথে বের হয়ে এলে এগুলোই পোকা বলে সবাইকে ধোঁকা দেন। বিচির টুকরোগুলো মুখের মধ্যে থেকে রসালো হওয়াতে একটু ফুলে ওঠে। থুথুর মধ্যে এগুলো ফুলতে থাকে বলে মনে হয় যে, নড়াচড়া করছে। ব্যস, এগুলো আর দাঁতের পোকা না হয় কি করে!

আমাদের সমাজে এভাবে ভেল্কি দেখিয়ে, হাতসাফাই করে মানুষকে বোকা বানিয়ে কতই না লোক বেশ রুজি রোজগার করছে! এ জন্য দায়ী আমাদের অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর অন্ধবিশ্বাস।

আর প্রতারণার কথা বলতে গেলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, কত রকমের প্রতারণাই না ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে। গেঁথে আছে এগুলো আমাদের বোধে, বিশ্বাসে, চিন্তায়। মানুষের বিচার-বুদ্ধি পেছন অতীতে খুব কম ছিল। সবকিছু যাচাই-বাছাই করে তখন মানুষ দেখতে-বুঝতে শেখেনি। সে সময় সমাজের একশ্রেণীর স্বার্থপর মানুষ এগুলোর প্রচলন করেছে। নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখার কারণে প্রতারণার দুষ্টবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে। এর অনেক ধারণাই তারা ধর্মের সাথে সংযুক্ত করে পরিবেশন করেছে মনুষ্য সমাজে। এভাবে অনেক প্রতারণাপূর্ণ ধ্যান-ধারণা ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার সাথে মিলেমিশে যুগযুগ ধরে সচল রয়েছে আমাদের সমাজে।

www.i-onlinemedia.net

আমাদের সমাজে প্রচলিত শির্ক

আমাদের বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর তথা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে শির্ক, বিদ'আত ও নানাবিধ কুসংস্কার। কুসংস্কারজনিত এমন শির্ক রয়েছে যা এ সব দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে, সে সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১. **আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাসঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর অতি প্রাকৃতিক জগতের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে এবং অতিপ্রকৃতি-অবস্তুগত কিংবা অলৌকিকভাবে কাউকে সাহায্য করতে বা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে বলে বিশ্বাস করা। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিকভাবেই কোন ঘটনা সংঘটিত করতে, বিপদগ্রস্থকে সাহায্য, রোজগারহীনকে রোজগার, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহলে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।

২. **জ্যোতির্বিদ্যাঃ** জ্যোতির্বিদ্যা হল সৌরজগতের বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। জ্যোতির্বিদরা বলে থাকে যে, অমুক নক্ষত্রের অমুক স্থানে অবস্থানের সময়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার অমুক অমুক জিনিস অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের অমুক জায়গায় অবস্থানের ক্ষণে সফরে থাকবে সে ভাগ্যবান কিংবা এ ধরনের ভাগ্যহীন হবে। যেমন- বর্তমানে বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের অর্থহীন-আজগুবি খবরাখবর পরিবেশন করা হয়, আর এগুলোর আশে-পাশে বিক্ষিপ্ত তারকারাজি সরলরেখা, বক্ররেখা ইত্যাদি ধরনের আঁকা-বাঁকা রেখা অংকিত থাকে। কিছু সংখ্যক মূর্খ ও নিম্ন শ্রেণীর ঈমানদার ব্যক্তিও বিভিন্ন সময় জ্যোতিষদের নিকট গমন করে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে থাকে।

৩. **ভবিষ্যদ্বাণী করাঃ** জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে, ক্রিস্টাল বল থিওরির মাধ্যমে, কম্পিউটার প্রোগ্র্যামের মাধ্যমে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ করে আগামী দিনের বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং এ-সব ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করা।

৪. **রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব দ্রব্য দ্বারা নির্মিত আংটি বা বালা পরিধান করাঃ** আমাদের দেশের রাজধানী সহ বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে এবং বড় বড় পাইকারী বাজারে এমন কিছু ব্যবসায়ের দোকান পাওয়া যায়, যারা ধাতব নির্মিত (যেমন, অষ্ট ধাতুর) আংটি বা বালা বিক্রি করে থাকে। অনেক লোকদেরকে তা বাত রোগ নিরাময়, যেকোন উদ্দেশ্য সফল হওয়া, শনি ও

www.i-onlinemedia.net

মঙ্গল গ্রহের কৃদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য বিশেষ উপকারী বিশ্বাস করে আংগুলে ও হাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাইরে কোন বস্তুই নিজস্ব গুণে কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী হতে পারে না। এতে রোগীর অন্তরে ধাতব বস্তুর প্রতি উপকারী হওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বস্তুর উপর ভরসা করা হয়। তাই কোন বস্তুকে কোন ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী বলা বা এ ধারণা করে তা ব্যবহার করা।

৫. **জ্বিন বা অপর কোন রোগের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে তা'বীজ ব্যবহার করাঃ** জ্বিনের অশুভ দৃষ্টি এবং বিভিন্ন রোগের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা'বীজ ব্যবহার একটা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সকল ধরনের তা'বীজ ব্যবহার করা শির্ক।

৬. **আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কোন মানুষের মত ও পথের অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণ করাঃ** সাধারণ মানুষের মতো অনেক জ্ঞানী লোকেরাও নিজেদের অজান্তেই অথবা জেনেশুনে অনুসরণের বৈধ সীমারেখা লঙ্ঘন করে চলেছেন। সাধারণ লোকজন অন্ধভাবে তাদের পীর-ফকীরদের এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেম নিজ মাযহাবের নিঃশর্ত ও নির্বিচার অনুসরণ করেন। এমনকি কোন বিষয়ে নিজের পীর, ইমাম বা মাযহাবে প্রচলিত আমলের ত্রুটি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও বিভিন্ন অনর্থক যুক্তি-তর্ক দাঁড় করিয়ে তারা স্বীয় পীর, ইমামের মত বা মাযহাবের অনুসরণ করেন। এ ধরনের আচরণ মূলত আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

৭. **মাযার স্পর্শ করা, শরীর মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া, কবরের মাটি বরকতের নিয়তে নিয়ে তাবীজে ভরে গলায় বাঁধা, গায়ে মালিশ করা, রওজা শরীফ, মাযার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, তা'জীম করাঃ** বিপদাপদ, বালা-মুসীবাত থেকে বাঁচার জন্যে ঘর-বাড়িতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের জন্যে দোকান, অফিস, হোটেলে ছবি রেখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে এগুলো করা।

৮. **কবর ধোয়া পানিঃ** মাযারকে মাঝে মাঝে মহা ধুমধামের সাথে গোসল করানো হয়। আর এ কবর ধোয়া পানি লোকেরা শিশিতে বা বোতলে যে যেভাবে পারে নিয়ে যাওয়া এবং নেক মাকসূদ পূরণের উদ্দেশ্যে পান করা।

৯. **মাযারের গিলাফের তা'জীমঃ** বিভিন্ন পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে বা কবরের ওপরে আজকাল গিলাফ পড়ানো হয়। নির্দিষ্ট সময় পরপর এ গিলাফ পরিবর্তন করে আবার নতুন গিলাফ পরানো হয়। পুরানো গিলাফ অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়। অজ্ঞ, অশিক্ষিত মানুষ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষ এ সব গিলাফে চুমু খায়, গিলাফ ধরে ফরিয়াদ জানায়,

www.i-onlinemedia.net

আদবের সাথে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ গিলাফের সুতা তাবীজে ভরে গলায় বাঁধে। এমনকি অনেকেই আরো একধাপ এগিয়ে গিলাফের কাছেই দু'আ চেয়ে বসে।

১০. **খাজা বাবার ডেগঃ** একদল লোক বিশেষত যুবকেরা রজব মাস এলেই পথে-ঘাটে, বাজারে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই একটা ডেগ বা বড় হাড়ি বসায়। লালসালু কাপড় বিছিয়ে, বাঁশ দিয়ে ছাউনি দিয়ে, বিজলী বাতি জ্বালিয়ে, চকমকি কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ'।

১১. **কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরঃ** শুধু কবর বা মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে 'শারঈ সফর' করা। এমনকি শুধু রাসূলে রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সফর করা।

১২. **প্রাণীর ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদির হুকুমঃ** কোন নেতা, লিডার বা স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ ইত্যাদি করা।

১৩. **তাসাওউফের শায়েখ বা পীরের কল্পনাঃ** তাসাওউফের শায়খ বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মোরাকাবা, ধ্যান, জিকির বা অন্য যেকোন 'ইবাদাত করা।

১৪. **পীরকে নাযাতদাতা মনে করাঃ** অনেকের ধারণা পীর তাকে জান্নাত পাইয়ে দিবে।

১৫. **পীরকে দূর হতে ডাকাঃ** অনেকে স্বীয় পীর বা কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে বহুদূর হতে ডাকে এবং মনে করে যে, তিনি এটা জানতে ও শুনতে পারছেন। অনেক সময় 'ইয়া গাওসুল আযম', 'ইয়া খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী' ইত্যাদি বলে ডাকতে থাকে এবং নিজেদের ফরিয়াদ ও আরজি পেশ করতে থাকে।

১৬. **পীরের জন্য ঘর সাজিয়ে রাখাঃ** কিছু সংখ্যক পীরের অনুসারীদের মধ্যে দেখা যায়, তারা তাদের বাড়ির মধ্যে একটি ঘর পীরের জন্য সারা বছর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। একটা বড় খাটের ওপর চাদর বিছিয়ে বড় বড় কয়েকটা কোল বালিশ সেট করে 'বিশেষ আসন' তৈরি করা হয়। পীরের ছবিকে মালা পরিয়ে সযত্নে ঐ ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। ফুল ও জরি দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো হয়। সারা বছর ঐ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। মাঝে মাঝে মুরিদরা ঐ ঘরে ঢুকে ছবি ও আসনের সামনে আদবের সাথে চুপ করে বসে থাকে।

www.i-onlinemedia.net

১৭. **পীরের বাড়ির বা আস্তানার খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল, মাছ ও কচ্ছপ ইত্যাদির প্রতি অন্ধ সম্মান:** অনেককে দেখা যায়, পীরের বা মাযারের খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে যায়। এগুলোর সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে অবার এ সব গরু, কুকুর, বিড়ালের পা ধরে বসে থাকে নেক মাকসূদ পূরণের জন্য।

১৮. **পীর, ওলী-আওলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোম বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা:** এ ধরনের কর্ম আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে আউলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোমবাতি অনেক উপকারী মহৌষধ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সাথে বাড়িতে নিয়ে যেয়ে তা ব্যবহার করে থাকেন এবং এর দ্বারা কোন রোগ মুক্তি হলে তা কবরস্থ ব্যক্তির দান বা তাঁর ফয়েয বলে মনে করে থাকেন, অথচ এমন মাটি ও মোমকে উপকারী মনে করা।

১৯. **গায়রুল্লাহর নামে জিকির বা অযীফা:** আল্লাহ্‌র জিকিরের ন্যায় কোন নবী বা রাসূল, পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গ, আলিমের নাম জপ করা, বিপদের পড়লে তাদের নামের অযীফা পড়া। যেমন- 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন', 'ইয়া রাসূলুল্লাহ', 'নূরে রাসূল নূরে খোদা', 'হক বাবা হক বাবা' ইত্যাদি।

২০. **খালি পায়ে মাযারে বা পীরের বাড়িতে:** কারো কারো ধারণা মাযারে বা পীরের গ্রামে বা পীরের বাড়ির সীমানার মধ্যে জুতো ছাড়া খালি পায়ে হাটা।

২১. **কামেল পীরের গোনাহ নেই:** 'খোদা পাক, কামেল পীরও পাক। তাদের কোন গোনাহ নেই। তারা নিষ্পাপ।'- এ ধরনের কথা বলা।

২২. **পীরের পায়ে সিজদা করা বা পীরের পা চাটা:** সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পীরের পায়ে সিজদা করা বা নেক মাকসূদ পুরণের জন্যে, রোগমুক্তির নিয়তে পীরের পা চাটা, পায়ে চুমু খাওয়া, গাড়ি চাটা, গাড়িতে চুমু খাওয়া, ব্যবহার্য থালাবাটি বা অন্য কোন বস্তু চাটা বা চুমু খাওয়া, মাযার চাটা বা চুমু খাওয়া।

২৩. **আল্লাহ্‌র যাতের সাথে মিশে যাওয়া:** অনেকের ধারণা মুরিদ যখন 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে আল্লাহ্‌র যাতের সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় এবং তাঁর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। খাওয়া, ঘুম, স্ত্রী সহবাস সহ যাবতীয় কাজকর্ম তখন আর নিজস্ব থাকে না। এগুলো সব আল্লাহ্‌র হয়ে যায় অর্থাৎ এ সব কাজ তার রূপে আল্লাহ নিজেই করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

২৪. **আল্লাহ যা করান, তাই করি:** একদল ফকীর বলে, 'আল্লাহ যা করান, তা-ই করি। আল্লাহ সলাত আদায় করান না, তাই আদায় করি না , আল্লাহ গাঁজা টানাচ্ছে, তাই টানি। তাকদীরে সলাত থাকলে তো আদায় করব।'

www.i-onlinemedia.net

২৫. **দিলে দিলে নামাজ পড়ি:** অনেক পীর সাহেবানরা সলাত, সাওমের ধার ধারে না; কিন্তু খুব সাধনা করে! দু'-তিন দিন পর পর একটু খায়। কম কথা বলে। লোকজনের সাথে কম মিশে। দিনের বেশিরভাগ সময় চুপ করে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। এরা বলে বেড়ায়, 'আমরা দিলে দিলে নাজাজ পড়ি। তোমরা মাত্র ৫ ওয়াক্ত পড়, আর আমরা সারা দিন-রাতই নামাজ পড়ি।'

২৬. **সীনায় সীনায় মারফতী:** পীর বা দরবেশ দাবীদার একদল বলে থাকে, 'কুরআন শরীফ মোট ৪০ পারা। ৩০ পারায় জাহেরী ইলমের বিষয় আছে। বাকি ১০ পারা মারফতী বিদ্যায় ভরা রয়েছে। এ ১০ পারা আমরা সীনায় সীনায় পেয়েছি। শরীয়তের আলেমরা এগুলোর খবরও রাখে না।'

২৭. **শরীয়তের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরয নয়:** অনেকের ধারণা, মুরীদ যখন মারেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য শরীয়তের হুকুম-আহকাম, সলাত, সাওম ইত্যাদি মাফ হয়ে যায়।

২৮. **শির্কের গন্ধযুক্ত নাম বা সম্বোধন:** যে সকল নাম বা সম্বোধনে শির্কের সংস্পর্শ পাওয়া যায়, সেগুলোকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির নাম সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির নামের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখত। যেমন- আবদে শামস্ বা সূর্যের গোলাম, আবদে মানাফ বা মানাফের গোলাম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ধরনের নাম রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

২৯. **শির্কের গন্ধযুক্ত উপাধী:** পীর বা ওলীকে এমন কোন উপাধীতে সম্বোধন করা উচিত নয় যা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। যেমন- গাউসূল 'আযম (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নেওয়াজ (গরীবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কোশা (যার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়), কাইয়ূমে জামান (যামানা কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি।

৩০. **সন্তানের নামকরণে নবী ও পীর-আওলিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন:** গোলাম মোস্তফা (মোস্তফার গোলাম), আব্দুন্নবী (নবীর দাস), আব্দুর রাসূল, আলী বখস্ (আলী (রাঃ)-এর দান), হোসেন বখস্ (হুসাইন (রাঃ)-এর দান), পীর বখস্ (পীরের দান), মাদার[১] বখস্ (মাদারের দান), গোলাম মহিউদ্দীন (পীর মহিউদ্দীনের গোলাম), আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম), গোলাম সাকলায়েন ইত্যাদি নাম রাখা।

৩১. **বিপদে পড়লে জ্বিন, ফেরেশতা, পীর, ওলী-আওলিয়াদের ডাকা বা আহ্বান করা:** দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ, পীর ও মাযার পূজারী অনেক লোককে দেখা

[১] *'মাদার'-কে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের হিন্দুরা বড় ঋষি বলে জানে।*

www.i-onlinemedia.net

যায় বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে পীর, ওলী, জ্বিন ও ফেরেশতাদের আহ্বান করতে থাকে। যেমন- 'ইয়া গাওসূল 'আযম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী', 'ইয়া খাজা বাবা', 'ইয়া সুলতানুল আওলিয়া', 'হে পীর কেবলাজান', 'হে জ্বিন',... আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে বিপদ হতে বাঁচান, আমার মাকসূদ পুরা করুন, সন্তান দিন ইত্যাদি। কোন কোন মূর্খলোক বালা মুসীবাতের সময় বুযুর্গ লোকদের উদ্দেশ্যে দু'আ করে, ফরিয়াদ জানায়। এভাবে গাইরুল্লাহকে ডাকা এবং তাদের কাছে নিজের ফরিয়াদ ও আরজি পেশ করা, তা কাছ থেকে হোক আর দূর থেকেই হোক।

৩২. **কোন সমস্যায় জ্বিনকে ডাকা:** কোন সমস্যায় জ্বিনকে ডাকানো, জ্বিনের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি।

৩৩. **পীর, ওলী-আওলিয়াদের স্মৃতিচিহ্নের তা'যীম করা এবং এদের কাছে গায়েবী সাহায্য চাওয়া:** অনেকে পীর, ওলী-আওলিয়াদের স্মৃতি চিহ্নকে এমন তা'যীম করে যে তা শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পীর হয়তো কোন গাছের নীচে বসতেন, বিশ্রাম করতেন বা তায়াম্মুমের জন্য কোন পাথর ব্যবহার করতেন। পীরের মৃত্যুর পর মুরীদরা ঐ গাছ বা পাথরের গোড়ায় আগরবাতি, মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালায়, মিলাদ পড়ায়, বিপদ মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানায়। খানজাহান আলীর মাযারের পুকুরে কুমীর আছে, চট্টগ্রামে কথিত বায়েজীদ বোস্তামীর মাযারে কচ্ছপ আছে। আবার কোন কোন জায়গায় গজার মাছ, জালালী কবুতর ইত্যাদি পীর-ওলীদের স্মৃতি বহন করছে বলে মানুষের বিশ্বাস। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষেরা মাযারের ব্যবসাদার খাদেমদের খপ্পরে পড়ে এ সব কচ্ছপ, গজার মাছ, কুমীর, জালালী কবুতর ইত্যাদিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মনে ক'রে এদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তু পূজাস্বরূপ নিয়ে যায় এবং এদের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়।

৩৪. **বাচ্চা কখন নেবেন?:** আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে প্রায়ই এরূপ কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যায়- 'বাচ্চা কখন নেবেন? বিয়ের পর পর বাচ্চা নিলে জীবনটা উপভোগ (Enjoy) করা যায় না, তাই কমপক্ষে বিয়ের ৪/৫ বছর পর বাচ্চা নেয়া উচিত। আর দ্বিতীয় বাচ্চা ৫/৭ বছরের ব্যবধানে নেয়া উচিত। আমরা দু'টার বেশি বাচ্চা নেব না।'... ইত্যাদি। এ ধরনের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যেন বাচ্চা নিজের ইচ্ছামতো বা খেয়াল-খুশীমতো আগে-পরে যখন-তখন নেয়া যায়, নিজের ইচ্ছেমতো ১/২/৩ টা এরূপ সংখ্যাও নির্ধারণ করা যায়; এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যেন কোন ক্ষমতাই নেই!

৩৫. **কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট গায়েবী সাহায্য পাওয়া:** আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির নিকটে রোগ, বিপদমুক্তি, রিযিক, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি চাওয়া।

www.i-onlinemedia.net

৩৬. **মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন:** সিলভা, কোয়ান্টাম বা অন্য কোন মেথডের (পদ্ধতি) দ্বারা মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জন করার কথা বলা।

৩৭. **কপালে টাকা স্পর্শ করে তা সম্মান করা:** টাকা-পয়সা মানুষের সম্পদ। তা মানুষের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সে হিসেবে টাকা-পয়সা মানুষের খাদিম। মানুষ টাকার খাদিম বা গোলাম নয়। সম্পদের সম্মান হচ্ছে তাকে সংরক্ষণ করা, তাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান না করা। পায়ের নিচে ফেলে এটাকে দলিত-মথিত না করা। মাথা ও কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হয় এবং তাঁকে সম্মান জানানো হয়। তাই কপালে টাকা স্পর্শ করে টাকাকে সম্মান করা বা 'Money is the Second God' বলা টাকাকে পূজা করারই শামিল। এ কাজটি অনেক মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি হলেই তারা এ কাজটি করে থাকে।[১]

৩৮. **গ্রহ নক্ষত্রের তা'ছীর (প্রভাব):** অনেকের ধারণা মানুষের ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে হয়। কেউ বিপদে পড়লে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির ওপর শনি গ্রহের প্রভাব পড়েছে'। কারো আনন্দের খবর শুনলে বলা হয়ে থাকে, 'এ ব্যক্তি মঙ্গল গ্রহের নজরে সু নজরে আছে'।

৩৯. **চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব:** অনেকের ধারণা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৪০. **নব জাতকের জন্য:** নব জাতকের হাতে চামড়ার চিকন তার বা তাগা বা গাছ বা এ ধরনের অন্য কোন কিছু চুড়ির মতো করে বেঁধে দেয়া হয় যাতে কোন অশুভ রোগ-বালাই বা বদ জ্বিন-ভূত স্পর্শ করতে না পারে। আবার নবজাত শিশুকে জ্বিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চার কানে ছিদ্র করা, বাচ্চার বালিশের নিচে জুতার টুকরা রাখা অথবা শিশুর মাথার চুল না কাটা। চোখের দৃষ্টি বা চোখ লাগা থেকে শিশুসন্তানকে রক্ষার জন্য সন্তানের গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা, কপালে কালো টিপ বা দাগ দেয়া।

৪১. **গায়রুল্লাহ্‌র নামে কসম করা:** আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্‌র নামে কসম করল, সে কুফরী করল অথবা শির্‌ক করল।'[২] মূলত, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নামে

---

[১] ড. মুযযাম্মিল আলী, *শির্‌ক কী ও কেন, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৩৫০।*

[২] *এ হাদীসটি সহীহ। জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৩৫; মুসতাদরাক হাকীম, ১/১৮।*

www.i-onlinemedia.net

কসম করলে কসম হয় না। কসম করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কুসংস্কার রয়েছে। যেমন কসম করার জন্য আমরা বলি- আমার বাপ-মায়ের কিরা (শপথ), আমার পুত্রের কসম, খাজা বাবার কসম, বদর পীরের দোহাই, ল্যাংটার দোহাই, এই তোর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, বিদ্যা ছুঁয়ে বললাম, তিন সত্যি করলাম, রাসূলুল্লাহ্‌র কসম, কা'বা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, নিজ যৌবনের কসম, নিজ হাত-পা'র কসম, আগুনের কসম, রক্তের কসম, খাদ্যদ্রব্যের কসম, নিজের বাপের কসম, নিজের মায়ের কসম, নিজের সন্তানের কসম, নিজ প্রিয়জনের কসম, তোমার মায়ের কসম, তোমার কসম, নিজের বিদ্যার কসম, পশ্চিম দিকে মুখ করে বলছি, বই মাথায় নিয়ে বা বিদ্যার উপর হাত দিয়ে বলছি, তোমার গা, মাথা বা হাত ছুঁয়ে বলছি ইত্যাদি। ইত্যাদি। এ ধরনের কসমের কোনটাই ঠিক নয়, এগুলো শির্কযুক্ত কুসংস্কার।

৪২. **উকীল, মধ্যস্থতাকারী, শাফা'আতকারী, সুপারিশকারী:** যারা কোন জীবিত বা মৃত আলিম, পীর, ওলী, বুযুর্গের কাছে গায়েবী সাহায্য চায়, তারা এভাবে ওযর পেশ করে- 'আমরা পাপী, পাপীর দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না। তাই এ সকল বুযুর্গ ব্যক্তিরা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবেন।'

৪৩. **আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির অসীলা গ্রহণ:** আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার আমার কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা।

আরও কিছু প্রচলিত শির্ক:

১. শরী'আত প্রবর্তন ও হালাল-হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্যের আছে বলা।

২. 'আল্লাহ আর এই পোষা কুকুরটি না হলে আজ রাতে আমার বাড়িতে চুরি হয়ে যেত।', 'আল্লাহ এবং আপনি না হলে আজকে মহা অঘটন ঘটে যেত।'- এ ধরনের কথা বলা।

৩. আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার ন্যায় পীর, ওলী-আওলিয়াদেরকে ভালবাসা।

৪. ওলিগণকে আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ও শাফা'আতকারী হিসেবে মনে করা।

৫. বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা, যেমন- সুলায়মানী নকশা, ইয়াহুদীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিদ্যা তথা কুরআনের আয়াতসমূহ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা, বিভিন্ন নবী, ফেরেশতা, ওলী, জ্বিন ইত্যাদির নাম দ্বারা তাবীয-কবচ তৈরি করা বা ব্যবহার করা।

www.i-onlinemedia.net

৬. আওলিয়াদের কবর থেকে বরকত লাভ ও রোগ মুক্তির জন্য সন্তানদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের গায়ে মাযারের পানি ছিটানো ও পান করানো।
৭. মৃত্যুর পর ওলিগণ রূহানী শক্তিবলে অনেক কিছু করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।
৮. দু'আ গৃহীত হওয়ার জন্য মুরশিদ, পীর ও ওলিদের মাযারের দিকে মুখ করে দু'আ করা।
৯. আওলিয়াদের মাযারে অবস্থান করে তাঁদের বাতেনী ফয়েয হাসিল করা এবং তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাওয়া।
১০. আওলিয়াদের কবরের উপর অথবা পার্শ্ববর্তী স্থানে উৎপন্ন বা লাগানো গাছের শিকড়, ফল ও পাতার মাধ্যমে বরকত ও বিবিধ কল্যাণ লাভ করা যায় বলে মনে করা।
১১. আওলিয়াগণ নিজস্ব মর্যাদা বলে আল্লাহর কোন পূর্বানুমতি ব্যতীত তাঁদের ভক্তদের জন্য শাফা'আত করে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করা।
১২. ওলিগণের মধ্যে যারা গাউছ ও কুতুব তারা পৃথিবী পরিচালনা করেন বলে বিশ্বাস করা।
১৩. আওলিয়াদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বিনয় প্রকাশ করা।
১৪. কবরের পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা।
১৫. রাসূল (ﷺ)-এর অতিভক্তি করতে যেয়ে তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে এমন সব কথা-বার্তা বলা, যা তাঁকে আল্লাহ ও প্রতিপালকের মর্যাদায় উন্নীত করে।
১৬. কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিরবে দাঁড়িয়ে থাকা।
১৭. মাযারের পুকুর, দিঘি ও কূপের পানি পান করে এবং মাছ, কচ্ছপ ও কুমীরকে খাবার দিয়ে রোগ মুক্তি ও বরকত কামনা করা।
১৮. দুধের গাভী ও নতুন বাচ্চার গলায় তা'বীজ, জুতা ও জালের টুকরা ঝুলানো।
১৯. স্বামীকে বাধ্য করার জন্য গোপনে ঘরের চুলা, বিছানা, বালিশ বা অন্য কোথাও তা'বীজ রাখা।
২০. পত্র লেখার সময় আল্লাহ্‌র রহমত ও পত্র প্রাপকের দু'আকে সম-মর্যাদাবান করে এমনটি বলা যে, 'আমি আল্লাহর রহমতে ও আপনার দু'আয় ভাল আছি।'
২১. চোখের কুদৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য মাটির পাত্রের পিঠে চুনা লেপ দিয়ে তা ক্ষেতে রেখে দেয়া।

www.i-onlinemedia.net

২২. কারো নামে ছেলের নাক-কান ছিদ্র, আংটি পরানো, চুল রাখা, টিকি রাখা ইত্যাদি।

২৩. কোন দিকে যাত্রা করার সময় ঘরের দুয়ারে 'মা খাকি' বলে বিদায় গ্রহণ করা।

২৪. কোন জিনিসের রোগ বা পীড়ার ছুত লাগে বলে বিশ্বাস করা।

২৫. কলেরা, দাদ, একজিমা, এইডস, প্লেগ ও যক্ষা ইত্যাদি রোগকে 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংক্রামক রোগ' হতে পারে এমনটি না বলে কথায় ও লেখনিতে এগুলোকে শুধু সংক্রামক রোগ বলা।

২৬. কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তাঁর রহমতে কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী এমনটি না বলে সরাসরি সে বস্তুকেই উপকারী বা অপকারী বলা। যেমন, 'নাপা ট্যাবলেট জ্বর সারানোর জন্য উপকারী' বা 'অমুক ঔষধ এ রোগ সারানোতে উপকারী'-এ ধরনের কথা বলা।

২৭. কোন ঔষধ খেয়ে আল্লাহ্‌র রহমতে রোগ সেরেছে এমনটি না বলে অমুক ঔষধ খেয়ে আমার রোগ সেরেছে এমনটি বলা। যেমন, এ রকম কথা বলা যে, 'নাপা খেয়ে আমার জ্বর সেরেছে।'

২৮. তেমাথা পথে ভেট দেয়া, পূজা উপলক্ষে কাজ-কর্ম বন্ধ রাখা, দোল পূজায় আবির মাখানো, বিষকর্ম পূজায় ছাতু খাওয়া, পৌষ মাস সংক্রান্তিতে গরু দৌড়ানো, ঘোড়া দৌড়ানো, আশ্বিন মাস সংক্রান্তিতে গাশ্চি[১], গোফাগুনে পূজা উপলক্ষে আমোদ উৎসব, নতুন কাপড় ক্রয়, পার্বনী দেয়া, মনসা পূজা উপলক্ষে নৌকা দৌড়ানো, হিন্দুদের আড়ঙ্গে, মিছিলে, উৎসবে যাওয়া।

২৯. পহেলা বৈশাখে হিন্দুদের অনুসরণে সিঁদুর, তিলক, হলুদ শাড়ী, ধূতি পড়ে 'এসো হে বৈশাখ' গান গেয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে, পান্তা-ইলিশ খেয়ে হিন্দুদের দেবদেবীর প্রতিমূর্তি নিয়ে মিছিল করে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করা।

৩০. কাউকে 'পরম পূজনীয়' সম্বোধন করে লেখা, 'কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না' বলা, 'জয়কালী নেগাহবান' ইত্যাদি বলা।

৩১. আল্লাহ্‌র হুকুম ছেড়ে অন্য কারো আদেশ বা সামাজিক প্রথা পালন করা।

৩২. কোন কাজ সমাধা করার জন্য অনেকে আল্লাহ্‌র প্রতি পরোয়া বা ভরসা না করে নেতৃবৃন্দ, ধনাঢ্য ব্যক্তি, রাজ কর্মচারী ইত্যাদি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট ধর্ণা দিয়ে বলে, 'এ কাজে আপনি আমার একমাত্র ভরসা', 'আপনি বাঁচাতে

---

[১] *এটাকে গারোভাতও বলা হয়ে থাকে। হিন্দুদের অনুসরণে দেশের গ্রামাঞ্চলের মুসলিম কৃষকদের মাঝে এ প্রথার প্রচলন রয়েছে। হিন্দুরা তাদের লক্ষ্মী (হিন্দুদের ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী) মা এর পূজার জন্য আশ্বিন মাসের শেষ দিনে এ ভাত তৈরি করে কার্তিক মাসের প্রথম দিনে তা ভক্ষণ করে। মুসলমানরা যেহেতু হিন্দুদের অনুসরণে তা করে, তাই উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্নতর হলেও তা মুসলমান কর্তৃক লক্ষ্মী মা এর পূজারই শামিল।*

www.i-onlinemedia.net

পারেন, মারতে পারেন', 'আপনার হিল্লাতেই টিকে আছি', 'আপনি ছাড়া তো উপায় নেই', 'পৃথিবীতে আপনি ছাড়া আমাকে দেখবার আর কেউ নেই', 'আপনার সুদৃষ্টি ছাড়া চলার কি পথ আছে', 'উপরে আল্লাহ নীচে আপনি' ইত্যাদি যাবতীয় বক্তব্য এবং সেই সঙ্গে তাদের নিকট আকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয় করা, কুর্ণিশ করা, করজোড় করা, ফুলের মালা দেয়া, অভিনন্দন ও প্রশংসা করার মাধ্যমে এবং নত মস্তকে চোখের পানির দ্বারা স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আল্লাহ হতেও অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো ইত্যাদি।

৩৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সলাত আদায় করা, সাওম পালন করা, দান করা, যাকাত দেয়া ইত্যাদি।

৩৪. ধন, বিদ্যা, সুখ-সম্পদ, আপদ-বিপদ, যুগ, কাল ইত্যাদি কোন দেবদেবী যথা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, কলি ইত্যাদির প্রতি আরোপ করা।

৩৫. দেবদেবীর সাথে কাউকে তুলনা করা, যেমন- লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী বউ, লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী বাবা, ঘরের লক্ষ্মী, মণির দশা, কলিকাল, মহাদেবের দোহাই, দেখতে একটা দেবতার বা দেবীর মতো, ঠিক দেবীর মতোই সুন্দরী প্রভৃতি বলা।

৩৬. কাউকে জ্বিন, ভূত, প্রেত ধরেছে সন্দেহে ঐগুলো দূর করার জন্য গরু, মুরগী, হাঁস, বকরী ইত্যাদি ভেট (ভোগ) দেয়া।

৩৭. হিন্দুদের উৎসব বা পূজার দিনকে সম্মান করা, হিন্দুর কালীবাড়ীর মেলার দিনের বা মেলার সম্মানার্থে বা মেলার সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে যোগদান করা অথবা তাদের অনুসরণে কিছু করা। অনুরূপভাবে, খৃষ্টানদের উৎসব ও ধর্মীয় দিন, যেমন- ক্রিস্টমাস ডে (বড়দিন), ভ্যালেন্টাইন ডে (ভালবাসা দিবস), থার্টি ফাস্ট নাইট ইত্যাদি উদ্‌যাপনের জন্য তাদের সাথে যোগদান করা, আনন্দ করা, সহযোগিতা কল্পে, সম্মানার্থে বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি কল্পে কাজ করা।

৩৮. 'অমুক আমাকে বাঁচাল' বা 'অমুক আমার/আমাদের সর্বনাশ করল' এরূপ বলা।

৩৯. যদি কেউ উঠতে-বসতে মনে করে যে, 'অমুক পীর বা নবী আমার সব অবস্থা দেখছে, শুনছে ও জানতে পারছে; আমার কোন বিষয়ই তার নিকট গোপন থাকে না।'

৪০. পীর, অলী, আলেম, নবীকে ডাকার সময় 'হে মা'বুদ (হে একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য), বেপরওয়া খোদাওন্দ (পরম প্রভু), মালিকুল মুলক শাহানশাহ- এ ধরনের আল্লাহ তা'আলার গুণ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করা।

৪১. কেউ যদি বলে অমুক লোক অমুক পীর/ওলীর ক্রোধে পড়ে পাগল হয়েছে, অমুক ওলী/দরবেশকে অসন্তুষ্ট করেছিল বলেই অমুকের এত দুর্দশা হয়েছিল, অমুকে দয়াতে অমুকে জিতেছে, ঐ কাজটা অমুক দিন অমুক সময়ে আরম্ভ করা হয়েছিল বলেই ভাল হয়েছে বা বিগড়ে গিয়েছে।

www.i-onlinemedia.net

৪২. আল্লাহ তা'আলা অধিকাংশ জনগণের রায়ের মাধ্যমে ক্ষমতা দান ও তা ছিনিয়ে নেয়ার মালিক হওয়া সত্ত্বেও কথায় ও লেখনিতে 'দেশের জনগণকে ক্ষমতার মালিক' ও 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এরূপ মনে করা।
৪৩. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত।
৪৪. কার্যকারণের সহায়তা গ্রহণ করা ও এর দ্বারাই কাজ সম্পাদনের বিশ্বাস।
৪৫. পাশা, তীর, টিয়াপাখি ইত্যাদির সাহায্যে ভাগ্য জানতে চাওয়া। ফালনামা, খাবনামা, তালেনামা, কুরআন থেকে ফাল নেয়া।
৪৬. হস্তরেখা গণনা, যাদুবিদ্যা, রাশিচক্র, ১০০% গ্যারান্টিতে রোগমুক্তির কথা বলা।
৪৭. চেহারা দেখেই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়া।
৪৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা, কবর-মাযার সিজদা করা।
৪৯. সালাম দেয়ার সময় ঝুঁকা (এমনকি সামান্য মাথা ঝুঁকানোও) অথবা কারো সম্মানার্থে মাথা নত, সিজদা ও কদমবুসী করা।
৫০. কারো সামনে মূর্তিবৎ হাতজোড় করে দাঁড়ানো ও বসে থাকা।
৫১. পীর/ওলীর নামে গাড়ি, বাড়ি, দোকানের নাম রাখা, মাল উঠাতে 'ইয়া আলী', 'ইয়া নবী', 'ইয়া রাসূল' ইত্যাদি বলা।
৫২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দু'আ বা প্রার্থনা জ্ঞাপন করা।
৫৩. নিজ ইচ্ছায় ছেলে-মেয়ে জন্ম, হুজুর/পীর/ওলী/দরবেশের দু'আয় সন্তান লাভ বলা।
৫৪. গায়রুল্লাহর নামে মানত করা (যেমন- কবর, মাযার, দরবার ও মুকামে মানত করা), আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশুপালন।
৫৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ বা কুরবানী করা।
৫৬. শির্ক-কুফর যুক্ত ঝাড়ফুঁক, তা'বীয-তুমার ও কবচ বাঁধা।
৫৭. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ওপর নির্ভর করা।
৫৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করা বা অন্য কারো কাছে আশা করা।
৫৯. যিকিরের সময় পীর/ওলী/নবী/রাসূলের কলবের অসীলা গ্রহণ।
৬০. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ে অংশীদার স্থাপন করা।
৬১. রূহানী শক্তিবলে মুশকিল আসান, খাজা বাবার দু'আর কথা বলা।
৬২. নিজের বা অপরের ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা থাকার কথা বলা।
৬৩. রত্ন-পাথরের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন, পীরের অন্ধ আনুগত্য করা।
৬৪. কবর ও মাযার পূজা, মাযারে ফুল (পুষ্পস্তবক) অর্পণ, গিলাফ জড়ানো ও বাতি জ্বালানো।
৬৫. কবরে আযান দেয়া, কবরে পীরের শাজরা, জামা, পাগড়ী বা অন্য বস্তু রাখা।
৬৬. চাল পড়া, আয়না পড়া, কুরআন ঘোরানো, তুলা রাশির মাধ্যমে চোর ধরা।

www.i-onlinemedia.net

Contents-1 Contents-2

৬৭. গ্যারান্টি দিয়ে কলব জারী, আল্লাহ শুধু বাতেনী অবস্থা দেখবেন।
৬৮. কবরকে সামনে রেখে সলাত, কবরকে তাওয়াফ, কবরে মশারী টাঙানো।
৬৯. মাযারো টাকা দেয়া, পীর/ওলী/নবী/রাসূলকে হাযির-নাযির জানা।

শির্ক সম্পর্কে সর্বদা মনে রাখার মতো কথা হল

১. জীবন বিপন্ন হলেও শির্ক করা যাবে না,
২. শির্কের পাপের কোন ক্ষমা নেই,
৩. শির্কের পরিণতি ধ্বংস,
৪. শির্ক সমস্ত নেক 'আমলকে বিকল করে দেয়,
৫. মুশরিকরা চির জাহান্নামী,
৬. মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ,
৭. শির্ক মিশ্রিত ঈমান কখনোই ঈমান হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়,
৮. শির্ক অতি সন্তর্পণে আগমন করে।

সুতরাং, শির্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার নিকটে প্রাণখুলে দু'আ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। রাসূল (ﷺ) শির্ক হতে বাঁচার জন্য আমাদেরকে দু'আ শিখিয়েছেন:

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ

'আল্লাহুম্মা ইন্না না'ঊযুবিকা আন নুশরিকা শাই'আন না'লামুহ, ওয়া নাসতাগফিরুকা লিমা লা না'লামুহ।'

(হে আল্লাহ্, জেনে বুঝে শির্ক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি; এবং আমাদের অজ্ঞাত শির্ক থেকে আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি।)[১]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছোট-বড় সকল প্রকার শির্ক হ'তে রক্ষা করুন, আমীন!

[১] *আহমাদ ও আত্ব-ত্বাবারানী কর্তৃক সংগৃহীত।*

www.i-onlinemedia.net

শির্‌কের ক্ষতিকর প্রভাব

মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শির্‌কের অনেক অনিষ্টকর দিক রয়েছে। শির্‌ক মানুষের সম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে এবং সামর্থকে নীচু করে দেয়। তার মর্যাদাকেও নীচু করে দেয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খলীফা হিসেবে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাকে সম্মানিত করেছেন। তার অনুগত করে দিয়েছেন যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে। তাকে এ জগতের সকলের ওপর নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সে তার অবস্থাকে ভুলে গেছে। ফলে, সে এ জগতের কোন কোন জিনিসকে ইলাহ্ ও মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। তার কাছে নিজেকে ছোট করে ও অপমানিত হয়। এর থেকে অসম্মানের জিনিস আর কি হতে পারে। আজ কত মুসলিম যে মৃত মানুষের কবরের চারপাশে ঝাঁক ধরে বসে আছে। তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করছে। অথচ তারাও তাদের মতোই আল্লাহর দাস। না তারা নিজেদের উপকার করতে পারে, আর না ক্ষতি করতে পারে। এ মৃত মানুষেরা নিজেদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি জীবিতাবস্থায়। তাহলে কেমন করে অপরের কষ্ট দূর করবে এখন মৃত্যুর পর। শির্‌কের কারণে আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে অসংখ্য ভ্রান্ত কুসংস্কার ও বাতিল রেওয়াজের অনুপ্রবেশ ঘটে। কারণ, যে মনে করে এ জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভাব আছে, যেমন- গ্রহ, নক্ষত্র, জ্বিন-ভূত, নশ্বর আত্মা ইত্যাদি; তার বুদ্ধি এমন হয়ে যায় যে, সে সমস্ত কুসংস্কারকে গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায়। তার মাথায় কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং সমস্ত বাজে বাজে কথা ও কাজকে গ্রহণ করতে থাকে, ফলে সমল দিক হতেই সে ভয় পেতে শুরু করে। কারণ, সে নানা মাবুদের ওপর ভরসা করতে শিখেছে। এর ফলে, যেখানে শির্‌ক চলতে থাকে সেখানে কোন প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই নানা ধরনের কুসংস্কার ও ভয় প্রকাশ পেতে থাকে। এ অধ্যয়ে মানুষের জীবনে শির্‌কের ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হল।

ব্যক্তিজীবনে শির্‌কের ক্ষতিকর প্রভাব

শির্‌কের কারণে ব্যক্তিজীবনে যে কুফল দেখা দেয় এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. শির্‌ক মানুষকে বিশ্বাসী হতে বাধা দেয়:

মানুষের ব্যক্তিজীবনে শির্‌কের সবচেয়ে বড় কুফল, মানুষকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্‌ক করার কারণে কেউ মুসলিম থাকতে পারে না। সম্পূর্ণ শির্‌কমুক্ত হয়েই একজন মানুষকে কালিমার ঘোষণা দিতে হয়। এ ঘোষণাই তাকে মুমিন হিসেবে গণ্য করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে তার চিন্তা ও কর্মের সকল পর্যায়ে শির্‌কমুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

www.i-onlinemedia.net

২. ব্যক্তির স্বকীয়তা বিনষ্ট করে:

শির্ক করার কারণে মানুষের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়। এর অভাবে মানুষ স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষমতা হারায়, হয়ে ওঠে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। অথচ সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে যে স্বাধীনচেতা মনোভাব বিদ্যমান, আজকের পীর ও খানকা ব্যবস্থা তা বিলুপ্ত করে। অন্ধ আনুগত্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মুরীদদের সেভাবে তালিম দিয়ে থাকে। এ ব্যাবস্থার মাধ্যমে সমাজে অতিভক্তি ও অন্ধ আনুগত্যের প্রসার ঘটে। এ ভ্রান্ত ধারণা থেকেই বর্তমান মুসলিম সমাজে 'তবারুক'-এর নামে মাযার, পুকুরের মাছ, পানি, জীব-জানোয়ার ইত্যাদিকে ভক্তি করে। সেখানকার মাটি, পানি, ময়লা ইত্যাদি সংগ্রহ করা ও পবিত্র মনে করা, এগুলোতে রোগ-ব্যাধি ভাল হবে ইত্যাদি বিশ্বাস করা হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিশ্বাস পোষণকারী সামাজিক জীবনে স্থবির প্রকৃতির হয়ে থাকে। পরিবার ও সমাজে তারা দায়িত্বহীন জীবন-যাপন করে।

৩. ব্যক্তির বিকাশ ও সৃজনশীলতা বিনষ্ট করে:

ব্যক্তিত্ববোধ ও সৃজনশীলতা একজন মানুষের অন্যতম সম্পদ। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব অনেকাংশে এর উপর নির্ভরশীল। পরিবার ও সমাজে ব্যক্তিত্বের কারণেই মানুষের কথা ও কাজের গ্রহণযোগ্যতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং এর অভাবে মানুষ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আর সৃজনশীলতা মানুষের অন্যতম মহৎ গুণ। যোগ্যতার কারণে পৃথিবীর সকল বৈষয়িক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। একজন মানুষ শির্কে লিপ্ত হওয়ার ফলে সর্বপ্রথম তার এ গুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। সে আল্লাহ ছাড়া সৃষ্ট যেকোন সৃষ্টিকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর মুক্ত চিন্তা করার অভ্যাস বিনষ্টের কারণে সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা ও ক্ষমতা এক পর্যায়ে তাদের থেকে একেবারেই লোপ পায়।

৪. ব্যক্তির মানসিক স্থিতি ও দৃঢ়তা বিনষ্ট করে:

শির্কের কারণে মানুষের মানসিক সুস্থ্যতা ও দৃঢ়তা অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একজন মুশরিককে অনেকের সন্তুষ্টি বিধান করে মুক্তির নিশ্চয়তা লাভ করতে সর্বদা উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হয়। আর মানুষের সামর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে এটা তার জন্য অসম্ভব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার পক্ষে মানসিক স্থিতি ও দৃঢ়তা অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৫. ব্যক্তির অন্ধত্ব ও গোঁড়ামী বৃদ্ধি করে:

শির্ক মানুষের জীবনে অন্ধত্ব ও গোঁড়ামী বৃদ্ধি করে। বিবেকবান মানুষ হিসেবে সত্য গ্রহণের যে উদারতা থাকা অপরিহার্য তা ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুসারীদেরকে আনুগত্যের নামে বিভ্রান্ত করে পীর বা কর্তৃপক্ষের গোলামে পরিণত করা হয়। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মতোই তাঁদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়। *'নিজ পীর ব্যতীত কাউকে শ্রেষ্ঠ মনে*

www.i-onlinemedia.net

না করা, তা নিয়ে চিন্তা করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা' হচ্ছে অধিকাংশ পীর ও খানকার অন্যতম প্রথম সবক। এ ছাড়া *'পীরের সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি'* তালিম বলে দেয়া হয়। পীর সাহেব সকল সমালোচনা উর্দ্ধে। তাঁর কোন ভুল দেখলেও তা বলা যাবে না, তা আদবের খেলাফ। দরবারে বিনা অনুমতিতে কথা বলা বা কোন কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি নফল ইবাদাতও পীরের অনুমতি ছাড়া করা যাবে না শিখানো হয়।

৬. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করে:

শির্কের কারণে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। ইসলামের নামে, ধর্মের নামে এ অবক্ষয় চলতে থাকে। এক সময় আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ব-কর্তব্যের যথাযথ তালিম বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে শির্ক ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশের কারণে উক্ত বিষয় শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে।

৭. মানুষকে সৎ আমল বিমুখ করে:

শির্কের কারণে মানুষের মাঝে সৎ কাজ করার মানসিকতা লোপ পায়। কেননা, মানুষ সৎ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মুক্তি প্রত্যাশায়। কিন্তু মানুষ যখন সামান্য ক'টাকার ফুল-ফল, চাল-ডাল, গরু-ছাগল ইত্যাদি হাদিয়া-তোহফা বা নযল-নিয়ায দ্বারা কোন বিকল্প সত্তাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মুক্তির নিশ্চয়তা পায়, তখন সৎ কাজ করার কষ্ট স্বীকার করে না। এটাকে তারা বিশেষ সুযোগ চিন্তা করে একদিকে পাপকাজ অব্যাহত রেখে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়; অন্যদিকে অর্থ-সম্পদ পীর-মুর্শীদ ও মাযার-খানকায় অকাতরে দান করে মুক্তির নিশ্চয়তা লাভ করে। ফলে তারা ব্যক্তিগত আমল ছেড়ে পীর-মুর্শীদ ও কবরের খিদমতে লেগে যায়।

৮. দ্বীনি জ্ঞান চর্চার মানসিকতা বিনষ্ট করে:

শির্ক মানুষের মাঝে অন্ধ আনুগত্যের প্রবণতা সৃষ্টি করে, পীরের মুরীদদের মধ্যে এ আনুগত্যবোধ সবচেয়ে বেশি। তারা কেবল লক্ষ্য করে কথা বা নির্দেশটি পীর সাহেব দিয়েছেন কি-না? এ কথা কুরআন ও সহীহ হাদীস সমর্থিত কি-না তাদের কাছে এ প্রশ্ন ভয়ানক বেয়াদবীর শামিল। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের ৯৯% খানকায় জ্ঞান চর্চার কোন ব্যবস্থা নেই, নেই কোন নির্দেশনা; আছে কেবল কিছু অজিফা ও যিকির আজকারের তালিম এবং নির্দেশনা। আর মাযারে এর কোনটিই নেই। ফলে মানুষের দ্বীন চর্চার মানসিকতা বিনষ্ট হয়ে যায়।

৯. পারিবারিক জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে:

এ সকল শির্কের উৎসমূলক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতকারী অধিকাংশ মানুষের পারিবারিক জীবন সুন্দর হয় না, নানা সমস্যায় মোহাবিষ্ট হয়ে তারা ঠিকমতো পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এ কারণে তাদের পরিবার ও কর্মস্থলে

www.i-onlinemedia.net

বিশৃংখলা দেখা দেয়। এমনকি পারিবারিক জীবনে অনেকের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটে যায়।

১০. ভোগের মোহ বাড়িয়ে দেয়:

অবৈধ অর্থবিত্ত মানুষকে দিকভ্রষ্ট করে, পথচ্যুত করে, সুস্থ্য চিন্তা ও কর্মের দ্বার করে চির রুদ্ধ। মানুষ সৃজনশীলতা হারিয়ে গতিহীন নদীর মতো হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের বর্তমান মাযার ও খানকা কর্তৃপক্ষ অনাশ্রমলব্ধ অর্থ-সম্পদ দ্বারা খুব কম সময়েই বিত্তের পাহাড় গড়ে তোলে। অবৈধ সমৃদ্ধির ফলে কর্তৃপক্ষ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। অনেক সময়ই তারা শরীয়ত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হয়। ঐ পীরের আওলাদদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের জীবন ও সংস্কৃতির আনুগত্য ও মুহাব্বত বেশি থাকলেও *'তিনি মুর্শীদ ও পীর বাবার আওলাদ'* এ হিসেবেই তিনি নিরংকুশ ভালবাসার পাত্র হয়ে যান।

ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে শির্কের ক্ষতিকর প্রভাব:

মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের আচরিত কর্মকাণ্ডকে ঘিরেই আমাদের সামাজিক জীবন পরিচালিত হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যখন শির্কের কারণে কলুষিত হয়ে ওঠে, তখন তার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনেও নানা কুফল প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১. মানুষের সামাজিক জীবন বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে:

শির্কী বিশ্বাস ও কর্ম মানুষের জন্য কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না। এর অন্যতম একটি হল, সমাজের মানুষের চিন্তা ও কর্মে অনৈক্য সৃষ্টি করে তাদেরকে বহুদলে বিভক্ত করে। আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এ বিষয়টি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাযার আমাদের সামাজিক কাঠামোকে বহুধাবিভক্ত করেছে।

২. সামাজিক শৃংখলা বিনষ্ট করে:

আমাদের দেশের মানুষ সরলমনা ও ধর্মপ্রাণ। তারা শির্কী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত নয়। বরং সমাজ ব্যবস্থা আংশিক হলেও মসজিদকেন্দ্রীক। এ দেশের প্রতিটি জনপদেই আযানের ধ্বনি পৌঁছে প্রতিনিয়ত। তাওহীদের সাথে সমাজের মানুষের পরিচয় অনেক পুরনো। বর্তমান সময়ে দ্বীন পালনে গাফলতি বা উদাসীনতা অনেক মুসলিমের মধ্যেই রয়েছে। এমতাবস্থায় মাযার খানকার ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের দিকে নানা কৌশলে মানুষকে প্রলুব্ধ করার ফলে দেশের প্রায় প্রতিটি সমাজে বিশৃংখলার সূত্রপাত হয়েছে, যা সামাজিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে, বিনষ্ট করছে সামাজিক বন্ধন।

৩. মানব সমাজে যুলুম বৃদ্ধি করে:

শির্ককে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় যুলুম বলে অভিহিত করেছেন। তাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শির্ক কখনোই মানুষের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে

www.i-onlinemedia.net

না, পারেনি। কুরআনের এ ঘোষণাকে মানব সভ্যতার ইতিহাস অস্বীকার করতে পারেনি; বরং এটাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, যখন যে সমাজে এ ঘৃণ্য আক্বীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তখন সে সমাজে মানবতা সবচেয়ে দুর্দিন প্রলক্ষিত হয়েছে। এ বিশ্বাস গুটিকয়েক মানুষকে একদিকে যেমন মানুষের প্রভুর আসনে বসিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করার পথ সুগম করেছে, অন্যদিকে সমাজের অধিকাংশ মানুষকে মানুষের দাসানুদাসে পরিণত করছে। শির্ক বরাবরই মানুষের সকল মর্যাদাকে করেছে ভুলুণ্ঠিত। এর ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে শ্রেণী বিদ্বেষ, শ্রেণী সংগ্রাম এবং মানুষে মানুষে পাহাড়সম ব্যবধান। সর্বোপরি রচনা করেছে, শোষণ ও বঞ্চনার করুণ অধ্যায়। ফিরআউনের উলুহিয়্যাতের দাবী এবং কিবতী ও বনী ইসরাঈলেরা তাকে ইলাহ হিসেবে আনুগত্য ও বিরোধিতার ইতিহাস সকলের জানা। এটাই শির্কের সামাজিক ক্ষতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪. সমাজে প্রতারক শ্রেণীর জন্ম দেয়ঃ

আমাদের দেশের মাযার-খানকা প্রতারক শ্রেণীর দখলে। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ হীনস্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ স্থানগুলোতে অবস্থান নিয়েছে এবং তা দৃঢ়তর করতে নানা কৌশল অবলম্বন করছে। এখান থেকেই তারা রাজকীয় জীবন-যাপনসহ অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ার সকল প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সে ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট সবলও হয়েছে। দেশের ধর্মপ্রাণ ও সহজ-সরল মানুষকে ধোঁকাদানসহ দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির ও কল্যাণের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে টাকা-পয়সা, মানত, দান-সদকা নিজেরা আত্মসাৎ করে; এর পরিমাণ হাজার টাকা থেকে কোটি টাকা পর্যন্ত । এমন মাযার আছে যেখানে বার্ষিক উরসের সময় আয় হয় কয়েক কোটি টাকা ও তার সমমূল্যের সম্পদ। অথচ কুরআনুল কারীমে এ প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে এভাবে-

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللهِ الْغَرُورُ﴾ (سورة فاطر: ٥)

'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।'

[সূরা ফাত্বির (৩৫): ৫]

৫. সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ঃ

শির্কের কারণে সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ, এ সকল স্থানে আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে যেসব শির্ক সংগঠিত হয়, তন্মধ্যে মানত, হাদিয়া, তোহফা, নযর-নিয়াত অন্যতম। দেশের অবৈধ খানকা ও মাযারগুলোতে লক্ষ-কোটি টাকা নগদ অথবা হাদিয়া-তোহফার নামে প্রতিনিয়ত

www.i-onlinemedia.net

লেন-দেন হচ্ছে। এগুলো কুক্ষিগত করছে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষ। এর অধিকাংশ দানকারী অবৈধ পয়সার মালিক এবং জনগোষ্ঠী। নানা প্রয়োজনে ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় এক শ্রেণীর মানুষ অকাতরে মাযার ও খানকায় দান করে এবং তার পৃষ্ঠপোষকদের দারস্থ হয়। অপরদিকে সুবিধাবঞ্চিত নিরীহ মুসলিমরা একই প্রত্যাশায় তাদের শরণাপন্ন হয়। এভাবে সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে।

৬. অসামাজিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়:

মাযার ও অবৈধ খানকাসমূহে অবস্থানকারীদের অনেকেই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে না। তাদের কেউ স্বপরিবারে আবার অনেকে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই নারী-পুরুষ একত্রে বসবাস করে থাকে। মদ, গাঁজা, ভাং, ফেনসিডিল, হেরোইন ও তাড়িসহ সব ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে থাকে। দেশের বড় বড় মাযারগুলোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর উরস বা বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান ইত্যাদি দেশ থেকে অনেক সাধারণ ভক্তকুল ও জটাধারী সাধু-সন্ন্যাসী আর দেশের প্রায় সকল অঞ্চল থেকে আসে হাজার হাজার ফকীর, বাউল। এ সব উরস ও উৎসবকালে গাঁজার ধোঁয়ায় মাযার এলাকা ছেঁয়ে যায়। খানকা ও মাযারকে কেন্দ্র করে এর রমরমা ব্যবসা চলে। সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে এবং সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষের অসংগঠত অবস্থানের কারণে কাজগুলো বাধাহীনভাবেই চলছে। আর সমাজকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। কিন্তু এর প্রতিকার নিয়ে ভাবার অবসর যেন কারো নেই।

৭. আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয়:

মাযারে নিয়মিতভাবে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা একেবারেই কম নয়। এরা জটাধারী ও নানা পোশাক পরিধানকারী হয়ে থাকে। কেউ উলঙ্গ এবং সামান্য কাপড় ও চট পরিধান করে। তাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ মনে করে তাদের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা আছে। তারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। তাদের অসন্তুষ্টি ক্ষতিকর এবং তাদেরকে খুশী করা জরুরী। তাদেরকে পাগল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা বা শাসনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাবে না। এ দুর্বলতার সুযোগে অনেক দাগী সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা নির্বিঘ্নে অবস্থান ও আত্মগোপনের সুযোগ পায়। এমনিভাবে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কারণে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৮. যুব সমাজ বিপথগামী হয়:

মাযার-খানকা কেন্দ্রীক নানা অপকর্ম অব্যাহত থাকায় যুব সমাজ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তারা নিয়মিত নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি সেবনের জন্য উক্ত স্থানকে নিরাপদ

www.i-onlinemedia.net

মনে করে। নেশা ছাড়াও সব ধরনের অসামাজিক কাজ সেখানে বিনা বাধায় চলতে থাকে। দেশ ও জাতীয় ভবিষ্যৎ যে যুব সমাজ, তারা অকালে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভিশাপ হিসেবে নিজেদের ধ্বংসের পথে চালিত করে জীবনকে নিঃশেষ করে দেয়। তাছাড়া অনেকেই এ সমস্ত স্থান থেকে খারাপ অভ্যাসের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। নিজেরা জীবনের অবশিষ্ট সময় ধুকে ধুকে শেষ করে। তাদের পরিবার ও সমাজ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে এ সমস্যা ক্রমেই প্রকট আকার ধারণ করছে। এ থেকে বাঁচতে হলে এখনই যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

৯. ধর্মীয় জীবনে বিপর্যয় নেমে আসেঃ

আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিদআত অনেকটাই মাযার ও খানকাহ কেন্দ্রিক আবর্তিত হয়। এ সংক্রামণ সমাজ দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিশুদ্ধ তাওহীদী আক্বীদ-বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে কোন সমাজেই নিরংকুশ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে সমাজে চতুর্দিক থেকে নানা বিপর্যয় নেমে আসে। তেমনি মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনেও নেমে আসে নানা বিপর্যয়। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করছে। সমাজে শির্ক ও বিদআত প্রচলনে, কুফর-নিফাক বিস্তারে এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। মানুষ পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে অর্থহীন নানা কাজে জড়িয়ে পড়ছে।

১০. সমাজে কল্যাণধর্মী কাজ ব্যাহত হয়ঃ

শির্কের মাধ্যমে সমাজে কল্যাণধর্মী কাজ সংকুচিত হয়। কারণ, মুসলিম মাত্রই কিছু কিছু কল্যাণ চিন্তা করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের খানকাহ হতে বলা হয়, প্রত্যেক মুরীদকে তার নিজ পীরের খানকা ও মাযার কেন্দ্রিক হতে হবে। অনুসারীরা তাদের দানসমূহ যথাযথভাবে কবুলের জন্য সে নির্দেশ মেনে চলে। এমনকি তাদের কুরবানী পর্যন্ত পীরের খানকায় এবং পীরের নামে দেয়া হয়ে থাকে। ফলে দান কারীর গরীব আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রকৃত হকদাররা বঞ্চিত হয়। সারাদেশ থেকে টাকা-পয়সা মাযার কেন্দ্রীক জমা হওয়ার ফলে সমাজে কল্যাণ ও ধর্মীয় কাজ ব্যাহত হয়।

১১. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়ঃ

শির্কের ফলে আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, মাযার কেন্দ্রিক অপরাধীরা আল্লাহকে খুবই ক্ষমাশীল এবং জীবিত এবং মৃত পীর-মাশায়েখদেরকে সকল গুনাহ মাফকারী ও মুশকিল কোশা হিসেবে বিশ্বাস করে।

www.i-onlinemedia.net

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শির্কের ক্ষতিকর প্রভাব

১. জাতীয় উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়ঃ

শির্ক মানব সমাজের সব ধরনের অকল্যাণ নিশ্চিত করে। ব্যক্তি মানুষের স্বকীয়তা বিনষ্ট করে তার সৃজনশীল মনন ও চিন্তাশক্তিকে এবং বাক স্বাধীনতা চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়। একদিকে জীবনকে জটিল করার কারণে মানুষকে সে সম্পর্কে নৈরাশ্যে নিপতিত করে। ফলে সে কর্মবিমুখ ও নির্লিপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে মানুষ আখিরাতের জবাবদিহিতাকে উপেক্ষা করে এবং পরকালে মুক্তির মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে ইবাদাত ও সৎ আমল বিমুখ হয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়। ফলে মানুষের মধ্য হতে উৎপাদনমূলক কাজের আগ্রহ লোপ পায়। এভাবে শির্ক দেশের জাতীয় উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে।

২. জাতীয়ভাবে অপচয় বৃদ্ধি পায়ঃ

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অপব্যয়কে সর্বাবস্থায় পরিহার করে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কবরে বাতি জ্বালানো, কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা, কবরের ওপর ঘর তৈরি করা, কবরের ওপর লেখা ও চুনকাম করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধতা সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণ, ব্যাখ্যা, বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও সম্ভাবনা দেখিয়ে এ সকল নিষিদ্ধ কাজ আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের মুসলিম সমাজে এমন শত শত কাজ ধর্মের অংশ হয়ে পড়েছে। যেমন আমাদের দেশেরে মাযার-খানকাগুলোতে গেলাফের নামে, সজ্জিতকরণের নামে মূল্যবান ঝাড়বাতি, আলোকসজ্জা, মার্বেল পাথরের নানা কারুকার্য, নানা আকৃতির গেইট, কবরকে আকর্ষণীয় করতে বিভিন্ন কারুকার্য আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারেই অর্থহীন। কারণ, ইসলামে যেখানে কোন কবরকে বাঁধাই করতেই নিষেধ করেছে, সেখানে এত আড়ম্বর সাজসজ্জা, ডেকোরেশন বাহুল্য ব্যয় ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বছরে কয়েকবার কবরের গেলাফ পরিবর্তনের মধ্যে দ্বীনি দায়িত্ব পালন এবং পুরনো গেলাফকে বরকতময় মনে করাকে ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না; বরং কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কারণ এ সবের মাধ্যমেই সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শির্ক ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহর অধিকার হয় ভূলুণ্ঠিত। আমাদের সমাজে খানকা ও মাযার কেন্দ্রিক এ কাজগুলোই ঘটা করে পালিত হচ্ছে। তাছাড়া উরস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় প্রচুর টাকা-পয়সা ব্যয়ে জাঁকজমকপূর্ণ গেইট তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য যে, দেশের কোন এক খানকার বার্ষিক উরস উপলক্ষ্যে একবার সারাদেশে প্রায় সাড়ে তিনশ' তোরণ নির্মাণ করা হয়। এগুলো সবই আশেকান, মুরীদান বা ভক্তবৃন্দ সাওয়াবের আশায় করে থাকে। আর অসংখ্য মাইকের মাধ্যমে প্রচার, পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন

www.i-onlinemedia.net

প্রকাশ, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ব্যানার, ফেস্টুন, পোষ্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল বিতরণের জন্য যে খরচ হয় তার হিসাব করা কঠিন। এ সবের ব্যবস্থা যেভাবেই হোক না কেন, সবই দেশের মানুষের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেই করা হয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে, পীর নেই অথচ তাঁর হুক্কায় আজও জীবিত মানুষের ন্যায় নিয়মিত আগুনসহ যথারীতি তামাক সেজে দেয়া হয়। বিশ্বাস এরূপ যে, আল্লাহর ওলীরা কখনও মৃত্যুবরণ করেন না; বরং তাঁরা সর্বদা জীবিত। মৃত্যুর আগে তিনি যা কিছু পছন্দ করতেন এবং তাঁর প্রয়োজন ছিল, তা আজও তার প্রয়োজন। এভাবে তারা বিভিন্ন উপকরণে অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ পথে ব্যয়িত বিপুল পরিমাণ অর্থ অভাবী ও গরীব মানুষদের মধ্যে ব্যয় করা হলে, দেশের চিত্র আজ ভিন্ন হতো। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামের নামে এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে বিপুল অর্থ ব্যয় করা ছাড়া এর মধ্যে আর কোন কল্যাণ আছে বলে মনে করা যায় না।

www.i-onlinemedia.net

শির্‌ক থেকে পরিত্রাণের উপায়

আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (سورة إبراهيم: ١)

'এ কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসতে পার আলোর দিকে।'

[সূরা ইব্রাহীম (১৪):১]

১. ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা:

আমাদের দেশে যারা শির্‌ক, বিদআত ও কুসংস্কার চর্চাকারী, যেমন মাযার ও অবৈধ খানকাহ সেবী এবং সেখানে গমনকারীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের রয়েছে জ্ঞানগত সমস্যা। তাদের বিভ্রান্তির এটা অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্য দেশের মাদরাসাগুলোতে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক শিক্ষা বেশি করে দিতে হবে।

২. শির্‌ক চিহ্নিত করা:

এ সমাজের অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী দিক নির্দেশনার জ্ঞান এবং আক্বীদা বিষয়ক ন্যূনতম জ্ঞানের অভাবে প্রায় ৯৫% জন শির্‌কে লিপ্ত। তারা জানে না যে, চিন্তা ও কর্মের কোন্‌টি শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত। তাই সমাজ হতে শির্‌ক মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা।

৩. শির্‌কের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষতির দিক তুলে ধরা:

সমাজ থেকে শির্‌ক মূলোৎপাটনের অন্যতম প্রক্রিয়া হল মানুষের নিকট শির্‌কের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষতির দিক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান স্বল্পতার সুযোগকে পুঁজি করে ধর্মের ছদ্মাবরণে প্রতারক শ্রেণী তাদেরকে শির্‌কে লিপ্ত করে এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই, এ শ্রেণীর মানুষের কাছে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক দিকে থেকে শির্‌কের ক্ষতির বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। কেননা, সাধারণ মানুষ সব সময়ই শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকে। তারা সামর্থের মধ্যে সমাজ থেকে শোষণ দূর করে শান্তি-সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তাই মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুতরাং শির্‌কের অসারতা প্রমাণ করা এবং মানুষকে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সচেতন করা, আজ বড়ই প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে লুথার কিং-এর কথাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

www.i-onlinemedia.net

'বিপুল সম্মান ও মনোরম প্রাসাদের মধ্যে কোন দেশের উন্নতি নিহিত থাকে না; বরং তা নির্ভর করে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত চরিত্রবান অধিবাসীদের ওপর।'

৪. সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা:

সমাজ থেকে শির্ক উৎখাত করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা সময়ের দাবী। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে শায়খ সুলায়মান আত্-তামীমী (রাহি.) মুসলিম সমাজ হতে শির্ক উৎখাত করার প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। আরবের বাইরেও এ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ফলে ১৮০২-১৮০৬ ঈসায়ী সালের মধ্যে কারবালা, মক্কা, মদীনা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক তথাকথিত পবিত্র স্থান ও মাযার ধ্বংসের মাধ্যমে শির্কের মূলোৎপাটিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের ইতিহাসে সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁর অনুসারী শাহ ইসমাঈল শহীদ এবং শারাফত আলী প্রমূখ বিজ্ঞ আলিমগণ অশেষ সংস্কার সাধন করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮০৪ ঈসায়ী সালে এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র দুদু মিয়া সেই আন্দোলন চালিয়ে যান। আজও সে আন্দোলনের প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সে ধারাবাহিকতায় আজও সরকার, উলামায়ে কিরাম ও সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারণ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের অভ্যাস গড়ে তোলা:

আমাদের দেশের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ নির্বিশেষে পড়ার অভ্যাস খুবই কম। তারা প্রায় সকলেই লোক মুখে দ্বীন জানতে চেষ্টা করে থাকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায়, কুরআন শুধু পড়তে জানেন এমন মুসলিমের সংখ্যা শতকরা ৪০জন। তাদের মধ্যে নিয়মিত তিলাওয়াতকারীর সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন। তারপরও দ্বীনী বিষয় অধ্যয়নের অভ্যাস একেবারেই কম। এমনকি আলিমদের মধ্যেও এ অভ্যাস অত্যন্ত কম। অবশ্য এ পেছনে কিছু ঐতিহাসিক কারণও জড়িত। তা হল, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় এ দেশে ইসলাম এসেছিল মুসলিম আরব বণিক ও কিছু দাঈ তথা মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে দরবেশ শ্রেণীর মাধ্যমে।[১] তাঁরা নসিহাত ও ব্যক্তি জীবনে আচরিত আমল দ্বারা মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন এবং মানুষেরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছেন। ফলে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তারা যেমন কুরআন-হাদীস পাঠ করার সুযোগ পায়নি এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও তাদের মধ্যে কুরআন-হাদীস অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। এ কথা বলা যেতে পারে যে, এ দেশে ইসলামের আগমন কিতাবের মাধ্যমে নয়, বরং ব্যক্তি মানুষের আচরিত কাজ-কর্মের ও মুখের মাধ্যমে। যে কারণে এ দেশের মানুষ কুরআন-

[১] বিস্তারিত দেখুন, *শির্ক কী ও কেন?*, পৃষ্ঠা ২২৯-২৬৫।

www.i-onlinemedia.net

হাদীসের সাথে সরাসরি পরিচিত হয়নি। একই কারণে আক্বীদা বিষয়ক ত্রুটি বিচ্যুতিও তাদের মাঝে বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে উপরোক্ত ত্রুটি ও ভ্রান্তিতা মুক্তির জন্য প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব প্রত্যহ যত বেশি সম্ভব কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস অধ্যয়ন করা। আরবীর সাথে এর অর্থ ও বিশুদ্ধ তাফসীর অধ্যয়ন করা। এ অধ্যয়ন আমাদেরকে সমাজের অগণিত খেলাফে সুন্নাত জানার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। হৃদয়ে রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসা সুদৃঢ় করবে।

৬. সুন্নাতের যথাযথ অনুসারী হওয়াঃ

এক কথায় আমাদের হৃদয় ও জ্ঞান জগৎ সর্বদা ব্যস্ত থাকবে রাসূল (ﷺ)-এর প্রকৃত তথা বিশুদ্ধ সুন্নাত জানার চেষ্টায়, আর আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যস্ত থাকবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণের চেষ্টায়। এভাবেই আমরা সাহাবীদের অনুরূপ অনুসরণ ও অনুকরণ প্রিয়তা কিছুটা হলেও অর্জন করতে পারব। এর মধ্যেই দ্বীনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব। দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সকল শির্ক ও বিদআত দূরীকরণ কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই সম্ভব। মুসলিমরা যতদিন সুন্নাতের অনুসারী ছিল, ততদিন তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দ্বীন বর্তমান ছিল। এর মহব্বত কমতে থাকার ফলে শির্ক বিদআত আমাদের প্রিয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটাকেই আমরা দ্বীন হিসেবে মনে করছি। প্রকৃত কথা হচ্ছে মুসলিম সমাজে শির্ক-বিদআত জন্ম নিয়ে একটি করে ইবাদতের পদ্ধতি ও সুন্নাত দূরীভূত হয়। শির্ক সকল গোমরাহীর মূল। তাই শির্ক মূল্যোৎপাটনের জন্য আমাদেরকে সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার কোন পীর-বুযুর্গ-মুরব্বী নয়, কোন ক্ষমতাশালী পণ্ডিত নয়; কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর সাহবীগণ (رضي الله عنهم) আমাদেরকে যা নির্দেশ করেছেন, তার বাইরে কোন কাজ করা তো দূরের কথা, চিন্তাও আমরা করব না। তবেই আমাদের চিন্তা ও কর্মকে শির্ক মুক্ত রাখতে সক্ষম হব।

শির্কের মূলোৎপাটন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের রূপরেখা

আমাদের দেশের দেশের মাযার, খানকাহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মুসলিমদের চিন্তা ও কর্ম হতে শির্ক মূলোৎপাটনের জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে :

প্রথমত, উলামা-ই-কিরামগণের সম্ভাব্য ভূমিকাঃ

পীর-মাশায়েখ ও উলামা-ই-কিরামগণ সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়, নয় নিছক পরকালীন ভাবনায় নিয়োজিত কোন দূর জগতের বাসিন্দা। সমাজের আর দশ জন মানুষের সাথেই তাঁরা বসবাস করেন। দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজ ও

www.i-onlinemedia.net

রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরাই আমাদের সমাজের দ্বীনী বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের পরিচালক হিসেবে এখনও তাঁরাই দায়িত্ব পালন করেন। মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে- এ দিক হতে তাঁরা অঘোষিত পরিচালক। এমনকি জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকায় ধর্মীয় বিষয়গুলো অনেক সময় তাঁদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে থাকে। মোটকথা, এ দেশের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের নিকট থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা পেয়েছে; আবার মানুষের বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার অন্যতম কারণও পীর-মাশায়েখ, আলম-উলামা, ইসলামী পণ্ডিত নামের কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অপতৎপরতা। আমরা লক্ষ্য করেছি, ইতোপূর্বে মুসলিম উম্মাহ্‌র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যকার দ্বন্দ্ব মুসলিমদের শক্তি, সামাজিক কাঠামো, চিন্তাধারা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ধ্বংসের সূচনা করে। কালক্রমে ইসলাম তার প্রাণশক্তি আর ধরে রাখতে পারেনি। ফলে, ইসলামের বাদবাকী অংশটুকু শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষা হিসেবে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে টিকে আছে। এ তিক্ত ফাটল মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে সব ধরনের ব্যবহারিক এবং সামাজিক দায়িত্ব থেকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে দূরে সরিয়ে রাখে। এক পর্যায়ে মুসলিমদের মন আবদ্ধ হয়ে যায় কেবল মসজিদের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে। চলতে থাকে কুরআন-হাদীসের শাব্দিক বিশ্লেষণ ও তরজমা। এটা মূলত দেশের শাসকমণ্ডলীর চরিত্র নষ্ট হওয়ার কারণেই নিরীহ সাধারণ জনগণের চরিত্রের অবনতি হয়ে থাকে। আর শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র কলুষিত হওয়ার একটিমাত্র কারণ দেশের আলিম সমাজের চরিত্রহীনতা, অর্থলিপ্সা এবং নাম-যশের প্রতি অসাধারণ লোভ-লালসা। আসলে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে আলিম সমাজ নিজেদের মধ্যে অনৈক্য দূর করে শির্ক মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সময়োপযুগী ভূমিকা পালন করা তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব। এ পর্যায়ে আমাদের দেশে শির্ক মূলোৎপাটনে উলামা-ই-কিরামগণের সম্ভাব্য ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. মসজিদ কেন্দ্রীক সংস্কারমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা:

মসজিদ থেকে সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে সংস্কারমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মসজিদে নিয়মিত মুসল্লী ও তার প্রতিবেশীদের ব্যক্তিগঠন ও বিকাশের জন্য ইসলামী আদর্শকে মডেল হিসেবে সামনে রাখতে হবে। ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও বিশ্বাসের যথাযথ তালিম মসজিদ থেকেই প্রদান করতে হবে। সমাজে বসবাসরত সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমকে প্রত্যহ পাঁচবার নিয়মিত মসজিদমুখী করার মধ্যেই সংস্কার কাজের সফলতা নির্ভর করছে। কারণ, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হল সালাত। তাই সমাজকে শির্ক ও বিদআতমুক্ত করতে সালাত তথা মসজিদ কেন্দ্রীক উদ্যোগ সফলতা বয়ে

www.i-onlinemedia.net

আনতে পারে। রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীগণের (رضي الله عنهم) জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পারি, তাঁরা তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদকেই বেছে নিয়েছিলেন। মুসলিমরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই সর্বপ্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ মসজিদকে ঘিরেই সেই এলাকার মানুষকে দিয়েছে দ্বীনী তালিম, দূর করেছে শির্ক ও বিদ'আতের নানা কলুষতা। সমাজের মানুষের নৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য ইসলামী নৈতিকতার তালিম দিতে হবে।

২. শির্কের ভয়াবহতা তুলে ধরা:

এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তাদের একটা অন্ধ আবেগ কাজ করে থাকে। ইবাদত সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে ইসলামের নামে প্রচলিত যেকোন কাজকেই ইবাদত মনে করে। শরীআতের বিধি-নিষেধ পালন না করেই আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করে। এর বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নানামুখী ধারণা তারা লাভ করে। এ বিষয়ে সঠিক ধারণা দেয়া অত্যন্ত জরুরী। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য ওয়াজ-মাহফীল, ধর্মসভা ইত্যাদি নামে নানা অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। অধিকাংশ সময়ই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠান সমাজের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উলামায়ে কিরাম সেখানে সম্মানিত অতিথি এবং আলোচক হিসেবে হাজির হন। উপস্থিত মুসলিম ও আয়োজকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে তাঁদের কথা ও দিক-নির্দেশনা শোনার জন্য। এখন প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়ে আমাদের সমাজ দেহে সংক্রমিত শির্ক, বিদআত ও কুসংস্কারগত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৩. জনমত গঠন করা:

আজকের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় সচেতন। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অন্ধ আনুগত্যের চেয়ে ক্রমান্বয়ে যাচাই-বাছাইয়ের পরেই অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে পরিবার ও সমাজে মানুষের আন্তরিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এমতাবস্থায় শির্ককে পর্যায়ক্রমিক মূলোৎপাটনের জন্য সচেতন মুসলিমদের সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। এক পর্যায়ে তা আন্দোলনের রূপ নিলেই সফলতার মুখ দেখতে পারবে।

৪. দ্বীন প্রচারে সাবধানতা অবলম্বন করা:

শির্ক ও বিদআতের সাথে দূরতম সম্পর্ক আছে বা এর পথ সুগম করতে পারে এমন সকল কার্যাদি সতর্কতামূলকভাবে পরিত্যাগ করা এবং এমন কাজও পরিহার করা পরবর্তী পর্যায়ে যা থেকে শির্ক সংক্রমিত হতে পারে। কেননা, মানুষের চিন্ত

www.i-onlinemedia.net

া ও কর্মে একবার কোন কাজের সূচনা হলে তা দূর করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ঐ কাজ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কাজটি অসত্য ও যুক্তিহীন হলেও এক পর্যায়ে তা প্রতিষ্ঠা পায় এবং বড় হতে থাকে। তাই উলামায়ে কিরামকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৫. বিশুদ্ধ আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞান দান করা:

ইসলামী আক্বীদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ধারণা থাকা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। তাদের ঈমানী দৃঢ়তা ও তার দাবী পূরণে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের বিকল্প নেই। প্রতিটি মুসলিমের দ্বীনি দায়িত্ব কর্তব্য পালনের গ্রহণযোগ্যতা এবং তার পারলৌকিক প্রাপ্তিও এর ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের মুসলিমদের দ্বীনী ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দৈন্যতা আক্বীদার বিষয়ে। তাই আলিম সমাজের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ও সরকারের সম্ভাব্য ভূমিকা:

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজ ও নাগরিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর জন্য রয়েছে আইন ও শাসনের রশি। তাই সমাজ থেকে শির্ক মূলোৎপাটনে রাষ্ট্র ও সরকার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

১. উলামায়ে-কিরামের সমন্বয়ে জাতীয় বোর্ড গঠন করা:

বর্তমান সময়ে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার ভার এমন সব লোকের ওপর পড়েছে, যাদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন না। ইসলামের আধুনিক অভিভাবকগণ নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করেন। কিন্তু বাস্তবতার মুখোমুখি হতে আগ্রহী নয়। আর ঘটনাচক্রে মুখোমুখি হলেও তার উপযুক্ত সমাধান দিতে পারেন না। তাঁরা ইসলামের প্রয়োগমুখী ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল নন। তাই সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে দেশের বরেণ্য উলামায়ে-কিরামের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠনমূলক জাতীয়ভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন।

২. পাঠ্যক্রমে আক্বীদা বিষয়ক সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা:

দেশের শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সকল পর্যায়ে আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞান দানের লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা। আক্বীদা বিষয়টির ত্রুটিপূর্ণ ও সীমিত চর্চার কারণে মুসলিমদের আক্বীদা বিশ্বাসে রয়েছে ঈমান বিধ্বংসী মারাত্মক ত্রুটি। বিশ্বাসের মধ্যে ত্রুটি থেকে গেলে যাবতীয় কাজের মধ্যে তার ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এ কারণেই এখানকার মুসলিমদের মধ্যে কবর পূজা, পীরপূজা, মাযার পূজার এবং শির্ক-বিদআতের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের

www.i-onlinemedia.net

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের বিশ্বাস হচ্ছে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে উসীলা (মাধ্যম) না বানালে ঈমান ঠিক হবে না, আখিরাতে পার পাওয়া যাবে না এবং জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথচ এ মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎখাতের জন্যই ইসলামের আগমন। অথচ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যপুস্তকে এ সংক্রান্ত আলোচনা নেই বললেই বলে। অতএব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ে আক্বীদা বিষয়ক সিলেবাস অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

৩. প্রচার মাধমে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করাঃ

ইংরেজীতে বলা হয়, *'Information is power'* অর্থাৎ 'তথ্যই শক্তি'। মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনে প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সরকার প্রচার মাধ্যমের দ্বারা শির্ক মূলোৎপাটনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. মাযার ও খানকাসহ কবরপূজার অবৈধ স্থাপনা ধ্বংস করাঃ

বর্তমান সময়ে মাযার ও খানকাহসমূহে শরীয়াত বিরোধী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অশিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত মানুষদের ধোঁকা দিয়ে মাযার ও খানকায় ধর্ম ব্যবসা শুরু হয়েছে। তাই সরকারী হস্তক্ষেপে মাযার, খানকা, মূর্তি, ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ ও কবরপূজার সকল উৎসমূলসহ শির্কের ভিত্তিকে ধ্বংস করতে হবে।

৫. রাষ্ট্রীয় বিশেষ নির্দেশ জারি করাঃ

বর্তমান সময়ে মানুষ রাষ্ট্রীয় বিশেষ নির্দেশের প্রতি মর্যাদাশীল। তাই শির্ক মূলোৎপাটনের জন্য রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করা জরুরী।

তৃতীয়ত, যুব সমাজের ভূমিকাঃ

সব যুগে সব সমাজেই যুব সমাজ চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। তারা সমাজের ভাঙ্গা গড়ার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সমাজের ভাল ও মন্দ অনেকাংশে তাদের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের যুব সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের যুগেও তারা এ দেশে আসমানী কিতাবের অনুসরণে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নে বিভোর। তাই তারা সমাজ থেকে শির্ক মূলোৎপাটনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

চতুর্থত, সাধারণ মুসলিমদের ভূমিকাঃ

১. আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করাঃ সাধারণ মুসলিমরা আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে শির্ক মূলোৎপাটনে ভূমিকা রাখতে পারে।

২. সরকার ও উলামায়ে-কিরামকে সাহায্য করাঃ শির্ক উৎখাতের জন্য সাধারণ মুসলিমগণ সরকার ও উলামাগণকে সহযোগিতা করতে পারে।

www.i-onlinemedia.net

৩. সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলা: আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে শির্ক উৎখাতের জন্য সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক।

পঞ্চমত, শিক্ষিত মুসলিমদের ভূমিকা:

দেশের শিক্ষিত মুসলিমদের দায়িত্ব সব সময়ই বেশি হয়। সাধারণ মানুষেরা তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাই শির্ক মূলোৎপাটনে শিক্ষিত মুসলিমগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনসমূহের ভূমিকা

শির্ক একটি মারাত্মক ব্যাধি। তাই সমাজ থেকে শির্ক উৎখাতের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রস্তাবনা:

১. ইমামগণ মুসলিমদেরকে মসজিদকেন্দ্রীক করা, শির্কের দুনিয়া ও আখিরাতের কুফল বর্ণনা করা, মানুষকে শির্ক বর্জন করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।
২. ইসলামী শরীয়াহ অসমর্থিত মাযারকেন্দ্রীক গড়ে ওঠা সকল স্থাপনা ভেঙ্গে দিতে হবে।
৩. আক্বীদা বিষয়ে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
৪. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করে শির্কের কুফল তুলে ধরা।
৫. মানুষের চিন্তা ও কর্মে বিদ্যমান শির্কগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং এর উৎসগুলো বন্ধ করতে হবে।
৬. মুসলিমদের মাঝ থেকে বিশুদ্ধ আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব দূর করতে হবে।

www.i-onlinemedia.net

উপসংহার

খালেস ঈমান তথা সঠিক আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল বুনিয়াদ। এ বুনিয়াদের উপকরণে কলুষ, কালিমা ও ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটলে সমস্ত 'আমল বরবাদ ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে, মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মাথায় পানি দিলে যেমন কোন ফল লাভ হয় না, ঠিক তেমনি আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে ব্যক্তি হয়ে যাবে 'আমল শূন্য। তাই আক্বীদার সংশোধনই হওয়া উচিত সর্বপ্রথম। তাছাড়া, জান্নাতে যাওয়া ও না যাওয়া নির্ভর করে মূলত আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়ার উপর। যদি আক্বীদা বিশুদ্ধ হয় তবে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব, আর যদি আক্বীদা অশুদ্ধ হয় তবে জান্নাতে যাওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া অসম্ভব।

তাই, একজন মুসলিমের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তার আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমেই কেবল সে দ্বীনের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারে। ঈমান ও আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ কুরআনে এবং এর ব্যাখ্যাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে পৃথিবীতে প্রচলিত বাতিল ধর্মমত এবং বিশেষত গ্রীক দর্শনের কুপ্রভাবে মুসলিমদের ঈমান ও আক্বীদায় বিভ্রান্তির মায়াজাল ছড়িয়ে পড়ে। তারই ফলশ্রুতিতে, অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলেও, মুসলিম সমাজে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ঈমানীয়তের মূল 'আক্বীদা' সংক্রান্ত ব্যাপারেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় এবং নানা ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এভাবে অখণ্ড মুসলিম সমাজে পরস্পর বিরোধী মতবাদের টানাপোড়নে সংশয় ও সংঘাত দেখা দেয়। আক্বীদায় সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ী প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এ সকল সংশয় ও সংঘাত নিরসন এবং সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মুসলিমদের আক্বীদাকে সঠিক ও কলুষমুক্ত রাখার জন্য ইসলামের অবিমিশ্র মত ও সঠিক পথের অনুসারী আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রকৃত বিদ্বানগণ সময়ের প্রয়োজনে আবির্ভূত হন এবং আক্বীদার ব্যাপারে সৃষ্ট সমূদয় ধূম্রজাল ছিন্ন করে কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক ও নির্ভেজাল বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

আজ ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারীদের অপপ্রচারে এ দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ ব্যাপক আকারে বিভ্রান্তির শিকারে পতিত হয়েছে। গোটা বাংলাদেশের মুসলিমরা দিবানিশি শির্‌ক ও কুফরীযুক্ত শত-সহস্র কুসংস্কার ঘেরা এক স্বপ্নিল জীবন-যাপন করে। কাজেই অজ্ঞ ও শিক্ষিত সকলেই যে কুসংস্কারে থাকবে সর্ববিষয়ে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শির্‌ক ও কুসংস্কারের প্রতি এ মোহমুক্তি না ঘটলে মুসলিমরা কখনোই স্ব-ধর্মের আলোকোজ্জ্বল পথ তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের পথের সন্ধান পাবে না। শির্‌ক, বিদআত ও কুসংস্কারের চর্চা গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই না।

www.i-onlinemedia.net

অথচ, শির্ক সবচেয়ে বড় অপরাধ। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণার বিষয়। অন্যান্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু শির্কের অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন না। এর মূল কারণ হল, শির্ক হচ্ছে মূলত আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদারিত্বের আক্বীদা পোষণ করা। শির্কের মাধ্যমে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। এ কারণেই শির্ক জঘন্যমত অপরাধ। অন্যান্য কবীরা গুনাহে আল্লাহর একক প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। সেখানে হয় আদেশ লংঘন। কিন্তু শির্কে আল্লাহর একক প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। শির্ক ও অন্যান্য গুনাহের মধ্যে এটাই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য।

আরেকটি পার্থক্য হল, অপরাপর কবীরা গুনাহে গুনাহগারের মনে অপরাধবোধ কাজ করে। এ অপরাধবোধ এক সময় তাকে অনুতপ্ত করে তোলে, ফলে সে তওবা করে। সকল ধরনের কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রেই এ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শির্কের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা নেই। যে শির্ক করে তার মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। সে তো তা করে থাকে নেকবোধ নিয়েই। তার বিশ্বাস, সে যা করছে তাতে তার দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে। সে যা করছে, তা যে অপরাধ, এ বোধ তার মধ্যে কখনো সৃষ্টি হয় না। যে মদ পান করে, সে জানে যে, সে মদ পান করে। যে ব্যভিচার করে, সে জানে যে, সে ব্যভিচার করছে। যে মিথ্যা বলছে, সে জানে যে, সে মিথ্যা বলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যে শির্ক করছে সে জানে না যে, সে শির্ক করছে। ফলে তার মধ্যে কখনো পাপবোধ সৃষ্টি হয় না। কখনো সে মনে করে না যে, সে এমন একটি কাজ করে যাচ্ছে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই সে কখনো তাওবা করার সুযোগ পায় না। আর এ অবস্থায় তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অতএব, তাওহীদী আক্বীদাকে সকল প্রকার কুফরী, শির্কী ও বিদআতী আক্বীদা হতে পরিচ্ছন্ন করা ব্যতীত সত্যিকারের মুমিন হওয়ার কোন পথ নেই। দেহের জন্য যেমন বিষাক্ত খাবার ক্ষতিকর রূহের জন্য তেমনি ঐসব বিষাক্ত আক্বীদা অত্যন্ত ক্ষতিকর যার চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম।

www.i-onlinemedia.net

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, *তাফসীর তাইসীরুল কুরআন,* (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল: ২০০৭ ঈসায়ী)।

২. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী (১-৬),* (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল: ২০০৭ ঈসায়ী)।

৩. ***Tafsir Ibn Kathir (1-10),*** *(Darussalam Publication, Riyad, Saudi Arabia)*।

৪. ড. আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স, *তাওহীদের মূল নীতিমালা,* (ভাষান্তর: ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান; ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স; প্রকাশকাল: ২০০৮ ঈসায়ী)।

৫. সালিহ আল-উছায়মীন, *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম,* (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ; প্রকাশকাল, ২০০৭ ঈসায়ী)।

৬. মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু, *মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ নির্দেশিকা,* (তাওহীদ পাবলিশেন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।)।

৭. আবূ তাহের বর্ধমানী, *পীরতন্ত্রের আজবলীলা,* (তাওহীদ পাবলিশেন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।)।

৮. শফীউর রহমান মুবারাকপুরী, *আর-রাহিকুল মাখতূম,* (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৯ ঈসায়ী)।

৯. ড. মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী, *শিরক কী ও কেন,* (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা; প্রকাশকাল: ২০০৭ ঈসায়ী)।

১০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামী আক্বীদা,* (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ।)।

১১. ঐ, *এহ্ইয়াউস সুনান*।

১২. ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-উরাইফী, *তাওহীদের কিশতী,* (ঢাকা: আন্-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী, প্রকাশকাল: ২০০৮ ঈসায়ী)।

১৩. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব, *কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা,* (ঢাকা: আন্-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী, প্রকাশকাল: ২০০৯ ঈসায়ী)।

১৪. ওয়ামী, *সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিরকের প্রভাব,* (ওয়ামী বুক সিরিজ-২৫; প্রকাশকাল: জানুয়ারী ২০০৭)।

১৫. হাফেজ মাহমুদুল হাসান, *কবর ও মাযার কেন্দ্রিক শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার,* (ওয়ামী বুক সিরিজ-৬, প্রথম প্রকাশ: মে-২০০৪)।

১৬. মাওলানা আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ,* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৯)।

১৭. মাওলানা রফিকুল ইসলাম, *তাসাউফের মর্মকথা,* (ইমাম ফাউন্ডেশন, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা)।

১৮. অধ্যাপক এ. এফ. ছাদুল হক ফারুক, **পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম,** (আল-ফুরকান পাবলিকেশন, ৪৯১ বড় মগবাজার , ঢাকা)।

১৯. মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ, *শিরক ও বিদআত,* ঐ।

২০. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (১-৩),* (তাসনিয়া বই বিতান, ৪৯১/১ বড় মগবাজার , ঢাকা)।

২১. ঐ, *শব্দ সংস্কৃতির ছোবল*।

www.i-onlinemedia.net

২২. মাওলানা মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন, ***ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ,*** (খানভী লাইব্রেরী, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা)।
২৩. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হুয়াইল, ***সহজ তাওহীদ,*** (আল মুনীর পাবলিকেশন্স, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা)।
২৪. মমতাজ দৌলতানা, ***মাযার জিয়ারত,*** (জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা)।
২৫. আইয়ুব হোসেন, ***সংস্কার নয়, কুসংস্কার,*** (সুবর্ণ, ১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা)।
২৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহি.), ***মহা উপদেশ,*** (সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ধারাবারিষা বাজার, গুরুদাসপুর, নাটোর)।
২৭. আ.ন.ম. রশীদ আহমাদ, ***প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আক্বীদাহ।***
২৮. মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত-তামীমী (রাহি.), ***ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব।***
২৯. ***ইসলামী বিশ্বকোষ,*** (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)।
৩০. ***সীরাত বিশ্বকোষ,*** ঐ, ১ম ও ২য় খণ্ড।
৩১. ***বাংলা পিডিয়া,*** (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশঃ চৈত্র ১৪০৯/মার্চ ২০০৩)।
৩২. ***বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান,*** (উৎস মানুষ সংকলন)।
৩৩. ***এটা কি ওটা কেন,*** (উৎস মানুষ সংকলন)।
৩৪. ***বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান,*** ঐ।
৩৫. ভবানী প্রসাদ সাহু, ***সংস্কার-কুসংস্কার।***
৩৬. ***মাসিক আত-তাহরীক,*** (হাদীস ফাউন্ডেশন, কাজলা, রাজশাহী)।
৩৭. ***দৈনিক সংগ্রাম,*** ২৭ অগাস্ট, ১৯৯৭ খ্রি.।
৩৮. ***দৈনিক ইনকিলাব,*** ৩ জুলাই, ২০০০ খ্রি.।
৩৯. ***সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান,*** ১৮-২৪ ডিসেম্বর, ২০০২ খ্রি.।
৪০. ***দৈনিক আমার দেশ,*** ১ নভেম্বর, ২০০৮ খ্রি.।

www.i-onlinemedia.net